Krishi-Granthabali Series No. 1.

কৃষিক্ষেত্র

(১ম ও ২য় খণ্ড)

অষ্টম সংস্করণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

Gardening Publications

By **P. C. DE.**

A TREATISE ON MANGO

(3rd, Edition.)

A LITTLE BOOK BY:—

Mr. Probodh, Chandra De, F. R. H. S., Called "A Treatise on mango" should Prove more than ordinary useful. *The "Statesman."*

"The text ought to be of considerable help to those who wish to cultivate the fruit for the gratification of their stomach or for the filling up of their purse." *"Indian Mirror."*

"Mr. De is a horticulturist, and the information given is therfore practical and not merely theoretical." *Journal of the Royal Horticultural Society of London. Vol. XXXIII, part II.*

"It is packed with sound and useful advice on the subject. We commend **Mr. De's Treatise on Mango** to all interested in the planting and rearing of the most delicious and luscious fruit in the world." *"The Hindustan Review." July, 1912.*

POTATO CULTURE

(5th. Edition. **As. 8.**)

"The papers furnish practical hints for the cultivation of potato." *"Indian Mirror."*

Potato Culture—is a valuable treatise on the system of growing Potato." *"The Statesman."*

"With the help of this book even a novice will be able to cultivate this crop successfully." *The Queen.*

"That a booklet on such a technical subject has undergone four editions is sufficient testimony to its merit." *Indian Daily News.'*

বেঙ্গল গভর্মেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত, প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে,
সেণ্ট্রাল-টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটির অনুমোদিত

কৃষিক্ষেত্র

(১ম ও ২য় খণ্ড)

অষ্টম সংস্করণ

সবজীবাগ, ফলকর, মৃত্তিকাতত্ত্ব, মালঞ্চ প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

Late Superintendent of Gradens, Raj-Durbhanga ;
Nizamat State Gardens, Murshedabad ; the
Chaluvamda Vilas Park, Mysore ; formerly
of the Cossipur Horticultural
Institution, Calcutta.

প্রণীত

সন ১৩৩৪ সাল

মূল্য ১।৷০ মাত্র

Printed by Bhola Nath Mitra at
Saudamini Printing Works.
252, Upper Circular Road.
and Published by Anilchandra De,
27/1, Beadon Row, Calcutta.



সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম সংস্করণের
ভূমিকা

কৃষিক্ষেত্র প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয় নাই যে, উক্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হইবে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে কিন্তু ভগবৎ কৃপায় তাহা হইয়াও ক্রমে অষ্টম সংস্করণও বঙ্গবাসীকে উপহার দিতে পারিলাম তজ্জন্য আনন্দ পরিপ্লুত হৃদয়ে শ্রীভগবানকে বার বার নমস্কার করি। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা,
অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৪ সাল

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে

কৃষিক্ষেত্র

——(*)——

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মুলধন।—কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে প্রধান বিবেচ্য বিষয়,—মূলধন। গৃহস্থিত অর্থ যে কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে, সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার প্রয়োজন। একজনের ক্ষতিকে আমরা ব্যক্তিগত ক্ষতি মনে না করিয়া জাতীয় ক্ষতি বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। এইজন্য মূলধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। অবিবেচনার সহিত এবং অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করিলে অনেক সময়ে অর্থাভাব ঘটে। নিজে যে পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস, কার্য্যের আয়োজন তদনুসারে করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য। বরং অল্প আয়োজনে কার্য্যারম্ভ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ কিন্তু আর্থিক শক্তির

অতীত বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন করা কোন মতে উচিত নহে। এরূপ অনেক ঘটনা আছে যাহাতে হয়ত ১০০৲ টাকার প্রয়োজন হইতে পারে, অথচ তদভাবে হয় ত ক্ষেতের ফসল উঠিতেছে না ; জলাভাবে এমন হইতে পারে যে, ক্ষেতে জলসেচন না করিলে সমুদায় ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, কিম্বা অন্য কোন অভাবনীয় কারণে প্রথম বৎসর হয়ত ক্ষতি হইল, তখন তাহা পূরণ করিবার জন্য পুনরায় অর্থের প্রয়োজন হইবে। এক বৎসরের আবাদেই যে লাভ হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। বস্তুতঃ তিন বৎসরের আয়ব্যয় না দেখিলে কৃষিক্ষেত্রের লাভ বা লোকসান বুঝা যায় না। প্রথম বৎসর যেমন ক্ষতি হইতে পারে সেইরূপ লাভও হওয়া সম্ভব। এই সকল কারণে সমুদায় মূলধন একবারে ব্যয় না করিয়া সম্বৎসরের আনুমানিক খরচ বাদে, হস্তে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ অর্থ থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ঋণ করিয়া কৃষিকার্য্য করা উচিত নহে। বিশেষতঃ এদেশে টাকা বড় অসচ্ছল! এখানে অধিক সুদ না দিলে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় না। বন্ধকী সুদেও যদি ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করা যায় তথাপি শতকরা মাসিক এক টাকা সুদের ন্যূনে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে মোট টাকার উপর বার্ষিক ৬০৲ টাকা সুদ হইয়া থাকে। বিনা বন্ধকে আরও অধিক হারে সুদ দিতে হয়। যদি এরূপ কোন জামীন থাকিত যে, এক বৎসর চাষবাস করিলেই সুদ সমেত আসল টাকা উঠাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ঋণ করিতে তত ভয়ের কারণ নাই। যে বৎসর ঋণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা গেল, সে বৎসর যদি বন্যার জলে সমুদায় ভাসিয়া যায় বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা পঙ্গপালে সমুদায় ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে বৎসরের শেষে ৫৬০৲ টাকা দায়ী হইতে হইল, এবং সত্বর তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলে

সুদের উপর সুদ বাড়িতে লাগিল, অগত্যা হয়ত কৃষিকার্য্যও বন্ধ করিতে হইল। কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, অন্যদিকে ততোধিক চিন্তাও আছে! তাহার উপর আবার অর্থের বা ঋণের চিন্তা বলবতী থাকিলে মনুষ্যের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, হৃদয় অশান্তির আলয় হয়।

নূতন অথবা পতিত জমি লইয়া প্রথম কার্য্যারম্ভ করিতে হইলে সচরাচর আবাদে যে খরচ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ অধিক খরচ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, জঙ্গল পরিষ্কার জমির চৌহদ্দী নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, গৃহনির্ম্মাণ, লাঙ্গল বলদ ও যন্ত্রাদি খরিদ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অর্থ পূর্ব্বাহ্নেই ব্যয়িত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উহা বার্ষিক খরচের মধ্যে গণ্য নহে,—মূলধনের রূপান্তর; তথাপি কিন্তু ইহার ক্ষয় আছে এবং সেই ক্ষয় ক্রমে লাভের অংশ হইতে পরিপোষিত হইয়া থাকে। এ সকলই সত্য, তথাপি প্রথমতঃ উহা তহবিল হইতে বাহির করিতে হইবে, এজন্য উহা বার্ষিক খরচের মধ্যে গণ্য না করিয়া মূলধন হিসাবে দিতে হয়। এ সমুদয় প্রারম্ভিক ব্যয় প্রতি বৎসর আবশ্যক হয় না, সুতরাং উহা বার্ষিক খরচের অন্তর্গত নহে। কিন্তু তৎসমুদায়ের সংস্কার করিতে প্রতি বৎসরই অল্পাধিক ব্যয় আছে এবং সে ব্যয় অনর্থক বা অপব্যয় নহে। এ সকলকে বজায় রাখায় স্বার্থ-সিদ্ধির সহায়তা হয়। এই জন্য নূতন কার্য্যের ন্যায় সংস্কার বা মেরামতি কার্য্যও প্রয়োজনীয় বা ততোধিক প্রয়োজনীয়। একবার যন্ত্রাদি খরিদ ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া গেলে ভবিষ্যতে যে তাহা মেরামত করিতে হয় অথবা কোন যন্ত্র খরিদ করিতে হয়, তাহা বার্ষিক খরচের অন্তর্গত।

কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ঘর-দুয়ার বা যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ বা ক্রয় যে অনর্থক নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সকল দ্বারা যে অর্থব্যয় হইয়া

থাকে, সে অর্থ আপাততঃ আবদ্ধ বা dead stock মনে করা ভ্রম। অনেকে তাহাই মনে করেন বলিয়া অতিশয় সঙ্কীর্ণ ভাবে সে দিকে পদক্ষেপ করেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই সঙ্কীর্ণতাহেতু অবশেষে তাঁহারাই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। আমরা আড়ম্বরের পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে যে অর্থব্যয় করা যায়, যে শ্রম নিয়োজিত হয় তাহার সার্থকতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া এবং মূলধনের শক্তি বুঝিয়া কার্য্যের আয়োজন করিতে হইবে। কার্য্যারম্ভের পর অর্থাভাবে যেন কোন কার্য্যের ক্রটী না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সম্বৎসরের খরচের তালিকা প্রস্তুত করা উচিত।

ক্ষেত্রস্বামী।—কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত যাঁহারা যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে না পারেন তাঁহারা যেন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন। অনেকে কৃষিকার্য্যকে সামান্য জ্ঞানে অথবা সখের ব্যাপার কিম্বা দ্বিতীয় অবলম্বন ভাবিয়া স্বীয় সুবিধামত ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কৃষিকার্য্য সামান্য কার্য্য নহে। ইহাতে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। দরিদ্র ও নিরক্ষর কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করে বলিয়া তাহাকে সামান্য জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রম। যে শাস্ত্র সাহায্যে মানবজাতির আহার ও নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যে সামান্য —ইহা অহম্মুখের কথা। ধীর ও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহাপেক্ষা গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় আর নাই। কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, রসায়ন আছে, শিল্প আছে, বিদ্যা আছে ও অর্থ-নীতি আছে। যে ব্যাপারে এতগুলি বিষয় একত্রে সম্বদ্ধ তাহাপেক্ষা গুরুতর বিষয় আর কি আছে? তুমি কৃষিকার্য্যে যতই পণ্ডিত হও, মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রপরিহিত রমজান মিঞার বা রামা বাউরীর কথা

উপেক্ষা করিও না। তাহাদিগের মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত বহু অভিজ্ঞতা ঘনসন্নিবিষ্টরূপে বিরাজ করিতেছে। তাহারা বিজ্ঞান বা দর্শনে পণ্ডিত নহে, সুতরাং সকল কথা পাশ্চাত্যাবিদ্যাভিমানীর ন্যায় সুশৃঙ্খলে ব্যক্ত করিতে পারে না কিন্তু তাহারা কিরূপে ভূমি কর্ষণ করে, কিরূপে জমির অপরাপর পাট করে—তৎসমুদায় নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া যাও, তাহাদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদিগের সহিত আলোচনা কর, অনেক শিখিতে পারিবে,—জ্ঞানের মাত্রা অনেক বাড়িয়া যাইবে,—পুস্তকলব্ধ জ্ঞান পোক্ত হইবে।

গৌণ অবলম্বন মনে করিলে কোন কার্য্যে যত্ন হয় না, এজন্য ইহাকে মুখ্য অবলম্বন ভাবিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অবহেলাপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য করিতে গেলে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কেবল অর্থব্যয় করিলে কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। আপনাকে ভৃত্যভাবে ক্ষেত্রের জন্য সময় দিতে ও পরিশ্রম করিতে হইবে, নতুবা প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে বায়ু সেবনোদ্দেশে ক্ষেত্রে বেড়াইতে গেলে কোন লাভ নাই। ক্ষেত্রস্বামী স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলে লোকজনের নিকট হইতে যে পরিমাণ কার্য্য আদায় হইয়া থাকে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার অর্দ্ধাংশও হয় কি না সন্দেহ। স্বয়ং তত্ত্বাবধান না করিলে লোকজন চক্ষে ধূলি দিয়া থাকে অর্থাৎ সমস্ত দিবস আলস্যে কাটাইয়া ক্ষেত্রস্বামী আসিবার সময় সময় যন্ত্রাদি লইয়া ব্যস্ততাসহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ক্ষেত্রস্বামী কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে সেরূপ হইবার আশঙ্কা নাই। রৌদ্র বা বৃষ্টির ভয়ে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিলে অথবা ক্ষেতে গিয়া ছাতা মাথায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে খনার একটি জ্ঞানপ্রদ বচন আছে, তাহা বস্তুতই অতিশয় শিক্ষাপ্রদ, সেই জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"খাটে খাটায় দুনো পায়,
তার অর্দ্ধেক ছাতা মাথায়,
ঘরে ব'সে পুছে বাত
তার ঘরে হা ভাত হা ভাত !"

লোকজনেরা আদেশ মত কাজ করিতেছে কি না, যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা হইল কি না, বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করা উচিত। সকল কাজ যদি সুসম্পন্ন না হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলে তখনই উপস্থিত থাকিয়া তাহা সমাহিত করিয়া লওয়া চাই। আপনি প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে বা বৃষ্টির সময় কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে লোকজনেরা কখনই পলাইতে সাহস পায় না।

কৃষিকার্য্যকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় রূপে গ্রহণ করিতে হইলে বাততাপসহ, দৃঢ়কায় ও সহিষ্ণু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আজ-কাল বাঙ্গালী-জীবন—বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী-জীবন—যেরূপ দুগ্ধ-পিষ্টক ভাবে গঠিত হইতেছে তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে কৃষিকার্য্যকে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমাদিগকে যৎসামান্য মূলধন লইয়া কাজ করিতে হয়, সুতরাং ক্ষেত্রস্বামী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে কোন মতে সফলকাম হইতে পারিবেন বলিয়াই মনে হয় না : যে সকল জন-মজুর লইয়া আমা-দিগকে সর্ব্বদা কাজ করিতে হয় তাহারা জন-মজুর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদিগের সঙ্গে নিত্য সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া কাজ করাইয়া লইতে পারিলে মূলধনের সাফল্য লাভ হয়। তাহা ব্যতীত, আরও একটী বিশেষ লাভ হয়,—জনদিগের চরিত্রোন্নতি হয় কিন্তু সে উন্নতি কি, তাহা বিবৃত করা উচিত মনে করি।

কার্য্যস্থলে প্রভু উপস্থিত থাকিলে মুনিষরা বাচলতা করিতে পারে না,

কাজে ফাঁকি দিতে পারে না, কার্য্যতৎপরতা শিক্ষা পায়, অনেক কাজের গূঢ় মর্ম্ম বা হদিস বুঝিতে পারে এবং সেগুলি ক্রমে তাহাদিগের প্রকৃতি-গত হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। প্রভু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে তাহারা স্বভাবতঃ যেরূপ কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করে তাহাও নিবারিত হয়। ইহাই জনদিগের চরিত্রোন্নতি। ইহাতে প্রভু ও ভৃত্য—উভয়ের যথেষ্ট লাভ আছে।

কেবল যে লোকজনকে খাটাইয়া লইবার জন্য ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন তাহা নহে। কোন্ দিন কোন্ ক্ষেত্রে বা কোন্ ফসলে কিরূপ পরিচর্য্যার আবশ্যক, তাহা লোকজনেরা জ্ঞাত নহে; আর জ্ঞাত থাকিলেও সে বিষয়ে তাহাদিগের পরিপক্কতার অভাব আছে। মুখে একরূপ বলিয়া দিলে তাহারা অন্যরূপ করিয়া রাখে। জলসেচন করিতে বলিলে উপরিভাগের মাটি ভিজাইয়া দিল, নিড়ানী করিতে বলিলে তৃণাদির শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে রাখিয়া উপরিভাগ ছিঁড়িয়া দিল, জমিতে লাঙ্গল দিতে বলিলে এখানে-সেখানে বসিয়া লাঙ্গলের কার্য্য শেষ করিল, গাছের গোড়া খুঁড়িতে গিয়া গাছই উঠাইয়া ফেলিল, গরু চরাইতে গিয়া গাছতলায় ঘুমাইতে লাগিল, গোয়াল ঘরে গরুর জাব দিতে গিয়া খৈল চুরী করিল, গাভী দোহন করিতে দুগ্ধ চুরী করিল অথবা অপরিষ্কার পাত্রে গো-দোহন করিয়া দুগ্ধ নষ্ট করিয়া ফেলিল, জঞ্জালকুড়ে অগ্নি দিতে গিয়া গৃহ দাহ করিয়া বসিল! এইরূপ নানাবিধ অপকার্য্য ইহারা প্রতিনিয়ত করিয়া থাকে। অপকর্ম্ম সংশোধিত করিয়া লইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা প্রথম হইতে নিয়মিতভাবে ও সুশৃঙ্খলে কার্য্য করাইয়া লওয়া ভাল। সময়ে সময়ে ইহাদিগের কার্য্যের ত্রুটি দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইতে হয়। বৃহৎ ব্যাপার হইলে বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়ক রাখা চলিতে পারে। কিন্তু ইহাও

জানিয়া রাখা উচিত যে, আত্মীয় বা কর্ম্মচারীকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাঁহার কৃষিকার্য্যে আন্তরিক প্রবৃত্তি বা সখ আছে কি না? যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা বিশেষ কাজ পাইবার আশা নাই, কারণ, সে কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইবে সুতরাং তাদৃশ যত্নসহকারে কাজ-কর্ম্ম দেখিবার ও করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হইবে না। নিজের সময় ও সুবিধা বিলক্ষণরূপ বিবেচনা করিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হয় নতুবা অর্থ ব্যয় পণ্ড হইয়া থাকে।

কাম-জারি (Distribution of work)।—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া কাজের হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে। অদ্য সমস্ত দিনে কোন্ জমিতে কি কাজ হইল এবং সঙ্কল্পিত কাজের কি বাকি রহিল,—এ সকল তদন্ত করতঃ পরদিন কোথায়, কোন্ ব্যক্তি কি কাজ করিবে, তাহার একটা মোটামোটি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে পারিলে পরদিবস প্রভাত হইলেই লোকজনেরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজে চলিয়া যাইতে পারে, নতুবা প্রাতঃকালে তাহারা কাজে আসিয়া অনেকক্ষণ গোলমালে কাটাইয়া দেয়, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করা থাকিলে আর এরূপ ঘটিতে পারে না। আর যদি ইহাদিগের উপরেই নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে নিজের মনোমত কাজ হওয়া দূরের কথা, বরং তাহারা যাহা করে তাহাতে হয়ত ক্রোধ উপস্থিত হয়। যে কার্য্য শীঘ্র সমাধা করা প্রয়োজন তাহা ফেলিয়া রাখিয়া হয়ত তাহারা আপন সুবিধা বা ইচ্ছামত কোন একটা কাজে প্রবৃত্ত হয়। সন্ধ্যাকালে কাজের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ক্ষেত্রস্বামীর পক্ষে আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, পরদিন প্রাতে উঠিয়াই তাহাদিগের সহিত হঙ্গামা বা বাগ্‌যুদ্ধ করিতে হয় না, ফলতঃ নিজেরও অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার অনেক অবসর পাওয়া যায়।

লোকজনেরা কাজে চলিয়া গেলে স্বয়ং সমগ্র ক্ষেত্র পরিদর্শন করা চাই। যাহাকে যে কাজ করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে ব্যক্তি সেই কার্য্য যথারীতি করিতেছে কি না তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। প্রতিদিন যে ব্যক্তির দ্বারা যে পরিমাণ কাজ হওয়া সম্ভব, তাহা হইল কিনা তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে এবং যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেজন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে শাসন করা কর্ত্তব্য। কার্য্যকালে তাহাদিগকে একদিকে তীব্রভাবে দেখিতে হইবে এবং অপর সময়ে তাহাদিগের সহিত সন্তানবৎ স্নেহভাবে আচরণ করা উচিত। সততই কঠোরভাবে শাসন করিলে তাহারা বিরক্ত হয় এবং সাধ্যমত প্রভুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়।

মিতব্যয়িতা।—সকল ব্যবসায়েই লাভ-লোকসান আছে। কৃষিকার্য্য সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। ক্ষতি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে টাকা মোট আদায় হয় তাহা হইতে খরচ বাদ দিয়া যে টাকা হস্তে মজুত থাকে তাহাই প্রত্যক্ষ লাভ এবং খরচের টাকা যদি মোট আমদানি হইতে সঙ্কুলান না হয়, তবেই জানিতে হইবে যে ক্ষতি হইয়াছে এবং সঙ্কুলানের জন্য যত টাকা অনটন হয় তত টাকা ক্ষতির হিসাবে খরচ লিখিতে হইবে। খরচের সমান আমদানি হইলে, লাভ বা লোকসান কিছুই বলা যায় না। নিয়মিত খরচের সহিত নিজের পারিশ্রমিক বলিয়া বিবেচনামত একটা মাসিক টাকা খরচ হিসাবে লিখিতে হইবে, কিন্তু সে টাকা যথেচ্ছমত লিখিলে চলিবে না। আবাদ ও মূলধনের পরিমাণানুসারে কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে মাসিক যত বেতন দেওয়া উচিত, নিজের পারিশ্রমিক তদপেক্ষা কিছুতেই অধিক হওয়া উচিত নহে। নিজের টাকা, নিজের ক্ষেত, নিজের কার্য্য ভাবিয়া

যিনি যথেচ্ছভাবে অপরিমিত অর্থব্যয় করেন, তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন।

লাভও দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নিত্য পরিমিত ব্যয় দ্বারা, এবং দ্বিতীয়তঃ আমদানী হইতে খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হয়—তাহার দ্বারা। সামান্য বিষয়েও পরিমিত ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। "Economy is the source of plenty" এই প্রবাদটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রের নিমিত্ত এককালীন, বার্ষিক, মাসিক বা দৈনিক যে কিছু খরচ হইবে, তাহা অতিশয় বিবেচনার সহিত করিতে হইবে। প্রতি টাকায় যদি এক পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত বা অন্যায় খরচ হয়, তাহা হইলে একশত টাকায় ১৸৴০ আনা হয় এবং সেই ১৸৴০ আনায় বলদের জন্য বিচালী কিম্বা ক্ষেত্রে সার দিবার জন্য খইল খরিদ করা যাইতে পারে। অপব্যয় লোকে জানিতে পারে না। সচরাচর ইহা অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে, তবে চেষ্টা করিলে যে বুঝিতে পারা যায় না তাহা নহে। অনেকে ক্ষেত্রের সমুদায় ফসল বিক্রয় করিয়া ফেলেন, এমন কি বীজ পর্য্যন্ত রাখেন না এবং তাহাতে হয় এই যে, প্রয়োজনকালে পুনরায় অধিক মূল্য দিয়া সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়, অথবা কর্জ্জ করিয়া লইলে এক মণের পরিবর্ত্তে দেড় বা দুই মণ দিতে হয়।

ক্ষেত্রের জন্য কোন সামগ্রীই খুচরা খরিদ করা উচিত নহে, ইহাতে অধিক খরচ পড়িয়া যায় এবং জিনিসও ভাল পাওয়া যায় না। নিত্য হইতে সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক হইতে মাসিক এবং মাসিক হইতে বার্ষিক খরিদ করায় লাভ আছে। মোট কথা,—যত অধিক পরিমাণে জিনিস খরিদ করা যায়, ততই সুবিধা দরে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, টাকাটা যেন অনর্থক আবদ্ধ না থাকে, কারণ

টাকার একটা বর্ত্তমান মূল্য বা Present worth আছে। প্রয়োজনানুসারে টাকার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঘর-সংসার করিবার কালে আমরা তাহা নিত্যই বুঝিতে পারি। এ সকল কথা অর্থনীতি শাস্ত্রসম্ভূত, সুতরাং এ স্থলে সে বিষয় লইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত নহে। তবে এ-স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, কোন সময় বা কোন কার্যের জন্য টাকা আবদ্ধ রাখা উচিত বা অনুচিত তাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচ্য। টাকার কার্য্যই,—মুনাফা বা লাভ উৎপাদন এবং যে টাকা যতবার ও যত শীঘ্র ঘুরিয়া অর্থস্বামীর হস্তে পুনরাগত হয়, ততই লাভের বিষয়।

ক্ষেত্রে যখন ঠিকা মুনিষ নিযুক্ত করিতে হইবে তখন বাজার দর কি তাহা জানিতে হইবে এবং যদি তখন সুবিধাজনক বোধ হয় তবেই সে সময়ে ঠিকা জন নিযুক্ত করা উচিত নতুবা বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত অতিরিক্ত দরে নিযুক্ত করিলে অর্থের অপব্যয় হয়। ঠিকা মুনিষের দর সময়ে সময়ে সুলভ হয়, আবার অন্য সময় মহার্ঘ্য হয়। এক সময়ে দেখা যায়—প্রতি টাকায় ৪।৫টা শ্রমিক পাওয়া যায়, আবার এক সময়ে হয়ত ২।৩টা পাওয়া কঠিন হয়। সুতরাং প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে ঠিকে জন-মজুর নিযুক্ত করিতে হয়।

জন মজুরের পারিশ্রমিক বা মজুরী সময় বিশেষে কেন কম-বেশী হয় তাহাও জানিয়া রাখিবার বিষয়, কারণ তাহা হইলে আপনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন সময়ে জনের মজুরী বাড়ে বা কমে।

ধান বোনা, ধান রোয়া ও ধান কাটা—এই তিনটী কাজের সময় সমাগত হইলে জন মজুর দুর্ল্লভ হয় কারণ সে সকল সময়ে সকল কৃষকই আপনাপন ক্ষেতের কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করে। যাহারা আপাততঃ স্থানান্তরে গিয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছে তাহারা নিজ নিজ চাষের কাজে ফিরিয়া আসে ফলতঃ অপর সাধারণের লোকাভাব ঘটে। সহর-

সদরেও সে সময় লোকাভাব ঘটে। যাহাদিগকে চাষ-আবাদের জন্য ঠিকা জনের উপর অল্পাধিক নির্ভর করিতে হয়, তাহাদিগকে ঠিক প্রয়োজন কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যতটা পারা যায় কাজ সারিয়া রাখিবার চেষ্টা করা উচিত কিম্বা অতিরিক্ত হারে জন নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও মিতব্যয়িতার সংস্রব আছে, এজন্য ক্ষেত্রের তারতম্য ও সুবিধার সহিত মূলধনের সামঞ্জস্য রাখিয়া ভূমি নির্ব্বাচন করা উচিত। কঠিন, জঙ্গলময়, পতিত, অনুর্ব্বরা জমিতে আবাদ করিতে অপেক্ষাকৃত খরচ অধিক লাগে কিন্তু আবাদী ও উর্ব্বরা জমিতে আবাদ করিতে তাহাপেক্ষা অনেক অল্প খরচে হয়। আবার সহর সান্নিহিত জমিতে যে পরিমাণ খরচ পড়ে, পল্লীগ্রামের জমিতে তত পড়ে না। সহরের জিনিস-পত্র মহার্ঘ্য, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের খরচ অধিক, শ্রমের চাহিদা (demand) অধিক সুতরাং অধিক পারিশ্রমিক না পাইলে শ্রমিকগণ তথায় কাজ করিতে পারে না। পল্লীগ্রামের সকল সামগ্রীই অপেক্ষাকৃত সুলভ বলিয়া লোকের মজুরীও সুলভ, এজন্য সহর হইতে দূরে কৃষিকার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। যেখানে জন-মজুরের মজুরী অধিক, জমির অবস্থান (Situation) বা খাজনা অসুবিধাজনক, হাটবাজার বা সহর দূরে, সেরূপ স্থানে চাষ-বাস করিতে গেলে বহু ব্যয়ের সম্ভাবনা।

ক্ষেত্রজাত কোন দ্রব্যই অবহেলাযোগ্য নহে, কৃষিকার্য্যে আবর্জ্জনারও মূল্য আছে। শস্যাদি মাড়িয়া-ঝাড়িয়া লইলে যে আবর্জ্জনা থাকে তাহা এবং খোঁয়াড়, আস্তাবল ও গোয়াল ঘরের গোমধ, চোণা ও খড়, ক্ষেত-খামারের জঞ্জাল, তৃণ-জঙ্গল, পুষ্করিণীর পানা, কচুরী (Water Hyacinth), সেওলা প্রভৃতি কোন আবর্জ্জনা নষ্ট না

করিলে সারের অনেক সাশ্রয় হইয়া থাকে। এই সকল আবর্জ্জনা ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হয় সুতরাং অন্য সার অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে দিলেই চলিতে পারে।

কার্য্যশৃঙ্খলতার সহিতও মিতব্যয়িতার সম্বন্ধ আছে। লোক-জন অলসভাবে না কাল কাটায় অথবা যে কার্য্যের আবশ্যক নাই, এরূপ কার্য্যে অনর্থক সময় অতিবাহিত না করে কিম্বা এক দিবসের কার্য্য দুই দিবসে অথবা এক বেলার কার্য্য দুই বেলায় সম্পন্ন করিয়া সময় অপব্যয় না করে,—এ সকল বিষয়েও ক্ষেত্রস্বামীর বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। আট জন লোকে সমস্ত দিনের মধ্যে এক ঘণ্টার হিসাবে অপব্যয় করিলে ক্ষেত্রের একজন লোক কামাই হইল কিম্বা অর্থ বিষয়ে দুই-চারি আনা হইতে আট দশ আনা ক্ষতি হইল বুঝিতে হইবে। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি ক্ষেত্রস্বামী স্বীয় অধীনস্থ জন-মজুরকে কাজের সময় নানারূপ কাজের আদেশ করিয়া থাকেন, ফলতঃ তাহাকে হস্তস্থিত কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হয়। ক্ষেত বা বাগিচার জনেরা যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত তাহা-দিগকে সেই কার্য্যেই নিয়োজিত থাকিতে দেওয়া উচিত। দুই চারিটী পয়সা বাঁচাইবার জন্য অনেক সময় প্রভুগণ জনদিগকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করেন। ইহা অতি দৃষ্টি-কৃপণতা। হাতের কাজ ফেলিয়া স্থানান্তরে গেলে কিম্বা অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপাততঃ কয়েকটী পয়সা বাঁচিয়া যায় বটে, কিন্তু আসল কাজে তদপেক্ষা বহু-গুণ ক্ষতি হয়। এ সকল বিষয় সামান্য মনে করা উচিত নহে।

ক্ষেত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জমির সহিত ভাবী কৃষকের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্থির থাকা উচিত। অনেকে জমি ইজারা বন্দোবস্তে, অনেকে মৌরসী, অনেকে যোতসত্বে,

আবার অনেকে ঠিকা বন্দোবস্তে জমিদারের নিকট হইতে জমি লইয়া কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। মৌরসী ও যোত বন্দোবস্ত ব্যতীত অপর কোন বন্দোবস্ত আমাদিগের সুবিধাজনক মনে হয় না।

জমির উপর বিশেষ অধিকার বা স্থায়ী সত্ব না থাকিলে তাহার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে কাহারও আগ্রহ হয় না এবং জমির প্রতিও প্রজার অনুরাগ জন্মে না। দুই-পাঁচ বৎসরের জন্য যে জমি গৃহীত হয় কোন্ ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে প্রস্তুত? নূতন জমি লইয়া তাহাকে দুরস্ত ও তৈয়ার করিতেই বহু ব্যয় হয় এবং ইহাতেই প্রায় দুই তিন বৎসর কাটিয়া যায়, তখন পরের জন্য এতদূর করিয়া যাইবার প্রয়োজন কি? অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া যদি তাহার উপসত্ব ভোগ না হয়, তবে জানিয়া-শুনিয়া সে কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করে? আবার জমির উন্নতি না করিলেও কৃষিকার্য্যে লাভ হয় না। সুতরাং জমিতে স্থায়ী কোন সত্ব থাকা উচিত। একজন জমি পরিষ্কার করিয়া হলচালনা ও সার প্রয়োগ দ্বারা মাটি তৈয়ার করিল, অন্যদিকে অপর একজন সেই জমির উপর লোলুপ হইয়া জমিদারের নিকট হইতে অধিক হারে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া উহা গ্রহণ করিল; অথবা একজন প্রজা জমি হইতে বেশ লাভবান হইতেছে দেখিয়া জমিদার স্বয়ংই তাহার হার বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিলেন এবং এ প্রস্তাবে সে ব্যক্তি সম্মত না হইলে অপর ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অল্প মিয়াদী জমির এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক কালের মিয়াদ থাকিলে অথবা জমিতে স্থায়ী সত্ব থাকিলে প্রজা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাহার উন্নতিসাধন করিয়া থাকে এবং অধিককাল একই জমিতে থাকায় জমির উপর তাহার অনুরাগ জন্মে। অতঃপর সে ব্যক্তি ততোধিক যত্নসহকারে

বারমাস ক্ষেত উর্ব্বরা রাখিতে চেষ্টা করে। যাহারা ঠিকা নিয়মে জমি লয়, তাহারা তাহার উন্নতি করা দূরে থাকুক বরং তাহাতে হয়ত এরূপ ফসল উৎপন্ন করিয়া লয় যে, পরে সে জমি কিছুদিনের জন্য একবারে ক্ষীণ বা নিঃস্ব হইয়া পড়ে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর নূতন জমি লইয়া তাহারা বহু ক্ষেত্রের অনিষ্ট সাধন করে। ইহাতে জমিদারের বিশেষ ক্ষতি হয়, কেন না, জমি অনুর্ব্বরা হইলে তাহার হার কমিয়া যায়, কিন্তু ইঁহাদের সে বিষয়ে দৃষ্টি অতি অল্প। এই সকল কারণবশতঃ আমরা ঠিক বা অল্পদিনের ইজারার পক্ষপাতী নহি।

প্রাকৃতিক অবস্থান ও মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে খাজনার ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। সহর বা সহরতলীর খাজনা স্বভাবতঃ অধিক হয়, এজন্য সে সকল স্থান চাষবাসের উপযোগী নহে। এরূপ জমি বাগানের উপযোগী হইতে পারে।

আবার শস্যশালিনী, উর্ব্বরা ও আবাদী জমির যে খাজনা, ডোবা অনুর্ব্বরা ও পতিত জমির খাজনা তাহাপেক্ষা অনেক কম। নিকৃষ্ট ও অনুর্ব্বরা জমিতে আবাদ করিতে হইলে অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। অন্য দিকে, ডোবা জমির উপর নির্ভর করা উচিত নহে, কেন না বর্ষা অধিক হইলে অথবা বন্যা আসিলে সমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়।

জমি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আরও একটা গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে বাকী আছে। প্রস্তাবিত জমি যেন হাটবাজার বা সহরের সন্নিকটে হয়, সে স্থান হইতে রেলপথ অধিক দূরে না হয়, অথবা নদী যেন নিকটে হয় এবং সে স্থান হইতে শকটাদি চলাচলের রাস্তা থাকে, ক্ষেত্রকার্য্যের জন্য যেন লোকজন সহজে পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় সকল অবশ্য বিবেচ্য। যে স্থানে গমনাগমনের রাস্তা নাই, রেল-পথের

সহিত যে স্থানের সংস্রব নাই, নদীতে যাতায়াতের সুবিধা নাই, যেখানে শ্রমজীবীর অভাব, এরূপ স্থলে কৃষিকার্য্য দ্বারা লাভবান হইবার আশা অতি অল্প। দূরে বা জঙ্গল মধ্যে ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইলে তথাকার শস্য ও ফসল বিক্রয়ের উপায় নাই, ক্ষেত্রের জন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার স্থানান্তর হইতে আনাইতে হইলে অনেক খরচ পড়িয়া যায়, তাহা ব্যতীত আরও নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল সহরে পাঠাইতে হইলে যদি খরচ অধিক পড়ে, তাহা হইলে লাভ কম হইবে। ব্যক্তিবিশেষের খরচ দেখিয়া কেহই কোন সামগ্রী খরিদ করে না, বাজারে জিনিসের যে দর সেই মূল্যেই লইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অল্প খরচায় বাজারে মাল আনিয়া হাজির করিতে পারে, সে অল্প লাভে তাহা বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু অপর ব্যক্তি তাহা পারে না বলিয়া তাহার জিনিস বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয় হইলেও হয় ত লাভ কম হয়, কিম্বা ক্ষতি হয়। আর এক কথা। সহর নিকটে হইলে অথবা মাল চালানের সুবিধা থাকিলে বাজারের অভাবানুসারে যখন ইচ্ছা তখনই মাল চালান দিতে পারা যায়। স্থানীয় লোক পাওয়া গেলে অল্প হারে বেতন দিলে চলে এবং সন্নিকটে লোকালয় থাকিলে আবশ্যকমত সময়ে সময়ে অতিরিক্ত ঠিকা মজুর যত ইচ্ছা নিযুক্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু সে সময়ে যদি লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে কেবল ফসল নষ্ট হয় তাহা নহে, তাহার জন্য ইতঃপূর্ব্বে যে ব্যয় হইয়াছে তাহাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সহরের অতিসন্নিকটে থাকিয়াও আমরা সময়ে সময়ে বড়ই লোকাভাব অনুভব করিয়াছি এবং অনেক সময় সেজন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষিশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা :—কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা স্বকপোলকল্পিত প্রণালীতে যেরূপ যোগসাধন হয় না, সেইরূপ কেবল বই পড়িয়া অথবা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কৃষিবিষয়ে পারদর্শিতা জন্মে না। কৃষিবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা পাঠ, কার্য্যনিরত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষেত্রের সমুদায় কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। পুস্তকাদি পাঠ-কালে, ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপের সময় অথবা ক্ষেত্রের কার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে তৎসমুদায় একখানি স্বতন্ত্র খাতায় লিখিয়া রাখিলে অনেক সময় তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এই জন্য ক্ষেত্রে একখানি স্মারক-বহি (note-book) রাখিতে হইবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহাতে ক্ষেত্রের সমস্ত দিবসের কার্য্য এবং কোন্ কার্য্য কোন্ প্রণালীতে সমাহিত হইল ইত্যাদি লিখিয়া রাখিতে হইবে। যে দিবস যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল, তারিখ লিখিয়া না রাখিলে তাহার মূল্য অতি অল্প। এ সকল বিষয় যতই তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারা যায় ততই ভাল, কেননা অভিজ্ঞতা লাভের এমন সহজ উপায় আর নাই। অদ্যকার অভিজ্ঞতার দ্বারা আগামী কল্যকার, সম্বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে পর বৎসরের, কার্য্যের অনেক সহায়তা হইয়া থাকে। কোন্

ফসলের কিরূপ পরিচর্য্যা করায় কিরূপ ফল হইয়াছে এবং তাহাতে যদি অনবধানতাবশতঃ কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে পর বৎসর সাবধান হওয়া যাইতে পারে; কোন ফসলের বিশেষ পরিচর্য্যা হেতু তাহার ফসল বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে অথবা অন্য কোন বিশেষত্ব দেখা যাইলে, পর বৎসর তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। মন্তব্য পুস্তক হইতে এইরূপ নানাবিধ উপকার লাভ হইয়া থাকে কিন্তু না লিখিয়া রাখিলে নানা কার্য্য ও নানা চিন্তাবশতঃ সকল কথা সকল সময় মনে আসে না, অনেক প্রয়োজনীয় কথা যথা সময়ে ভুল হইয়া যায়; সুতরাং জ্ঞাত থাকিলেও সে অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশেষ কোন ফল হয় না।

কৃষক বা কৃষিকার্য্যনিরত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়। উভয়ের কৃষিবিষয়ক কথাবার্ত্তা হইতে পরস্পরের অভিজ্ঞতা একত্রিত হয় এবং যাহার যে দোষ থাকে তাহাও মীমাংসিত হইয়া যাইতে পারে, অথবা এক ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন দ্বারা যদি কোন কার্য্যে সফল হইয়া থাকেন তাহা হইলে অন্যব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন। নিজে যাহা করিতেছি, তাহাই যে সর্ব্বতোভাবে ঠিক ও নির্ভুল, তাহা মনে করা আত্মম্ভরী ব্যক্তির কার্য্য। চাষীগণের সহিত আলাপ করিয়া বা তাহাদের কার্য্যানুসরণ করিয়া অনেক মহামূল্য জ্ঞান পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে নিরক্ষর বা ইতর ভাবিয়া ঘৃণা করিলে নিজেরই ক্ষতি, বরং তাহাদিগের সহিত এমনই সদ্ভাব রক্ষা করা উচিত যে, সে ব্যক্তি যেন তোমার নিকটে আসিয়া নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। চাষীও তোমার নিকট অনেক কাজের কথা শুনিয়া গিয়া নিজের ক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষা করিতে পারে। এইরূপ সম্মিলনে উভয়েরই লাভ আছে। সেই নিরক্ষর চাষীদিগের নিকট হইতে আমাদিগের অনেক বিষয় শিখিবার আছে।

পূর্ব্বে যে খাতার কথা বলা গিয়াছে, তাহার আয়তন এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহাতে সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণ লিখিত হইতে পারে। প্রতি বৎসরেই নূতন খাতা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্য নূতন খাতা আরম্ভের জন্য বৈশাখ মাসই প্রশস্ত। যাহা হউক, উল্লিখিত পুস্তক দ্বারা আর একটী বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ফসলের লাভ ও ক্ষতি গণনা করিতে হইলে উহার মধ্যে কিয়দংশ স্বতন্ত্র রাখিয়া কোন্ ফসলে কত মজুর লাগিল, তাহাতে কত টাকার সার দেওয়া গেল এবং তাহার উৎপন্নের মূল্য কিরূপ হইল,—এ সকল লিখিয়া রাখিলে ফসলান্তে বুঝা যায় যে, তাহাতে কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হইল এবং অবশেষে যদি দেখা যায় লাভ হইয়াছে, তবেই পুনরায় সে ফসলের আবাদ করা উচিত, নতুবা তাহার অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাও দেখিতে হইবে যে, উহার আবাদে কোনরূপ অন্যায় পাট বা খরচ হেতু ক্ষতি হইল কি না? যদি অন্যায় পাট বা ব্যয় হেতু ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে ভবিষ্যতে সেরূপ যাহাতে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি এ সকল কারণাভাব সত্ত্বেও ক্ষতি হইয়া থাকে, স্থানীয় মৃত্তিকা বা জলহাওয়া ফসলবিশেষের উপযোগী নহে জানিয়া তাহার আবাদ না করাই ভাল।

সাধারণ জমা-খরচের বহি যে একখানি থাকিবে, এ কথা বলা বাহুল্য। ইহাতে ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় খরচ ও আয়ের বিষয় লিখিতে হইবে। অনেকে মজুত ফসল অথবা স্বীয় খরচের জন্য যে ফসল লইয়াছেন, তাহা জমা-খরচের বহির মধ্যে লিখিতে রাজী নহেন। বৎসরের শেষে ক্ষেত্রে বা গুদামে যে পরিমাণ ফসল মজুত

থাকে তাহার একটী আনুমাণিক মূল্য ধার্য্য করিয়া যেমন জমা খাতে লিখিতে হইবে, সেইরূপ ক্ষেত্রস্বামী স্বীয় খরচের জন্য যে পরিমাণে ফসল সম্বৎসরে লইয়াছেন কিম্বা বিতরণ করিয়াছেন তাহারও একটা মূল্য স্থির করিয়া জমা খাতে লিখিতে হইবে এবং ক্ষেত্রস্বামীর নামে তাহা কর্জ্জ লিখিতে হইবে অথবা তাহার মাসিক পারিশ্রমিক বা বারবরদারী হইতে সেই টাকা বাদ দিতে হইবে। অতি সামান্য সামগ্রীও যদি ক্ষেত্রস্বামী স্বয়ং লয়েন অথবা অপরকে দিয়া থাকেন, তাহারও মূল্য খাতায় জমা পড়া উচিত। তাহা হইলেই ক্ষেত্রের প্রকৃত আয় ব্যয় বুঝা যাইবে।

পুস্তক বা সাময়িক পত্রিকা পাঠ বা অপর লোকের সহিত আলাপ দ্বারা যে নূতন বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, স্বীয় ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যাহা নূতন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া গেল, তাহা কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ সারে বা কোন্ অবস্থায় অপরের নিকট সুফলপ্রদ হইয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে ক্ষেত্রস্বামীর সুবিধা হইবে কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এজন্য যাহা ক্ষেত্রস্বামী জ্ঞাত নহেন, তাহা স্বীয় ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষার জন্য এক বা দুই বিঘা জমিকে সমভাগে খণ্ড-বিভাগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক খণ্ডে (স্বতন্ত্রভাবে পাট করিয়া) ফসলবিশেষের পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষার ফল যদি আশাপ্রদ হয়, তবেই তাহা পর বৎসর ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করা উচিত, নতুবা সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কোন ব্যক্তি জমিতে চূণ দিয়া অনেক ফসল পাইয়াছে, কিন্তু চূণের গুণ ও কার্য্য জ্ঞাত না থাকিলে জমির অনাবশ্যকতা সত্ত্বে, অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে চূণ প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকা ও ফসল জ্বলিয়া যায়। এইরূপ অনেক ক্ষতি

হয়। সুতরাং পরীক্ষা না করিয়া কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অধিক প্রশস্ত করিবার আবশ্যক নাই, কেন না, উহা কেবল নিজের সন্তোষের জন্য,—উহা হইতে আর্থিক লাভের প্রত্যাশা নাই।

পরীক্ষাক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে না হইয়া একই স্থানে এক খণ্ড জমিকে ভিন্ন ভিন্ন উপ-খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ইচ্ছামত পরীক্ষার সূচনা করা উচিত। পরীক্ষাকালে যে যে উপ-খণ্ডে যে প্রকার তদ্বির করা হয়, যে সার দেওয়া হয় বা যে ফসল দেওয়া হয়, তাহা সবিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত। পরীক্ষার উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেক খণ্ডের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা যথাসময়ে ও যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে বক্সারের গোধূম আবাদ করিতে হইলে, প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, উক্ত গোধূম এদেশে জন্মিতে পারে কি না এবং পারিলেই বা তাহার ফলন কিরূপ হইবে, তাহাতে খরচ পোষাইতে পারে কি না, কিরূপ জমির আবশ্যক, —এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকের জন্য এক এক টুকরা জমি দিতে হইবে। এই জন্য ছয় খণ্ড জমি লইয়া প্রথম খণ্ডে দেশী বীজ, দ্বিতীয় খণ্ডে বক্সার বীজ, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সার দিয়া এবং ষষ্ঠ খণ্ডে জলসেচন দ্বারা শেষোক্ত গোধূম কিরূপ জন্মে তাহা দেখিতে হইবে। প্রথম দুই খণ্ডের দ্বারা বুঝা যাইবে যে সহজ চাষে দেশীয় অপেক্ষা বক্সারের গম ভাল কি মন্দ জন্মে; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, বিনা সারে ও সার প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও গুণের কি প্রভেদ হয়; তৎপরে দ্বিতীয়ের সহিত ষষ্ঠের তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, বিনা জল-সেচনে ফসলের কি প্রভেদ হয়। ইহার মধ্যে যে যে প্রণালী সফল

বোধ হইবে তাহাই গ্রহণ করা উচিত। নতুবা বক্‌সার গোধূমের কথা শুনিয়াই ১০০ বিঘা জমিতে তাহারই আবাদ করা গেল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। এরূপ ব্যর্থমনোরথ হওয়া অপেক্ষা ধীর ভাবে সকল বিষয়ে পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিলে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা।—ক্ষেত্রের জন্য স্থান নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অপরাপর বিষয় বিবেচনার সহিত মৃত্তিকার অবস্থাও পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাড়াতাড়ি যথেচ্ছা এবং যে-সে প্রকারের জমি লইলে ভবিষ্যতে হয় ত পরিতাপ করিতে হয়। যদি কোন বিশেষ ফসলের আবাদ করিবার সঙ্কল্প থাকে, তাহা হইলে সেই ফসলের উপযোগী জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত, নতুবা সেই জমিকে তদুপযোগী করিয়া লইতে অতিরিক্ত খরচ পড়ে। পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত যদি কোন অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ আবাদের জন্য এরূপ জমি লইতে হইবে, যাহাতে ইচ্ছামত সকল প্রকার আবাদই হইতে পারে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সকল ফসলই এক প্রকার মৃত্তিকায় সুচারুরূপে জন্মে না। কোন ফসল এঁটেল, কোন ফসল দো-আঁশ, আবার কোন ফসল বা বেলে মাটিতে সুন্দররূপে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং মধ্যবিৎ অর্থাৎ দো-আঁশ জমি লইতে পারিলেই সুবিধা, কারণ ঈদৃশ জমি অল্পায়াসে মনোমত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এঁটেল জমিকে হাল্‌কা করিবার আবশ্যক হইলে তাহাতে ছাই, উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট বা চুণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। উক্ত জমিকে দো-আঁশ করিতে হইলে তাহার সহিত বালি মিশ্রিত করিতে হয়। দো-আঁশ মাটিকে অপেক্ষাকৃত এঁটেল করিতে হইলে পুরাতন গোবর সার বা অধিক পরিমাণে এঁটেল মাটি মিশাইয়া দিতে হয়। আবার বেলে জমির

উদ্ধার করিতে হইলে পুরাতন পুষ্করিণী খোদিত মাটি অথবা এঁটেল মাটি সংযোজিত করিলে উপকার হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে দুই হাত ব্যাস পরিমিত ভূমিতে দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন করিতে হয়। খোদিত গর্ত্তের পার্শ্বদেশ দেখিলে ভূগর্ভের অবস্থা বুঝা যায়। ভিতরে যে ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকার স্তর দেখা যায়, অভিজ্ঞতা থাকিলে তদ্দৃষ্টেই জমির ভিতরের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। শ্বেত স্তর দ্বারা বালি, হরিদ্রাভ স্তর দ্বারা দো-আঁশ এবং মাশবর্ণ স্তর দ্বারা এঁটেল মাটি বুঝা যায়। বালি বা কঙ্কর ব্যতীত যদি নিম্নদেশে একই স্তরে দো-আঁশ বা এঁটেল মাটি থাকে, তবে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এরূপ চোরা জমি অনেক আছে, যথাকার উপরিভাগের কিঞ্চিৎ পরিমাণ অর্থাৎ আধ হাত নিম্নেই বালি বা কঙ্কর স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এই জন্য জমিতে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া ভিতরের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পরীক্ষা না করিয়া জমি নির্ব্বাচন করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

উল্লিখিত প্রণালীতেও যদি কিছু স্থিরীকৃত না হয় তাহা হইলে উপরোক্ত গর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মিশাল মৃত্তিকা (average soil) লইয়া ওজন করতঃ প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। * অতঃপর পুনরায় ওজন করিলে পূর্ব্ব ওজন অপেক্ষা কম হইবে এবং যে পরিমাণ কম হইল, তাহাই মৃত্তিকার রস বলিয়া ধরিতে হইবে। অনন্তর সেই শুষ্ক মৃত্তিকা কোন লৌহ বা অন্য পাত্রে করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির

* গর্ত্ত মধ্যস্থিত তাবৎ মৃত্তিকাকে বারম্বার ওলট পালট ও চূর্ণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্তবকের মাটির আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তখন সেই মাটি গড় বা **average** মাটি হয়।

উপর ক্ষণকাল রাখিলে, তন্মধ্যস্থিত দাহ্য বা দৈব (Organic matters) পদার্থ পুড়িয়া যাইবে। তখন উহাকে তৃতীয়বার ওজন করিলে দ্বিতীয়-বারের ওজন হইতে কম হইবে এবং এই কমের পরিমাণকে দাহ্য বা জৈব পদার্থের পরিমাণ বলিয়া জানিতে হইবে। অতঃপর তাহাকে জলের সহিত উত্তমরূপে গুলিয়া এক মিনিটকাল স্থিরভাবে থাকিতে দিলে বালির অংশ তলানীরূপে পাত্রের নিম্নে সঞ্চিত হইবে। এক্ষণে ভাসমান সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহকে অন্য পাত্রে ঢালিয়া উক্ত বালি শুষ্ক করতঃ ওজন করিলে বালির অংশ নির্দ্ধারিত হইবে এবং তৃতীয়বারে ওজনের সহিত তুলনা করিলে ইহার যে পরিমাণ কম হইবে, তাহাই কর্দ্দমের (clay) অংশ জানিতে হইবে।

মৃত্তিকার সহিত চূণের যে অংশ থাকে তাহার পরিমাণ জানিতে হইলে উল্লিখিত তৃতীয় অবস্থাপন্ন পোড়া মাটি এক শত গ্রেণ বা অল্লাধিক আধ ভরি পরিমাণ লইয়া তাহাতে ৫ ছটাক জল ও সিকি ছটাক মিউরিয়াটিক এসিড্ (Muriatic acid) মিশ্রিত করিয়া কাচের পাত্রে অর্দ্ধঘণ্টাকাল রাখিয়া দাও। নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে বারম্বার উত্তমরূপে নাড়িয়া কোন সূক্ষ্ম ছাঁকুনির দ্বারা ছাঁকিয়া, ছাঁকুনি-স্থিত পদার্থ শুষ্ক করতঃ ওজন করিলে যে পরিমাণ পদার্থ কম পড়িবে—তাহাই চূণের ভাগ জানিতে হইবে। যে জমিতে অতিরিক্ত পরিমাণে চূণ আছে বা আদৌ নাই, এ প্রকার জমি সুবিধাজনক নহে।

এরূপ অনেক জমি আছে—যথায় নানা কারণে কোন ফসল সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না ; লবণাক্ত জমি তন্মধ্যে প্রধান। ঈদৃশ জমিকে আবাদোপযোগী করিয়া লইতে অনেক ব্যয় হয়, এজন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। গ্রীষ্মকালে ঈদৃশ জমির উপরিভাগে একরূপ লবণের ন্যায় শ্বেত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অথবা

বৃষ্টির ক্ষণকাল পরে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে উহা জমির উপরিভাগে প্রকাশ পায়। এরূপ জমিকে পশ্চিম প্রদেশে 'উষর' বা 'রে' জমি কহে ইহাতে আবাদ করিতে হইলে যে প্রণালীতে তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, ভিন্ন প্রস্তাবে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

অনেক স্থলে জমির উপরের স্তরে অথবা অভ্যন্তরে বোদ মাটি পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ ঘোর মশিবৎ,—শুকাইলে কয়লার ন্যায় হালকা হয়, শুষ্কাবস্থায় অগ্নিতে জ্বলিয়া যায় এবং জলে ফেলিয়া দিলে ভাসিতে থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Bog earth কহে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বহুকালের উদ্ভিজ্জ (Vegetable matters) পদার্থের সম্মিলনে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূগর্ভে যখন অবস্থান করে তখন উহা অত্যন্ত ভিজা এবং শুষ্ক হইতেও বিস্তর সময় লাগে। বালির সহিত সংমিশ্রিত হইলে উহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় কিন্তু উহা স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্যোপযোগী নহে, অধিকন্তু ভিজা অবস্থায় উহা এত আঠাবৎ ও পিচ্ছিল হয় যে, তাহাতে কোনরূপ আবাদ করা চলে না। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কাশীপুর ইনষ্টিটীউসনের উল্টাডিঙ্গী বাগানে এইরূপ একখণ্ড জমি পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অধুনা সেই মাটি কয়েক বৎসরের কর্ষণে ও সার সংযোগের ফলে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত হইয়াছে। এরূপ জমি লইয়া আবাদ করা ধনী লোকের পক্ষে সম্ভব, কৃষিকার্য্যের পক্ষে একবারেই পরিহার্য্য।

মৃত্তিকা পরীক্ষার সহজ উপায় এই যে, উহাতে উপস্থিত গাছপালার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই সহজেই বুঝা যাইবে মৃত্তিকা কিরূপ। সচরাচর যে সকল আগাছা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের বৃদ্ধি ও অবস্থা দেখিয়া জমির ইতরবিশেষত্ব স্থির করা যাইতে পারে।

মৃত্তিকা বিচার।—সকল প্রকার মৃত্তিকার সংগঠন এক প্রকার নহে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদার্থের পরিমাণের তারতম্যানুসারে একত্র সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে কর্দ্দম (Clay), বালি (Sand) ও উদ্ভিজ্জ পদার্থই (Humus) প্রধান। সাধারণতঃ এই তিন পদার্থের অস্তিত্ব প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকায় দেখা যায়। যে মাটিতে ৫০ ভাগের অধিক কর্দ্দম থাকে তাহাকে এঁটেল মাটি (Clayey Soil), যে মাটিতে ১০ ভাগের অনধিক কর্দ্দম থাকে তাহাকে বেলেমাটি (Sandy Soil), এবং যে মাটিতে ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কর্দ্দম থাকে, তাহাকে দো-আঁশ মাটি (loamy Soil) বলা যায়। পরিমাণানুসারে ইহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্যও স্বতন্ত্র।

আমরা যে গঙ্গা-মৃত্তিকা দেখিয়া থাকি এবং যে মৃত্তিকা লইয়া গৃহস্থ হিন্দুমহিলাগণ বৈশাখ মাসে শিব নির্ম্মাণ করেন, এবং যে মৃত্তিকা দ্বারা কুম্ভকার হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহাই প্রকৃত এঁটেল মাটি। ইহাকে পলি মাটিও বলা যায়। এঁটেল মাটির মধ্যে বালি অথবা জৈব পদার্থ যে একবারে থাকে না, এমন কথা বলি না।

এঁটেল মাটির ছিদ্রপথ (capillary tubes) সকল অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া সহজে তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু যাহা প্রবিষ্ট হয়, তাহাও সহজে বহির্গত হইতে না পারিয়া ভূগর্ভ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং অনাবৃষ্টির দিনে তদ্দ্বারা উদ্ভিজ্জীবন রক্ষিত হয়। ভূমির উপরে জল দিলে বা জল পড়িলে উক্ত মৃত্তিকার ছিদ্রপথের সূক্ষ্মতাবশতঃ ভূমিতে জল শোষিত হইতে অল্পাধিক বিলম্ব হয়, এজন্য অল্প বৃষ্টিতে এঁটেল মাটি শীঘ্র ভিজে না। আবার অধিক পরিমাণে বারিপাত হইলেও

তাহাদিগের সূক্ষ্ম মুখ রুদ্ধ হইয়া যায়,তন্নিবন্ধন মৃত্তিকাভ্যন্তরে জল প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া উপরেই সঞ্চিত থাকে। উপরে অধিকক্ষণ জল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে এবং পরে শুষ্ক হইয়া গেলে জমির উপরিভাগ এমনই কঠিন হইয়া যায় যে, তাহার সহিত বায়বীয় পদার্থের আর বিশেষ বা আদৌ সংস্রব থাকে না। অনেকক্ষণ সময় লইয়া টিপটিপে ধারায় বৃষ্টি হইলে এঁটেল মাটির বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কারণ তখন ছিদ্রপথ সমূহ ধীরে ধীরে তাবৎ জল শোষণ করিয়া লইবার অবসর পায়।

শোষণ ও বাহিকা শক্তি।—এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি নিকট। মৃত্তিকার বাহিকাশক্তির অভাবে ক্ষেত্রে জল দাঁড়ায় কিন্তু বাহিকাশক্তি থাকিলে ভূপতিত জল অবিলম্বে শোষিত হইয়া ভূগর্ভে নামিয়া যাইতে পারে। ছিদ্রপথের সূক্ষ্মতা নিবন্ধন মৃত্তিকা যেরূপ শীঘ্র জল শোষণ করিতে অক্ষম, সেইরূপ এবং সেই কারণেই উপরের জল নিম্নদেশে নামিয়া যাইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। ছিদ্রপথ স্থূল হইলে জল শীঘ্রই শোষিত হয় এবং তাহা নিম্নদেশে চলিয়া গেলে শোষণ কার্য্য স্থগিত হয়, ফলতঃ জল উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

ছিদ্রপথের আকারানুসারে মৃত্তিকার ধারকতা (Power of retention) হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সূর্য্যের আকর্ষণে ভূমির রস বায়ুমণ্ডলে উঠিয়া থাকে। ছিদ্রপথ সূক্ষ্ম হইলে সূর্য্যের উত্তাপ সহজে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, এই কারণে উহার সঞ্চিত রস শুকাইতে বিলম্ব হয়। আটাল মৃত্তিকার সহিত জৈব পদার্থ থাকিলে তাহার ধারকতা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বাহিকাশক্তি ও শোষণশক্তি বৃদ্ধি পায়। এঁটেল মাটির আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, আলগা অবস্থায় উহা বায়ুমণ্ডল হইতে বিবিধ বাষ্পীয় পদার্থ সমধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারে। বাষ্পীয় পদার্থ মধ্যে নাট্রোজেন, হাইড্রোজেন

অক্সিজেন ও কার্ব্বণ নামক পদার্থ চতুষ্টয় উদ্ভিজ্জীবন পোষণের পক্ষে অতীব প্রয়োজন, সুতরাং মৃত্তিকার পক্ষেও প্রয়োজন। মৃত্তিকা কঠিন হইয়া থাকিলে অথবা ভূপৃষ্ঠে জল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে, মৃত্তিকার সেই সকল বাষ্পীয় পদার্থ সকল আহরণ করিবার শক্তি থাকে না।

ধারকতার আতিশয্যবশতঃ ও রস-বিক্ষেপণ-শক্তির অল্পতা হেতু এঁটেল মাটিতে শৈত্যতা অধিক। রৌদ্রের উত্তাপে উহা শীঘ্র উত্তপ্ত বা নীরস হয় না এবং বায়ুমণ্ডল হইতে বহুল পরিমাণে বাষ্পীয়পদার্থ আহরণ করিয়া স্বীয় অভাব অনেক পরিমাণে মোচন করিতে পারে। রাত্রিকালে যখন শিশিরপাত হয় অথবা দিবা ও রাত্রি নির্ব্বিশেষে যখন শীতল বাতাস বহিতে থাকে, এঁটেল মাটি তখন উহা হইতে রস আহরণ করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে উল্লিখিত বায়ব্য পদার্থ সমূহ ভূমিতে আসিয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বেলে মাটিতে দশ ভাগের অধিক কর্দ্দমের অংশ প্রায় থাকে না। বালুকা দানার স্থূলতা ও কর্দ্দমাংশের অল্পতাবশতঃ বেলে মাটির ছিদ্রপথ (Capillary tubes) উন্মুক্ত ও স্থূল বা ফাঁদাল হইয়া থাকে, এজন্য এঁটেল মাটির ন্যায় ইহা বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিতে তত সমর্থ নহে। যাহা প্রকৃত বালি তাহা বায়ুমণ্ডল হইতে আদৌ রস আহরণ করিতে পারে না।

আঁটাল বা চিক্কণ ও বালি মাটির দোষগুণ এক প্রকার দেখা গেল। সেই সকল দোষ বা গুণের উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হওয়া অনেক সময়ে সুকঠিন। নিম্নতল চিক্কণ মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিতে বর্ষাকালে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহার উপর অনেক ফসল জন্মিতে পারে না এবং তাহার জল শুষ্ক হইতে এতই বিলম্ব হয় যে, তাঁহাতে রবি শস্য-আবাদ করিবারও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বেলে মাটি এতই নীরস এবং বাষ্পীয় পদার্থ ও জল ধারণে এতই অসমর্থ

যে, তাহাতে উদ্ভিদের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে ক্ষতি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, বেলে মাটি সামান্য রৌদ্রোত্তাপে এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, উদ্ভিদগণ সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। দো-আঁশ মাটির ধারকতা, শোষকতা, বাহিকা-শক্তি প্রভৃতি মধ্যবিৎ ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে এবং তাহার গর্ভদেশ শীতোষ্ণসঙ্কুল বলিয়া উদ্ভিদের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। দো-আঁশ মাটিকে ইচ্ছা করিলেও, বেলে মাটি অথবা এঁটেল মাটি সদৃশ করিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু একবারে বেলে অথবা এঁটেল হইলে, তাহাকে পরিবর্ত্তন করা বিশেষ ব্যয় ও বহু শ্রম সাপেক্ষ।

যে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংস্রব থাকিলে মৃত্তিকার আকর্ষণী শক্তি ও ধারকতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার প্রাধান্য বা আতিশয্যও কোন কার্য্যের নহে। এরূপ মৃত্তিকাকে ইংরাজীতে bog earth কহে। ইহার ধারকতা অত্যধিক এবং গঠন আটাবৎ ও পিচ্ছিল, কিন্তু শুষ্ক হইলে অতিশয় হাল্‌কা হয়, জলে ভাসিতে থাকে এবং অগ্নিতে পুড়িয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বহুকালের উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশে উহা উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বত্র বা সচরাচর পাওয়া যায় না। ঈদৃশ জমি আমাদিগের পক্ষে কোন কাজের নহে, তবে যে জমিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব আছে, তাহাতে উহা মিশাইয়া দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। যে জমির মাটি উদ্ভিজ্জ পদার্থবহুল তাহাকে বোদ-মাটি (Humus soil) বলা যায়। *

যে মাটিতে চূণের প্রাধান্য দেখা যায় তাহাকে কষায় মাটি (Marly

* বোদ-মাটি বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে 'পাণ্ডব-পোড়া মাটি' নামে অভিহিত। অনেকের সংস্কার—এই মাটি পাণ্ডববংশের ভস্মাবশেষ।

Soil) কহে। উহার মধ্যে আবার চিক্কণ ও দো-আঁশ আছে। উক্ত মৃত্তিকায় ৫ হইতে ·০ ভাগ পর্য্যন্ত চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়। চিক্কণ মৃত্তিকায় উক্ত পরিমাণ চূণ থাকিলে চূণ-সঙ্কুল এঁটেল, এবং দো-আঁশ মৃত্তিকায় সেই পরিমাণ চূণ থাকিলে চূণ-সঙ্কুল দো-আঁশ বলা যাইতে পারে। দুই কাঁচ্চা আন্দাজ মৃত্তিকা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হাইড্রোক্লোরিক-এসিড অথবা মিউরিয়েটিক-এসিড সংযুক্ত করিলে যদি ফেনা উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে চূণ আছে। যে জমিতে ইহাপেক্ষা চূণের অংশ অধিক, তাহাকে ক্যালকেরিয়াস (calcarious) মৃত্তিকা কহে। গোধূম, মটর প্রভৃতি যে সকল ফসলের জন্য মাটিতে অধিক চূণের প্রয়োজন, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ জমি ভাল।

তৃতীয় অধ্যায়

জলের বন্দোবস্ত।—ক্ষেত্রের মধ্যে জলের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে অনেক সময় বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্র মধ্যে অথবা যাহার সন্নিকটে জল না পাওয়া যায়, তথায় সকল প্রকার ফসলের আবাদ করা চলে না। ভাদুই ফসলে প্রায় বাঁধা জলের আবশ্যক হয় না। অনেক রবিশস্যেরও বিনা জলে আবাদ হইয়া থাকে, কিন্তু ইক্ষু, আলু, গোধূম, কার্পাস ও নানাবিধ দেশী বিলাতি সব্জি এবং অন্য অনেক ফসলের জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। সকল স্থানে,—বিশেষতঃ, সুবৃহৎ ময়দানে বা মেঠো জমিতে প্রায় পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক জমির নিকট দিয়া কোন-না-কোন নদী বা শাখানদী প্রবাহিতা কিন্তু বর্ষা অতীত হইলে তাহার জল এতদূর নামিয়া যায় যে,

তাহা ব্যবহারে আসা সুকঠিন। অতএব নদীর উপরে বিশেষ ভরসা রাখিয়া চাষ-আবাদ করা উচিত নহে। অনন্তর, নদী নিকটে থাকিলে শীতকাল হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত জমি নীরস হইতে থাকে। নদীর জল শুষ্ক হইয়া যতই নিম্নে নামিয়া যায়, ততই জমির রস হ্রাস পাইতে থাকে। এই জন্য—

ক্ষেত্রের মধ্যে জলাশয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেত্রমধ্যে জলের সুবিধা না থাকিলে তন্মধ্যে পুষ্করিণী খোদিত করা উচিত। ইহাতে ব্যয় আছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা যে বারমাস অপরিমিত সুবিধা হয়, সে কথা বিবেচনা করিলে উক্ত ব্যয় অতি সামান্যই মনে হয়। অনেকে পুষ্করিণী খননকালে ভাঁটা বা পাঁজা পোড়াইয়া থাকেন, ইহাতে পুষ্করিণী খনন কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। এইরূপে যে ইষ্টক তৈয়ার হয় তদ্দ্বারা ক্ষেত্রস্বামী নিজের ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন অথবা তাহা বিক্রয় করিয়া পুষ্করিণী খননের খরচ উঠাইতে পারেন।

ক্ষেত্রের এমন স্থানে পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে যে, সে স্থল যেন সমুদয় ক্ষেত্রের মধ্যবিন্দু স্বরূপ হয় এবং গোয়াল-বাড়ী ও বাংলার সন্নিকট হয়। ক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে পুষ্করিণীর আয়তন বা সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখা উচিত। জমি সুদীর্ঘ হইলে পুষ্করিণীকে সুদীর্ঘ, এবং ঝিলের ন্যায় করিতে পারিলে ভাল হয়, নতুবা স্থানে স্থানে এক একটী পুষ্করিণী আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া যতই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায় ততই কূপ বা ইঁদারা দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্ন ও পূর্ব্ব বঙ্গে অতি অল্প মাত্র গভীর করিয়া ভূমি খনন করিলেই জল নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য এখানে লোকে কূপ খনন করে না। যে স্থানে জল দুর্ল্লভ

এবং ৩০।৪০ হস্ত গভীর না করিলে জলের স্তর বা Water level পাওয়া যায় না সেইখানেই কূপের প্রাদুর্ভাব অধিক। সে দেশে কৃষকেরা ইঁদারার জলেই চাষ আবাদ করিয়া থাকে।

ক্ষেত্রের মধ্যে যে স্থানের মৃত্তিকা এঁটেল ও গভীর—এরূপ স্থানে পুষ্করিণী বা ইঁদারা খনন করিলে তাহাতে বারোমাস জল থাকে। বেলে ভূমির উপরিস্থ জলাশয়ের বারি অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। জলাশয়ের সহিত সমুদয় ক্ষেত্রকে নালা দ্বারা এরূপে সংযুক্ত রাখা উচিত যে, আবশ্যক হইলে যথা ইচ্ছা জল সেচন করিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

সাধারণতঃ, চাষীগণ ক্ষেত্রে জলসেচন করে না। জলের বিষয়ে যে তাহারা উদাসীন তাহার দুইটী কারণ আছে ঃ—প্রথমতঃ ক্ষেত্র মধ্যে বা ক্ষেত্রের সন্নিকটে জলের বন্দোবস্ত থাকে না; দ্বিতীয়তঃ জলাশয় খনন করিয়া লওয়া তাহাদিগের আর্থিক সাধ্যের অতীত। মেদিনীপুর ভাঙ্গড় প্রভৃতি নানাস্থানে গবর্ণমেণ্ট খাল কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন সুতরাং স্থানীয় চাষীগণ তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য খালের উত্তম ব্যবস্থা আছে, তথাকার কৃষকগণকে আবাদের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয় না। পঞ্জাবেও খালের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। জলাশয় হইতে জল উঠাইবার জন্য কেহ কেহ বিলাতী কল বসাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে, একটী কল (Pumping machine) খরিদ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, সেই অর্থ ক্ষেত্রে অন্য বাবদে খাটাইলে অধিক আয় হইবার সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামে যে ডোঙ্গা কল মোট বা সিউনী ব্যবহৃত হয়, জল উঠাইবার পক্ষে তাহাই

প্রশস্ত ও সহজ উপায় এবং সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণে অনায়াসে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিলাতী কল-কব্‌জা বিকৃত হইলে পল্লীগ্রাম ত দূরের কথা, সহরেও যে-সে জায়গায় মেরামত হইবার উপায় নাই অগত্যা হঙ্গামা পূর্ব্বক টী-টমসন কোম্পানী বা জেসপ কোম্পানীর কারখানায় পাঠাইতে হয়।

তাহা ব্যতীত, আমাদের কৃষকদিগের জমি-জমা এত অধিক নহে যে, তাহারা আবাদের জন্য কলের লাঙ্গল বা কলের পম্প (Pump) প্রভৃতি যাহারা কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে। হাজার হাজার বিঘা জমি লইয়া আবাদ করে তাহাদের পক্ষে শ্রমলাঘবকর যন্ত্র ব্যবহার করায় লাভ আছে।

পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী বা ইঁদারা থাকা আবশ্যক কেন না, সাধারণ জলাশয়ে নানারূপ ময়লা ও আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে জল দূষিত হইয়া থাকে। উহা পান করিলে মানুষ এবং গৃহপালিত পশুদিগের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। সমগ্র দেশ মেলেরিয়া রোগে ছারখার হইয়া যাইতেছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পল্লীগ্রাম জনপূর্ণ ছিল, অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় তাহা প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছে, অনেক বাড়ীই মানুষের পরিবর্ত্তে শৃগাল কুক্কুরের আবাসে পরিণত হইয়াছে; বাগান বাগিচা জঙ্গলপূর্ণ, পুষ্করিণী শুসী কল্মী হিংচা কিংবা পানায় পূর্ণ এবং জল অপেয়, অধিক কি এতই দুর্গন্ধময় হইয়াছে যে, তাহাতে স্নান কিম্বা বস্ত্রাদি ধাবন করিতেপ ঘৃণা করে। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে পল্লীগ্রামে বাস করা উচিত এবং সেই জন্য পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য সংস্কৃত করিতে হইবে। স্বাস্থ্যকর স্থান না হইলে কেহ সে সকল স্থানে বাস করিতে পারিবে না। সর্ব্বাগ্রে পল্লী সংস্কারে মনোযোগ দিতে হইবে, দেশকে নিরাময় করিতে হইবে,—ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষেত্রবিভাগ ও তাহার উপকারিতা।—বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রকে পরিমিত আকারে খণ্ড-বিভাগ করিলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে মজুরদিগের নিকট হইতে দৈনিক কাজ বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তাহা ব্যতীত, কতটুকু জমিতে কি আবাদ করা যাইবে, তাহাতে কি ব্যয় হইবে, তাহার জন্য কোন্ দিবস কতকগুলি মজুর আবশ্যক হইবে, তাহার জন্য কত বীজ লাগিবে এবং তাহা হইতে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইল বা হইবে ইত্যাদি অনেক হিসাবের সঙ্ক্ষেপ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র-বিভাগ করিবার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য,—এতদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ক্রমে ক্রমে আবাদ করিতে পারা যায়। ক্ষেত্রময় বিস্তর লোক নিযুক্ত করিয়া কোন কার্য্য একবারে আরম্ভ ও শেষ করিলে ভবিষ্যতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। এজন্য সমুদায় কাজ ক্রমে ক্রমে করিলে ভাল হয়। ক্ষেতের আয়তন যদি পঞ্চাশ বিঘা হয় এবং যদি তাহা এক সঙ্গে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করণান্তর একদিনে সর্ব্বস্থানে বীজ বপন করা যায়, তাহা হইলে তৎপরবর্ত্তী যে সমুদয় পরিচর্য্যা তাহাও এক সময়ে করিতে হইবে। পঞ্চাশ বিঘা জমিতে পাটের বীজ বপন করিলে, সেই সকল বীজ একই সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। উক্ত বিস্তৃত ভূমিতে যখন নিড়ান করিতে হইবে, তখন ক্ষেত্রস্বামীর পক্ষে মহা বিপদ

উপস্থিত হইবে, কারণ যে সকল লোকের দ্বারা এক সময়ের মধ্যে ভূমি-কর্ষণ ও বীজ বপনাদি করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগের দ্বারা নিড়ানী-কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া দুরূহ। নিড়ানীর কার্য্যে অধিক সময় লাগে এবং যথাসময়ে সর্ব্বস্থানে নিড়ানী না হইলে ফসল খারাপ হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনন্তর যখন পাট কাটিবার সময় সমাগত হইবে, তখন অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিতে না পারিলে সুশৃঙ্খলে পাট কাটিয়া উঠা দায় হইবে এবং যথা সময়ে কাটিয়া তুলিতে না পারিলে, জাগের পাট জাগেই নষ্ট হইবে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের মজুরের সংখ্যা বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে বীজ বপন করিলে এবং পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা সেই নিয়মানুসারে পরিচালনা করিলে ফসলের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। উপরন্তু সকল কাজই সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হয়, জন-মজুরের টানাটানি হয় না,—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়া থাকে। অবিবেচনার ফলে গ্রন্থকার একবার মুরসিদাবাদে বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন—আজও সে কথা বিলক্ষণ মনে আছে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রইস্‌বাগের মুনিষরা বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে পাটের বীজ ছিটাইয়া দিয়াছিল। গাছ জন্মিল, কিন্তু লোকাভাবে যথাসময়ে সমগ্র ক্ষেতের নিড়ানী হইয়া উঠিল না। পাট কাটিবার সময়ও সেই কারণে অনেক পাট কাটিয়া তুলিতে পারা গেল না ফলতঃ অনেক নষ্ট হইল। অতঃপর, কার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র জমিকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করা যায় এবং সেই অবধি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। জমিকে অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্রায়াতনে বিভক্ত না করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ দুই বা তিন বিঘা করিলে ভাল হয়। এক বিঘা জমির পরিমাণ দীর্ঘে ৮০ ও প্রস্থে ৮০ হাত অথবা ৬৪০০ বর্গ হাত। যে সকল অংশে কচ্‌ বাহির হইবে, তাহা-দিগকে সরল খণ্ডের সহিত না মিশাইয়া স্বতন্ত্র রাখিলে মন্দ হয় না।

এইরূপে সুবন্দোবস্তপূর্ব্বক ক্ষেত্র বিভাগ করিতে পারিলে ক্ষেতের সর্ব্বভাগে অনায়াসে বেড়াইয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রই পরিদর্শন করা যাইতে পারে। ক্ষেতের চৌহদ্দীর আল্‌গুলি একবার জমিয়া দৃঢ় হইয়া গেলে তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের কোন কষ্ট হয় না। আলের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। জমির এব্‌ড়ো-খেবড়োতা অর্থাৎ অসমতলতাবশতঃ তাহার উপর দিয়া চলিতে গেলে পায়ে আঘাত লাগে, কোন সময় বা পা মুচ্‌ড়াইয়া যায় এবং বর্ষাকালে কর্দ্দমে যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হয়, কিন্তু আল্‌ থাকিলে এবং তাহা চৌরস হইলে সে সকলের আর ভয় থাকে না।

প্রত্যেক খণ্ডে একটী করিয়া নম্বর দিতে পারিলে এবং সেই নম্বর সমেত ক্ষেত্রের একখানি নক্‌সা বা প্ল্যান (Plan) নিকটে থাকিলে ক্ষেত্রস্বামী গৃহে বসিয়াই কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে এবং ঘরে বসিয়াই কার্য্যের হিসাব লইতে পারেন।

ক্ষেত্র বিভক্ত করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উচ্চতল ও নিম্নতল জমি এক চৌকার মধ্যে না পড়ে। যদি ইতঃপূর্ব্ব হইতেই জমির অবস্থা এইরূপ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে এরূপ ভাবে আল দিতে হইবে যে, নিম্নতল ও উচ্চতল ভূমি যেন স্বতন্ত্র থাকে, কেন না উচ্চতল জমির উপযোগী ফসল উচ্চতর জমিতে এবং নিম্নতল জমির উপযোগী ফসল নিম্নতল জমিতে আবাদ করিতে হইবে। জমিতে আল্‌ দেওয়া থাকিলে আর এক সুবিধা এই যে, আবশ্যকমত প্রত্যেক খণ্ডেই জল প্রবিষ্ট বা নিকাশ করিতে এবং বর্ষাকালে প্রত্যেক খণ্ডেই জল আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়।

সুবৃহৎ ক্ষেত্রকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভক্ত করিলে বিশেষ কোন সুবিধা না হইয়া বরং অসুবিধা হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের আয়তন

অনুসারে খণ্ড-জমিরও আয়তন নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। পাঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমিকে বিভক্ত করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ এক বিঘা, পঞ্চাশ বিঘা ক্ষেত্রের বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ দেড় বা দুই বিঘা, একশত বিঘা ক্ষেত্রের বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ দুই বা তিন বিঘা এবং দুইশত বিঘার ক্ষেত্রকে বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ তিন বা চারি বিঘা করা উচিত। চার বিঘার অধিক কোন খণ্ডের পরিমাণ না হয়, কেননা তাহাতে কাজের বড় বিশৃঙ্খলা হয়।

বাঁধ বা আল্।—কৃষাণদিগের দোষে ক্ষেত্রের আল্ ভাঙ্গিয়া যায়। এক ক্ষেত্রে চাষ দিয়া যখন তাহারা বলদ ও লাঙ্গল সমেত অন্যত্র গমন করে, তখন লাঙ্গল জমি হইতে উঠাইয়া না লওয়ায় আল্ খোদিত হইয়া যায়। এইরূপ বারম্বার হইলে আল্ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায় ফলতঃ পুনরায় তাহাকে মেরামতের আবশ্যক হয়, এজন্য কৃষাণদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

বর্ষাকালে জল-কাদায় নূতন আল নির্ম্মাণ বা আলের মেরামত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সুবিধাজনক নহে অধিকন্তু, সে সময় আবাদের সময়। আবাদের কার্য্য ফেলিয়া এ কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে। মাঘ-ফাল্গুন মাস হইতে যেমন-যেমন জমি হইতে ফসল উঠিয়া যাইবে, সেই সঙ্গে আল্ ও অন্যান্য মাটি কাটিবার কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে হইবে। আল্ বাঁধিবার পর বৃষ্টিতে অনেক মাটি ধুইয়া যায় ও তাহাতে আলের কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। সেগুলি এই সময়ে একবার মেরামত করিয়া দিলে যখন তাহার উপর ঘাস জন্মিবে তখন আর তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই।

অনেকেই অপ্রশস্ত আল্ করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ আলের উপর

দিয়া লোক-জন বা গো-মহিষের যাতায়াতের পক্ষে বড় অসুবিধা হয়। ক্ষেতের ভিতর দিয়া গো-মহিষ লইয়া গেলে তাহাদিগের পদভারে অনেক ফসল নষ্ট হয় এবং অনেক ফসলও যাতায়াত কালে তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত, স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন মাটিতে কাঁচল ধরে, মাটি কঠিন হইয়া যায়—ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে।

উচ্চ ও বেলে জমির আল অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বাঁধিলে তাহাতে অধিক জল আটক হইয়া থাকে। নিম্ন ভূমির আল অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আমন ধান্যের জমির জন্য আরও কিছু উচ্চ আল হওয়া প্রয়োজন।

জল ও মৃত্তিকা।—জলের সহিত মৃত্তিকা ও সারের কিরূপ সম্বন্ধ এবং তাহাদিগের পরস্পরের কার্য্যই বা কি তাহা জানিয়া রাখা উচিত। বায়ু ও জল ব্যতীত উদ্ভিজ্জীবন রক্ষা পাইতে পারে না। এতদুভয় পদার্থ হইতে উদ্ভিদ বিচ্ছিন্ন হইলে কেবল মৃত্তিকার দ্বারা উদ্ভিদের কোন উপকার হয় না।

মৃত্তিকার জীবন আছে—একথা বলিলে পাঠকগণের হাস্যোদ্রেক হইতে পারে কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থির চিত্তে প্রণিধান করিলে আমাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। সংসারে যাহার কার্য্য আছে তাহারই জীবন আছে। যে বস্তুর কার্য্য নাই, তাহা অসাড় বা মৃত। উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইলে বা কথা কহিলে জীবিত বলিয়া স্থির করা ভ্রম, কেননা তাহা হইলে বাক্-শক্তি ও চলচ্ছক্তিরহিত উদ্ভিদকে জীবিত বস্তুর মধ্যে গণ্য করা যায় না। তাহাতেই বলি—যাহার কার্য্য করিবার শক্তি আছে; তাহারই জীবন আছে।

মৃত্তিকার সহিত যতক্ষণ না জল, বায়ু ও উত্তাপ সংযুক্ত হয় ততক্ষণ

উহা অসাড় থাকে। জল, বায়ু ও উত্তাপ রোধ করতঃ মৃত্তিকার সহিত যতই উৎকৃষ্ট সার মিশাল দাও এবং সুপুষ্ট বীজ বপন কর তদ্দ্বারা বীজের কোন উপকার হইবে না। কিন্তু যে-ই বীজগুলি বায়ু, জল ও উত্তাপের সংস্পর্শে আসিবে, অমনি তাহাতে সঞ্জীবনীর কার্য্য আরম্ভ হইবে। মৃত্তিকায় রস সংযুক্ত না হইলে কেবল বায়ু ও উত্তাপ দ্বারা কোন ফল হয় না।

শুষ্ক মাটিতেও বীজ উত্তপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার দুইটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, মাটি যতই শুষ্ক, যতই নীরস হউক, ভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিলে তন্নিম্নস্থ রসোদ্গারকালে ভূগর্ভের রস শুষ্ক মাটি ভেদ করিয়া বাষ্পাকার ধারণ করে এবং পরে সেই বাষ্প জলে পরিণত হয়, ফলতঃ উপরের শুষ্ক মাটিতে স্বতঃই রসের সঞ্চার হয়। ইহাকে ভূগর্ভস্থ রসের বিক্ষেপণ বা Evaporation কহে। অনন্তর হইাও দেখা যায় যে, নির্জ্জলা শানের মেজেয় কিম্বা কোন শুষ্ক প্রস্তর খণ্ডে অথবা কোন ধাতুপাত্রে বিশুষ্ক মাটি রাখিয়া দিলে ক্ষণকাল মধ্যে তাহাতে রসের সঞ্চার হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে, ঈদৃশ অবস্থায় সেই মাটিতে কিরূপে রসের সঞ্চার হয়? মরুভূমি ব্যতীত অপর সকল স্থানের বায়ুমণ্ডলই অল্পাধিক সরস থাকে। বায়ুমণ্ডলের রস ঋতুবিশেষে কম বা বেশী হইয়া থাকে এবং সেই জন্য গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডলের আদ্র্রতা বৃদ্ধি পায়, আবার শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডল আরও সিক্ত হয়। অতঃপর, ইহাও নিত্য দেখা যায়, দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে বায়ুমণ্ডলে রস অধিক থাকে। এতদ্দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই অল্পাধিক রস বিদ্যমান। অতঃপর ইহাও জ্ঞাত থাকা উচিত যে,—

বায়ুমণ্ডলে রসের মূল কি বা কোথায়?—বায়ু-

মণ্ডলের রসের মৌলিক পদার্থ বা উপাদান জলকণা। উক্ত জলকণা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশরূপে এবং অবিভাজ্যাকারে বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়। দিবাভাগে সূর্য্যের কিরণসম্পাতফলে ধরিত্রী পৃষ্ঠ হইতে যাবতীয় রসযুক্ত পদার্থ,—জীবোদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে ভূমি এবং জলাশয়াদি হইতে বাষ্পাকারে রসরাশি আকাশে গিয়া স্থান পাইতেছে। সেই বাষ্পাকারধারী জলকণারাশিই শিশিররূপে বা বারিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। মৃত্তিকা সেই রস শোষণ করিয়া লয়। যে দেশে ভূমির বাষ্পোদ্গার নাই তথায় শিশির নাই, বৃষ্টি নাই এবং তাহাই মরুভূমি! এতৎসম্পর্কে আর একটী কথা মনে হইতেছে তাহা—

মৃত্তিকার বায়ুমাণ্ডলিক রসাকর্ষণশক্তি।--উক্ত শক্তি ইংরাজিতে Hydroscopicity নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত শক্তি, যদি মৃত্তিকার প্রকৃতই একটা শক্তি হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে উক্ত শক্তি মৃত্তিকার নিজস্বঃ কি না? আমাদের নানাবিধ গৃহস্থালী দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে কতকগুলি সামগ্রী ঠাণ্ডা বাতাস সংস্পর্শিত হইলে বায়ুমণ্ডলস্থ রসের অল্পাধিক্যানুসারে রসিয়া যায়। শর্করা, লবণ, সোরা ইত্যাদি সামগ্রী বায়ুমণ্ডলের রসাকর্ষণে বড়ই তৎপর। এই কারণে উল্লিখিত পদার্থদিগকে সর্ব্বদা, বিশেষতঃ বর্ষার দিনে, সাবধানে আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। ব্লটিং কাগজ বর্ষাকালে স্বতঃই অল্পাধিক রসসংযুক্ত হইয়া যায়। মৃত্তিকাও উক্ত নিয়মের অধীন। যে মাটিতে উদ্ভিজ্জ বা জৈবিক পদার্থ (organic matters) অনবস্থিত তাহা রস-পরিশোষণ-শক্তি হইতে বঞ্চিত। যাহাকে প্রকৃত মৃত্তিকা বলা যায় তাহাতে জৈব পদার্থ অবশ্যই থাকিবে এবং তাহার অভাবে মাটিকে মাটি নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। কৃষির হিসাবে, যাহাতে জৈব পদার্থ অবর্ত্তমান তাহাকে মৃত্তিকা বলিতে পারি না। কৃষিকার্য্যোপ-

যোগী মাটিতে উদ্ভিদখাদ্য বর্ত্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত পদার্থ ই মৃত্তিকার 'জান্' বা heart. কারণ উহার অবর্ত্তমানে মৃত্তিকার কোনই কার্য্যকরী শক্তি থাকে না। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ থাকে বলিয়া উহাতে বায়বীয় পদার্থের সঞ্চার হয়. বায়ুমণ্ডলস্থ রস মাটিতে সঞ্চিত হয়, ভূগর্ভে জীবাণুর উদ্ভব হয় এবং সেই জীবণুগণ মৃত্তিকার উপাদান সমূহকে বিগলিত হইতে সমর্থ করে। উহারা বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যের সংস্থান বিষয়ে সহায়তা করে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, মাটি যতই শুষ্ক হউক তাহাতে অবশ্যই রস সঞ্চিত হয়। কিয়ৎ পরিমাণ মৃত্তিকা উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ একস্থানে স্তূপীকৃতাকারে রাখিয়া দিলে দেখা যায়—ক্ষণকাল পরে তাহাতে রসের সঞ্চার হইয়াছে। সে রস, যৎসামান্য হইলেও তাহাতে যে কোনও বীজ বপন করা যাউক তাহা স্ফীত হয়, অঙ্কুরিত হয়। তাহা ব্যতীত সকল বীজের মধ্যেই রস থাকে এবং সেই সামান্য রসই বীজের অঙ্কুরণের পক্ষে যথেষ্ট। শুষ্ক মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার ইহাই কারণ। ঈদৃশ অবস্থায় মাটিতে অতি অল্প রস থাকে বলিয়া বপনের পূর্ব্বে মৃত্তিকাবিশেষে অল্পাধিক জলসেচন করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়, অঙ্কুরিত চারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সোরাজান।—বৃষ্টি হইলেই নাইট্রোজন বা সোরজান নামক বায়বীয় পদার্থ নাইট্রিক-য়্যাসিড্‌রূপে (Nitric acid) মৃত্তিকায় সংযুক্ত হয় এবং তাহারই ফলে বৃক্ষলতাদির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষাকালে গাছপালা পল্লবিত হয় তন্নিবন্ধন তাহাদিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় তাহার একমাত্র কারণ,—বৃষ্টি। বর্ষাকাল অতীত হইলে তাহাদিগের আর সেরূপ তেজ বা শ্রী থাকে না। ভারতীয় বৃষ্টির জলে,—ইংলণ্ডীয় বৃষ্টির জল অপেক্ষা নাইট্রোজেনের

ভাগ অল্প—ইহাই ডাক্তার ভয়েল্কার সাহেবের ধারণা। * কিন্তু সে বিষয়ে নানা লোকের নানা মত থাকিলেও খাস বাঙ্গালাদেশের বৃক্ষলতাদির যেরূপ বৃদ্ধি, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারি যে, এখানকার বৃষ্টিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে, তাহা আমাদিগের কৃষি-কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু বেহার, উত্তর-পশ্চিম এবং পঞ্জাব অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক অল্প এবং সূর্য্যোত্তাপ এতই অধিক যে, অতি শীঘ্রই ক্ষেতের রস কমিয়া যায় ফলতঃ তাহাতে সেই সকল পদার্থের অভাব হইয়া থাকে।

কেবল যে বৃষ্টি হইতে নাইট্রোজেন বা য়্যামোনিয়া (ammonia) ক্ষেত্রে সংগৃহিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা নহে। ভূমিতে রসাভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে তাহাতে জলসেচন করিলে মৃত্তিকা আর্দ্র হয়, তন্নিবন্ধন বায়ুমণ্ডল হইতে সেই সকল প্রয়োজনীয় পদার্থ স্বতঃই মৃত্তিকায় সংযুক্ত হয়। মৃত্তিকা নীরস ও শুষ্ক থাকিলে তাহাতে বায়বীয় পদার্থ সংযোজিত হইতে পারে না, সুতরাং তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় না অধিকন্তু প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে বায়বীয় পদার্থ বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া যায়। মাটি হাল্‌কা বা অধিক বালুকাসঙ্কুল হইলে তাহার উর্ব্বরতা অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে, কিন্তু দোঁ-আশ, তদপেক্ষা এঁটেল মাটি সহজে শুষ্ক হয় না বলিয়া তদন্তর্গত বায়বীয় পদার্থও শীঘ্র বিনষ্ট হইতে পারে না।

রস ও সার।—মৃত্তিকা সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল, সার সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। মৃত্তিকা যেরূপ অল্পাধিক সরস না হইলে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম, তদ্রূপ সারও বারিহীন অবস্থায় অকর্ম্মণ্য থাকে। সার—

* Dr. Voelker's Improvement of Indian Agriculture.

শুষ্কাবস্থায় থাকিলে কোন মতে উদ্ভিদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জমিতে রাশিকৃত সার প্রয়োগ করিলেও যতক্ষণ তাহা জলের সহিত একাঙ্গীভূতরূপে মিলিত না হয়, ততক্ষণ তাহা উদ্ভিদের নিকট থাকা বা না থাকা একই কথা। জলের সংশ্রবে আসিলে সার বিগলিত হইয়া জলীয় অবস্থায় পরিণত হইলে তবে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। জলের ন্যায় তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে সারের একটী পরমাণুও উদ্ভিদশরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করিলে এবং তাহাকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে জলের বিশেষ প্রয়োজন। সার যত তরল হইবে এবং তদন্তর্গত পদার্থ-যত সূক্ষ্ম হইবে, তত শীঘ্র তাহা উদ্ভিদশরীরে কার্য্য করিবে—এ কথা কৃষক তত জানে না, কিন্তু সবজীব্যবসায়ী চাষী ও ফুলবাগানের মালীগণ তাহা বিশেষ অবগত আছে। নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে আমরা বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, উদ্ভিদের গোড়ায় জলীয় সার দিলে ৫।৬ দিবসের মধ্যে তাহার কার্য্য উদ্ভিদ শরীরে প্রত্যক্ষ প্রতিফলিত হয়, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে জলীয় সার প্রদান করা সহজ কথা নহে, কারণ তাহাতে বিস্তর পরিশ্রম ও ব্যয় আছে। উক্ত কার্য্য প্রকারান্তরে সাধিত হইবার জন্য ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সার হইতে যে পরিমাণে কার্য্য লইতে হইবে সেই পরিমাণে উহাকে সর্ব্বদা সরস রাখিতে হইবে, তবে, এরূপে জল যোগাইতে হইবে যাহাতে সারের অন্তর্গত পদার্থসমূহ বিগলিত হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জল হইতে তাহা আর স্বতন্ত্র না থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে যে রস আছে, সার পদার্থ তাহার সমতুল্য বা সমকক্ষ হইলেই উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। প্রায়ই ইহা দেখা যায় যে, ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়াছে অথচ তাহাতে জল সেচনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ফসলের কোন

উপকার হইতেছে না। এ স্থলে ক্ষেত্রস্বামীর বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত যে, জলের অভাব থাকিলে সার সহজে বিগলিত হইতে পারে না, সুতরাং তদ্দ্বারা ফসলেরও কোন উপকার হয় না। বর্ষাকালে বৃষ্টির আতিশয্যবশতঃ সারের বিশেষ ও শীঘ্র কার্য্য হইয়া থাকে ; দ্বিতীয়তঃ,—উত্তাপের অল্পতাবশতঃ সার সম্পর্কিত জলীয় ভাগ শুষ্ক হইয়া ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে কিন্তু সে সকল কথার আলোচনা করিতে গেলে রসায়ন আসিয়া পড়ে। আমরা এ পুস্তকে রসায়নের বিষয় লইয়া গোলযোগ করিব না, কেননা তাহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। যে সকল পাঠক কৃষিবিষয়ক রসায়ন জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কৃষি সম্পর্কীয় রসায়নের স্বতন্ত্র পুস্তকাদি পাঠ করিলে অনেক জানিতে পারিবেন। কার্য্যকরী বিষয় লইয়াই আমরা অধিকাংশ ভাগ আলোচনা করিব এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে গুরুতর কথার বিচার করিতে বসিব না।

যত্ন সহকারে ভূমি হইতে একটি উদ্ভিদ উৎপাটন করতঃ নির্ম্মল জলে অস্তি ধীরভাবে ধৌত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মূল বা শিকড়ের গাত্রে যে সমুদায় অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বা কূপ থাকে, তাহাদিগের আকার কত ক্ষুদ্র! উক্ত কূপসমূহ এতই ক্ষুদ্র যে, মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ-নিচয় ও সার কত সূক্ষ্মাকার প্রাপ্ত হইলে তবে তাহা উদ্ভিদশরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে! এই প্রয়োজনীয় গুহ্য কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে পারিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। কেবলই সার প্রদান অথবা জলসেচন করিলে বিশেষ কোন কাজ হয় না। *

---

* গ্রন্থকার প্রণীত 'উদ্ভিজ্জীবন' নামক পুস্তকে এতদ্বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষির উদ্দেশ্য।—যেখানে একটী তৃণ স্বভাবতঃ জন্মে সেখানে যাহাতে দুইটী তৃণ জন্মে—তাহাই হইল কৃষির মূল উদ্দেশ্য। অল্প ব্যয়ে বা পরিমিত ব্যয়ে ভূমি হইতে মৃত্তিকার পূর্ণ শক্তিকে জাগরিত করতঃ যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিয়া লইতে পারিলেই কৃষির উদ্দেশ্য সফল হইল। এতদর্থে অযথা অর্থ ব্যয় না হয়, তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনন্তর ইহাও বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে, ক্ষেত্রের তাবৎ শক্তিকে যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতে পারি। ইহা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি যে, সকল জিনিষেরই একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যে ব্যক্তি এক মণ মোট বহন করিতে পারে, তাহাকে আধ মণ মোট দিলে কিম্বা সেই এক মণ মোট বহন করিবার জন্য একাধিক মজুর বা কুলি নিযুক্ত করিলে যেরূপ আর্থিক ক্ষতি হয়, অথবা যে গাভী /৫ সের দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে, তাহাকে অযত্ন সহকারে দোহন করিলে সে যদি অপেক্ষাকৃত অল্প দুগ্ধ প্রদান করে তাহা হইলে কি আমাদিগের ক্ষতি হয় না? গাভীকে পূর্ণ খোরাক ও পুষ্টিকর খাদ্য না দিলে গাভী কৃশ হয়—ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে সুতরাং ইহাতেও আমাদিগের ক্ষতি হয়। এইজন্য গাভীকে উত্তমরূপে খাওয়ান এবং যথারীতি তাহার পরিচর্য্যা করা যেরূপ প্রয়োজন, ভূমি সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম

অবলম্বনীয়। গাভী যে পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ—গৃহস্থ তাহা জানেন, সুতরাং তাহাকে অপরিমিত ভোজন করাইলে কোন ফল হয় না, আর অপরিমিত ভোজন করাও কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রচুরাধিক খাদ্যাদি প্রদান করিলে অতিরিক্তাংশ পড়িয়া থাকে সুতরাং তাহাতে গৃহস্থের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক ভূমি খণ্ডের উৎপাদিকা শক্তিরও একটী সীমা আছে এবং সেই সীমা প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামীরই জানিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু—

উৎপাদিকা শক্তি কি?—অনাদিকাল হইতে সৃষ্টির তাবৎ পদার্থ মধ্যেই একটী-না-একটী শক্তি আছেই, তবে শক্তি কখনও ব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন থাকে। শক্তির ব্যক্তাবস্থাতে তাহার কার্য্য দেখিয়া আমরা তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু অব্যক্তাবস্থায় তাহার অস্তিত্ব আদৌ উপলব্ধি হয় না। মৃত্তিকার যাহা গুণ, তাহা উক্ত শক্তিমধ্যেই নিহিত। মৃত্তিকার আবাদী অবস্থায় সে গুণ প্রকাশ পায় বটে কিন্তু শক্তির নিজস্ব কোন রূপ না থাকায় তাহা কাহারও গোচরে আসে না। ভূমি কর্ষিত হইলে সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর যতক্ষণ না সেই কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপিত হয় বা উদ্ভিদ রোপিত হয়, ততক্ষণ সে শক্তি নয়নগোচর বা উপলব্ধি হইবার নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শক্তির কোন রূপ নাই। সকল জিনিষের রূপ বা আকার থাকে না, কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি করিবার উপায় আছে। সেই জন্য শক্তি,—চক্ষে দেখিবার সামগ্রী না হইলেও, উপলব্ধি হইয়া থাকে। কর্ষণাদি দ্বারা উৎপাদিকা শক্তি উদ্রিক্ত হয়, অতঃপর তাহা উদ্ভিদের শরীরে প্রকাশ পায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধিশীলতা দ্বারা কেবল যে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় তাহা নহে, তদ্দ্বারা আমরা উহার পরিমাণও অল্লাধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারি। একদিকে তেজাল-ঝাড়াল উদ্ভিদ দেখিলেই যেমন আমরা বুঝিতে পারি যে, ভূমি খুব উর্ব্বরা, তেমনি অন্য দিকে তদভাবে জীর্ণ শীর্ণ মড়াঞ্চে গাছপালা ও তৃণাভাব দেখিলে তাহাকে আমরা অনুর্ব্বরা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি অথবা তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাই। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ভিদই যেন ভূমির উর্ব্বরতার পরিচায়ক বা পরিমাণ-যন্ত্র (Thermometer)। উদ্ভিদহীন ক্ষেত্রের শক্তি এই উপায়ে নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে।

উৎপাদিকা সংস্থাপন।—এই বিশ্বসংসারের মধ্যে তাবৎ বিষয়ে কার্য্য ও কারণ—এতদুভয়ের সমাবেশ আছেই, তাহা না হইলে কোন কার্য্যই সংঘটিত হইতে পারে না। এস্থলে উৎপাদিকা-শক্তি,—কার্য্য, এবং মৃত্তিকান্তর্গত পরমাণুরাশির সমাবেশ,—কারণ। কেবলমাত্র এতদুভয়ের সমাবেশেও কোন কার্য্য হয় না। ইহাদিগের মধ্যে একটী সমবায় কারণের প্রয়োজন, এবং সেই সমবায় কারণ—ভূমিকর্ষণ বা মৃত্তিকা-সঞ্চালন। বিনা কর্ষণেও গাছপালা আপনা হইতে জন্মিতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ফল ও পুষ্পাদি প্রদান করিতেছে—তাহাও আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। ভূমির ঈদৃশাবস্থাকে আমরা অল্পাধিক কর্ষিত বা আবাদী বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। উক্ত অনাবাদী জমি আবাদে পরিণত হইলে অর্থাৎ কর্ষণাধীন হইলে তবে তাহার উৎপাদিকাশক্তি আরও জাগরিত হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মৃত্তিকান্তর্গত পরমাণুরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে আর তাহাদিগের সমাবিষ্টভাব বা কোমলতা থাকে না এবং তখন আর উৎপাদিকাশক্তির থাকিবার স্থান থাকে না। ইহাতে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, পরমাণুরাশির একত্র সমাবেশ হইলে তবে মৃত্তিকার

উৎপত্তি হয়। অতঃপর প্রাকৃতিক ও ভৌতিক ক্রিয়াসংযোগে তন্মধ্যে উৎপাদিকাশক্তির আবির্ভাব হয়। উৎপাদিকাশক্তির ইহাই হইল আদিম বা গর্ভাবাসাবস্থা। এই অবস্থাকে প্রচ্ছন্নাবস্থা বলিতে পারা যায়। অনন্তর সমবায় কারণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাহা পরিব্যক্ত হয়।

উৎপাদিকার ইতরবিশেষ।—সকল দেশে বা সকল সময়ে বা সকল অবস্থায় ভূমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নহে—ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অবস্থান ও উচ্চতা, মৃত্তিকার উপাদান, ভৌতিকতা প্রভৃতির সহিত উৎপাদিকাশক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভূমির যথাযথ পরিচর্য্যা করিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উক্ত পরিচর্য্যার মধ্যে উত্তমাঙ্গের ভূমিকর্ষণ, ক্ষেত্রে সার-প্রদান, ক্ষেত্রের জল-নিকাশের ব্যবস্থা ও মৃত্তিকার সরসতা, —এই কয়টী প্রধান।

উর্ব্বতার বিলোপ।—সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ক্ষেত্র খণ্ডকে পতিত বা অনাবাদী অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। ঈদৃশ ভূমি মাত্রই যে নিঃস্ব বা অনুর্ব্বরা তাহা মনে করা ভ্রম। অধিক দিন ক্ষেত্রের কোন পরিচর্য্যা না হইলে মাটি জমাট বাঁধিয়া যায়। জমাট বাঁধিয়া যাইবারও কয়েকটী কারণ আছে, তন্মধ্যে—বায়ুমণ্ডলের ভার (pressure) একটী প্রধান ও অনিবার্য্য। বায়ুমণ্ডল একটী গুরু-ভার সামগ্রী। ইহার প্রতি বর্গ-ইঞ্চ ব্যাপ্তি মধ্যে প্রায় ৴৭॥০ সের বা পনর পাউণ্ড বায়ু নিরন্তর বিদ্যমান। তাবৎ জীব জন্তু ঈদৃশ গুরুভার মধ্যে নিরন্তর ও অনায়াসে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া বায়ুমণ্ডল কিছুই নহে, কিম্বা তাহার কোন ভার নাই ইহা মনে করা ভ্রম। অগাধ জলরাশি মধ্যে মৎস্যাদি জলচরগণ অবলীলাক্রমে দিবারাত্রি বিচরণ করে বলিয়া কি জলের গুরুত্ব নাই? যাহা হউক, বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব বা

ভার আছে,—ইহা স্থির। পৃথিবীতে দুইটী সুবিশাল জড় পদার্থ—জল ও স্থল, এবং তাহারই উপরে নভোমণ্ডলের তাবৎ বায়ু সংস্থিত। মৃত্তিকার জড়তা হেতু তাহার উপর বায়ুর ভার অধিক পড়ে এবং সেই জন্য কোমল ও স্থিতিস্থাপক মৃত্তিকা কালবশে দৃঢ় ও কঠিন হইয়া যায়। এতদবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভূমির বা মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সমূহ (Capillary tubes) নিতান্ত শীর্ণ বা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভ মধ্যে বায়ু, উত্তাপ, রস প্রভৃতি প্রবেশলাভ করিতে পারে না, ফলতঃ মৃত্তিকান্তর্গত তাবৎ শক্তি, মৃত্তিকার তাবৎ উপাদান, নিষ্ক্রিয়াবস্থায় থাকে। অতঃপর—

অনাবাদী অবস্থায় ক্ষেত্র অনেক দিন পতিত থাকিলে তাহাতে নানাবিধ আগাছা জন্মে, তাহার ফলে মাটি আরও দৃঢ় হইয়া যায়, আগাছা সকল ভূগর্ভস্থ নানাবিধ উদ্ভিদখাদ্যরাশি আহরণ করিয়া লয়, সুতরাং মৃত্তিকার দৈন্য উপস্থিত হয়। উলু (Imperata arundinacea) বা তদনুরূপ অধিকাংশ তৃণই অতিশয় দীর্ঘমূল, এমন কি, ভূগর্ভ মধ্যে ৩।৪ হাতেরও অধিক দূর নিম্নে তাহাদিগের মূল প্রবেশ করে এবং মাটিকে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য অপর কোন ফসলের পক্ষে একবারে অনুপযোগী করিয়া দেয়। ঈদৃশ জমি ও অরণ্যানীসম্পৃক্ত ভূখণ্ডকে সহজে আবাদোপযোগী করা দুরূহ, সময়সাপেক্ষ ও সমূহ ব্যয়সাধ্য সুতরাং তাদৃশ জমিকে আবাদোপযোগী করিতে হইলে প্রথমেই মৃত্তিকায় মধুরতা আনয়ন করিতে হইবে। এবম্প্রকারে জমি নির্ব্বাচিত হইলে তদুপরিস্থ তাবৎ গাছ-গাছড়ার ও তৃণ-জঙ্গলাদির সমূল বিনাশ সাধন করা কর্ত্তব্য। অরণ্যানীসম্পৃক্ত জমি হইলে ভূপৃষ্ঠকে ত পরিষ্কার করিতেই হইবে, তাহা ব্যতীত তন্মধ্যস্থ তাবৎ বৃক্ষের গুঁড়ি সমূহকে একেবারে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর সে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সুগভীর করিয়া পুনঃপুনঃ কর্ষণ করতঃ

অন্ততঃ কয়েক মাস তাহাতে কোন ফসলের আবাদ করিবার স্পৃহা ত্যাগ করা ভাল। উল্লিখিত প্রণালীতে ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইলেই যে, ক্ষেত্র আবাদের উপযোগী হইল তাহা নহে। ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইবার পর মৃত্তিকায় কিছুদিন রৌদ্র, বাতাস, বৃষ্টি, শিশির প্রভৃতির সংযোগ না হইলে মাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না. মাটিতে 'জান্' আসে না। ফলতঃ, উৎপাদিকাশক্তির আবির্ভাব বা বিকাশ হয় না। এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়, লোকে আচোট জমি বা অরণ্যানী পরিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই বা সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে কোন-না-কোন ফসলের আবাদে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু তাহাতে ক্ষতিই হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল বায়বাদির সহিত মৃত্তিকার ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে মাটি অসাড় হইয়া থাকে, সে অবস্থায় তাহার উদ্ভিদ পালন করিবার শক্তি প্রায় থাকে না। মৃত্তিকা বারম্বার পরিচালিত হইয়া বায়বাদির সংস্পর্শে আসিলে ভূগর্ভস্থ দোষ ও বিষন্নভাব তিরোহিত হইয়া মৃত্তিকা ক্রমশঃ মধুর ও সজীব হইতে থাকে। এই জন্য মধুরতা আনয়নোদ্দেশে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে হলচালনাদি করা বিশেষ প্রয়োজন। মৃত্তিকায় মধুরতা সংস্থাপিত হইলে মৃত্তিকান্তর্গত উদ্ভিজ্জাদিকে জীর্ণ করতঃ উদ্ভিদের আহরণোপযোগী করিবার নিমিত্ত ভূগর্ভে জীবাণুর প্রয়োজন, কিন্তু—

জীবাণু কি?—জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জগৎ—এতদুভয়কে একত্রে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, মনে হয় যে, কোন প্রচ্ছন্নশক্তি কৃপাপরবশ হইয়া অতিশয় ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, জীবাণুর সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা না জীব, না উদ্ভিদ, কারণ উহারা কিয়দংশে জীব সদৃশ, আবার কিয়দংশে উদ্ভিদ সদৃশ। উহাদের অবয়ব জীব সদৃশ হইলেও আভ্যন্তারিক গঠনাদি উদ্ভিদের ন্যায়। মৃত্তিকা সংশোধিত ও মধুর হইলে ভূগর্ভে উহাদের সঞ্চার হয়, অতঃপর তাহারা স্বকীয় ধর্ম্মবশে

মৃত্তিকান্তর্গত তাবৎ জৈবাজৈব পদার্থ সমূহকে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে অনন্নুমেয় আকারে জীর্ণ করিয়া দেয়। উক্ত পদার্থ সকল জীর্ণ হইয়া গেলে তবে তাহা উদ্ভিদশরীরে প্রবেশলাভ করিতে পারে। মাটিতে যতই সার দেওয়া যাউক, ভূমির যত রকমই পরিচর্য্যা হউক, মাটিতে উহাদিগের আবির্ভাব না হইলে মাটির জৈব ও অজৈব—কোন পদার্থই বিগলিত হইতে পারে না। এইজন্য প্রকৃষ্ট আবাদকল্পে মাটির এত পরিচর্য্যা করা হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ পদার্থই তাহাদের আহার্য্য, এই জন্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভূমিতে থাকা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত জীবাণু-গণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও অজৈব পদার্থরাশিকে এমনই অবস্থায় আনয়ন করিয়া দেয় যে, এতদুভয়বিধ পদার্থমধ্যে তখন আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। উক্ত জীবাণুগণ ইংরাজিতে micro-organism নামে অভিহিত।

দৈন্য ভূমি।—যে ক্ষেত্রে উদ্ভিদের আপাততঃ আহরণোপ-যোগী পদার্থের অভাব সংঘটিত হইয়াছে বা হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাকে দৈন্য-ভূমি নামে অভিহিত করা হইল। অনেকে ভূমির নিঃস্বতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আবাদী বা আবাদোপযোগী জমি কোন কালে নিঃস্ব হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস্য নহে। তবে, নানা কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ক্ষেত্রবিশেষের দৈন্য উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সে দৈন্য সাময়িক এবং যথাবিধি পরিচর্য্যা করিলে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারা যায়। ধরিত্রী-জননী রত্নগর্ভা, কেবল যে, রজতকাঞ্চনাদি ধাতব পদার্থ ও কয়লায় পূর্ণ, তাহা নহে। যে সকল সামগ্রীর অস্তিত্ব হেতু জগৎ সংসার জীবিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে তৎসমুদয়ের কিছুরই অপ্রতুল নাই। ধরিত্রী-গর্ভ নিঃস্ব হওয়া সঙ্গত হইলে, এতদিনে আমাদিগকে কত নূতন নূতন দুনিয়ার অন্বেষণ করিতে হইত তাহার ইয়ত্তা করা

যায় না। তবে, প্রকৃতিগত কারণে অনেক দেশের ভূমি এমন আছে যে, তথায় তৃণটী পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে না, কিন্তু মানুষের চেষ্টাফলে তাদৃশ ভূখণ্ড সমূহও ক্রমে ক্রমে শস্যশালিনী হইতেছে। উৎপাদিকা বিষয়ে ভূগর্ভ নিঃস্ব হয়—ইহা অর্ব্বাচীনের কথা। ক্ষেত্রের দৈন্য উপস্থিত হইলে কিয়দ্দিনের জন্য তাহাকে বিরাম দিবার নিয়ম আছে আমরা সে প্রথার অনুমোদন করি না। এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রের নষ্ট শক্তিকে পুনরায় সংস্থাপিত করা যায় সত্য, কিন্তু ইহাতে বিরামকাল ব্যাপিয়া তাবৎ সময়টী অনর্থক নষ্ট হয়। এইরূপে সময় নষ্ট হইলে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়, সুতরাং তাহা না করিয়া ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সার প্রদান করিলে উক্ত সময়টী নষ্ট হইতে পায় না। সার প্রদান করিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই বরং তৎপরিবর্ত্তে পর্য্যায়ের নিয়মানুসারে উপযোগী ফসলের আবাদ করিলে ভাল হয়। এতদর্থে সাধারণতঃ দালকড়াই, ধঞ্চে, শণ, নীল প্রভৃতির যে কোন ফসল বুনিতে পারা যায়। উক্ত ফসলের গাছ পাকিয়া যাইবার পূর্ব্বে হলচালনা দ্বারা তাহাদিগকে ভূ-শায়ী করিয়া দিলে ক্রমে তাহারা পচিয়া গিয়া মাটির সহিত মিলিত হয় সুতরাং তাহাতে ক্ষেত্র উর্ব্বরা হয়। ঈদৃশ ক্ষেত্রে মাঘ কিম্বা ফাল্গুন মাসে বীজ বুনিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে হলচালনা করা উচিত, কারণ তাহা হইলে সম্মুখীন বর্ষার জল পাইলে সেই সকল ভূপতিত উদ্ভিদ পচিতে আরম্ভ করে এবং অল্প দিন মধ্যেই বিগলিত হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—(০)—

সারের প্রয়োজনীয়তা।—ভারতের মৃত্তিকা চিরকাল সুফলা বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই। এইজন্য অতি অল্প ব্যয় ও অল্প পরিশ্রমে ভারতীয় কৃষকগণ স্ব স্ব অভাবোপযোগী ফসল প্রাপ্তিমাত্রেই সন্তুষ্ট থাকে। পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণ কৃষকের এখনও বোধগম্য হয় নাই। যত দিন কৃষকগণ সারের বিষয়ে ঈদৃশ হতাদর প্রদর্শন করিবে অথবা তাহার উপকারিতা বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে এবং ক্ষেত্রেরও উর্ব্বরতা স্থায়ী হওয়া অনিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত কথা লইয়া বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সারের সহিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের কতদূর নিকট সম্বন্ধ। এক খণ্ড অব্যবহৃত পতিত জমি লইয়া তাহাতে প্রতি বৎসর অবিরাম বিনা সারে আবাদ করিলে নিশ্চয় বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রথম আবাদ হইতে যতই পরবর্ত্তী ফসলদিগের প্রতি লক্ষ্য করা যায় ততই ফসলের পরিমাণ ও গুণ হ্রাস হইতে দেখা যায়। প্রথম বৎসরে যে প্রকার ফসল আদায় হয়, পরবর্ত্তী বৎসরে কখনই সেরূপ হয় না, কিন্তু সাধারণ কৃষক তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না কিম্বা করে না। কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগে জমির উর্ব্বরতা সাধিত হয়। বর্ষাকালে যে সমুদায় ক্ষেত জলে ডুবিয়া যায় তাহাতে অন্য স্থান হইতে পলিরূপে অনেক সারবান পদার্থ স্বতঃই

আসিয়া পড়ে এবং স্থানীও উদ্ভিজ্জাদিও পচিয়া সারে পরিণত হয়। এইরূপ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য কারণে জমির কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা রক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সার ব্যবহার করিলে ক্ষেতের সমূহ লাভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ,—ক্ষেত্রে উদ্ভিদখাদ্য সঞ্চিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, —উল্লিখিত স্বাভাবিক উপায়ে যে যে পদার্থ আসিবার তাহাও আসিয়া থাকে।

উর্ব্বরতা রক্ষা।—উৎপাদিকা শক্তিই ক্ষেত্রের একমাত্র সম্পত্তি। যে যে উপকরণ থাকিলে উক্ত শক্তির বিকাশ হয়, তাহারাই মৃত্তিকার ভূষণস্বরূপ। উপাদানসমূহের সমাবেশফলে ভূগর্ভ মধ্যে যে ক্রিয়াশীলতার আবির্ভাব হয়, তাহাকেই উৎপাদিকাশক্তি বা উর্ব্বরতা কহে। উক্ত উপাদানসমূহের প্রাধান্য বা অকিঞ্চিৎকরতা-নিবন্ধন উৎপাদিকাশক্তির ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কোন আবাদ শেষ হইলে এবং ফসল গৃহজাত হইলে সম্প্রতি ফসলের সহিত ক্ষেত্রের বহু উপকরণ বহু পরিমাণে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। ক্ষেত্রে অবস্থানকালে উদ্ভিদগণ খাদ্যরূপে যে সকল পদার্থ আহরণ করে, ফসল সংগৃহীত হইলে তাহার সহিত তৎসমুদয় ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হয়, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ভূগর্ভ অপরিমিত উদ্ভিদখাদ্যে নিরন্তর পূর্ণ বলিয়াই সহজে কোন ক্ষেত্র নিঃস্ব হইতে পায় না। জমিতে একবার ফসল উৎপন্ন হইলে তাহার সহিত জমির অনেক সার বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু জমিতে যদি সেই সকল পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে পুনরায় সংযোজিত করা না যায় এবং সেই অবস্থাতেই তাহাতে পুনঃ পুনঃ আবাদ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের সারাংশ আরও হ্রাস পাইয়া থাকে। এইজন্য বিনা সারে একই ক্ষেত্রে বারম্বার আবাদ করিলে জমি ক্রমশঃ নিস্তেজ

হইয়া পড়ে এবং অবশেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পাঠক যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন এজন্য এস্থলে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর হইতে এক বৃহৎ খণ্ড-জমিতে গহমা বা জোয়ার আবাদ হইত। তাহাতে কখনও কোনরূপ সার দেওয়া হয় নাই বা হইত না। সুতরাং উক্ত জমির পরিণাম কিরূপ হয় তাহা দেখিবার নিমিত্ত উহার প্রতি গ্রন্থকার বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, উক্ত জমি সাধারণ বাগানভূমিসদৃশ উচ্চ, সুতরাং বর্ষায় ডুবিয়া যায় না অথবা তাহাতে অন্য স্থানের জল আসিবার উপায় নাই। যাহা হউক, প্রথম বৎসর দেখা গেল —গাছগুলি ৮।৯ হাত দীর্ঘ, তেজাল ও পরিপুষ্ট হইল ; দ্বিতীয় বৎসরে দেখা গেল,—ফসলের আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও ক্ষীণ হইল ; তৃতীয় বৎসর,—তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইল। অতঃপর সে ক্ষেত্রে যে ফসল জন্মিত তাহাতে আবাদের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। ইহাতেই গহমার গাছ—ইক্ষুর ন্যায়—জমিকে এক বৎসর মধ্যেই সারহীন করিয়া ফেলে, তাহাতে বারম্বার বিনাসারে সেই ফসলেরই বা সেই বর্গীয় ফসলের আবাদ হইলে ক্ষেত্রের সারাংশ যে একবারেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সকল ফসল সমভাবে জমির সারপদার্থ আহরণ করে না। কোন ফসল অধিক পরিমাণে, কোন ফসল অল্প পরিমাণে, জমির সারবিশেষ আহরণ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ডিরেক্টার স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করা গেল। *

"এক বিঘা জমিতে যদি ৮ মণ ধান হয়, তবে সেই ধান ও তাহার খড় জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিলে, ঐ ছাইয়ের ওজন আন্দাজ অর্দ্ধমণ হইবে। এক বিঘা জমিতে যদি ৫০০ মণ আলু

হয়, তবে ঐ আলু জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিলেও অৰ্দ্ধ মণ আন্দাজ ছাই হইবে। আলু ও ধান্তের মধ্যে আর একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে, বিঘা প্রতি ৫০ মণ আলু উৎপন্ন হইলে, প্রায় দশ সের নাইট্রোজেন জমি হইতে খরচ হইয়া যায়, কিন্তু ৮ মণ ধান্য দ্বারা কেবল /৬ সের নাইট্রোজেন খরচ হয়। ঐরূপ ধান্য ফসল দ্বারা বিঘা প্রতি কেবল /৪ সের আন্দাজ পট্যাস খরচ হয়; কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা /২ সের আন্দাজ পট্যাস খরচ হইয়া যায় এবং ধান্য ফসল দ্বারা বিঘা প্রতি কেবল দেড় সের, কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা /৪ চুণ খরচ হইয়া যায়।"

জমি হইতে যেমন ফসল লওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই সারাংশ পূরণ করিয়া দেওয়া কৰ্ত্তব্য। গাভীকে না খাওয়াইলে গাভী দুগ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, মধুভাণ্ড হইতে যে পরিমাণ মধু বাহির করিয়া লওয়া যায়, সেই পরিমাণে উহাকে পূর্ণ করিয়া না দিলে শীঘ্রই ভাণ্ড শূন্য হইয়া আসে। গাভীকে অনাহারী রাখিয়া নিত্য দোহন, মধুভাণ্ডকে পুনঃ পুনঃ পূরণ না করিয়া ক্রমাগত মধু আহরণ এবং বিনা সারে এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদ—একই কথা। মৃত্তিকা মধ্যে যে সার বা উদ্ভিদখাদ্য আছে তাহাকে ভূমির মূলধন মনে করা উচিত। সেই মূলধনের যাহা যাহা উপস্বত্ব তাহাই ব্যবহার করা বিচক্ষণতার কাৰ্য্য। ক্ষেত্র হইতে ফসল লইয়া তাহাতে যথাযোগ্য সারপ্রদান না করিলে মূলধন খরচ করা হইয়া থাকে, কিন্তু পুনরায় যদি যথাপরিমাণে উপযুক্ত সার দ্বারা ক্ষেতের অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উপসত্ত্ব ভোগ করা হয়। এই কথাটী বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া রাখা উচিত এবং তদনুসারে কাজ করিলে ক্ষেত্রের সারবস্তু কখনই নষ্ট হয় না,

সুতরাং তাহার উর্ব্বরতাও চিরদিন সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা কৃষিকার্য্যকে জীবিকাস্বরূপ ভাবিয়া থাকেন, যাঁহারা ইহা দ্বারা লাভবান্ হইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা স্থায়ীভাবে এক স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষরূপে উক্ত কথাটী স্মরণ রাখিয়া কাজ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেশে ক্ষেত্রে সার প্রদানের প্রথা তাদৃশ প্রচলিত না থাকায় দেশের প্রায় সমুদয় সার নষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে সার নষ্ট হওয়া অলক্ষণের বিষয়। কে না দেখিতেছে যে, কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে, যাবতীয় আবর্জ্জনা ও সার প্রায় অপচয় হইয়া থাকে? বড় বড় সহরের যাবতীয় আবর্জ্জনা গাড়ী বোঝাই হইয়া স্থানান্তরিত হইয়া থাকে কিন্তু সে সকল জঞ্জাল কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইলে দেশের উর্ব্বরতা কত বৃদ্ধি পায় এবং মিউনিসিপালিটীগণ প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

জাপানীরা প্রায় বিনা সারে কোন ফসলের আবাদ করে না। তাহারা জানে যে,—"Without continuous manuring there can be no continuous production. A small portion of what I take from the soil is replaced by nature (atmosphere and rain), the remainder I must restore the ground" * অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে সারপ্রদান ব্যতিরেকে বারমাস ফসল জন্মিতে পারে না। ক্ষেত্র হইতে যাহা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার কিয়দংশ প্রকৃতি হইতে সঞ্চিত হয়, অবশিষ্ট অংশ আমাকে

Schrottky's Principles of Rational Agriculture.

দিতে হইবে। এই কয়েকটী কথা অমূল্য সত্য এবং প্রত্যেক কৃষকেরই তদনুসারে কাজ করা উচিত। জমি অনুর্ব্বরা হইলে সার ত দিতেই হইবে,—এবং উর্ব্বরা জমি হইলেও তাহাতে যথা পরিমাণে সার প্রদান করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত সার হ্রাস না পাইয়া সমভাবেই থাকে অথবা সমধিক উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগ দ্বারা যে, ক্ষেত্রের কেবল উর্ব্বরতা রক্ষিত হয় তাহা নহে। ক্ষেত্রে সার দিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। সার দ্বারা ফসলের পরিমাণ, পুষ্টি ও আকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত মৃত্তিকা কোমল ও স্থিতিস্থাপক হয়, তন্নিবন্ধন মৃত্তিকার রস, উত্তাপ ও বায়ু আহরণ ও ধারণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায় ; ভূগর্ভ মধ্যে উদ্ভিদের মূলগণ অবাধে বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইতে পারে, সুতরাং অধিক পরিমাণে খাদ্যাদি আহরণ করিতে সমর্থ হয়। সার প্রয়োগ দ্বারা সাধারণতঃ ফসল মাত্রেই উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বিশেষ সার দ্বারা ফসল-বিশেষ শীঘ্র ও প্রভূত উপকার পাইয়া থাকে, কিন্তু মৃত্তিকার অভাব, ফসলের প্রয়োজন ও সারের প্রকৃতি না জানিয়া যথেচ্ছভাবে সার প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে। উগ্র সার না হইলে ফসলের ক্ষতি না হইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষেত্রস্বামীর অপব্যয় হয় ইহাও স্পৃহনীয় নহে। এরূপ যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা সার, জমি বা ফসলের দোষে নহে,—ক্ষেত্রস্বামীর অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন করাইতে হইলে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে তাহার রোগ নির্ণয় করিতে হয় এবং ধাতু ও ঔষধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়; ক্ষেত্রে সার দিবার সময় ঠিক সেই প্রকার বিবেচনার আবশ্যক। অম্লবিশিষ্ট জমিতে (Calcarious) স্বভাবতঃই চূণের আধিক্য থাকে, কিন্তু চূণের প্রাদুর্ভাব

সত্ত্বেও তাহাতে চূণ প্রয়োগ করিলে ক্ষেত ও ফসল,—উভয়েরই অনিষ্ট করা হয়। আবার—যদি এক মণ চূণ দিলে কোন জমির অভাব পূরণ হয়, তাহাতে দুই তিন মণ চূণ দিলে নিশ্চয় অনিষ্ট হইবে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অবিমৃষ্যভাবে সার প্রদান করা হয় বলিয়া সার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অনেক গ্লানি শুনা গিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সার চিরকালই সার আছে ও থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে সারের যে গুণ ছিল, এক্ষণেও তাহা আছে এবং ভবিষ্যতেও তাহা থাকিবে। সকল দিক স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া সার দিতে পারিলে মুষ্টিযোগের কার্য্য হইয়া থাকে।

ভূমির সমতলতা।—সকল স্থলে সমতল ভূমি পাওয়া সুকঠিন, এজন্য অসমতলভূমি সমতল করিয়া লওয়া উচিত। সমুদয় ক্ষেতকে একই সমতলতায় পরিণত করিতে হইলে অনেক খরচ পড়িয়া যায়। সহজে সমতল করিবার জন্য ক্ষেতকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে সমতল করিয়া লইতে হইবে। সমতল করিবার সহজ উপায়,—উচ্চভূমি হইতে কার্য্য আরম্ভ করা। এরূপ করিলে উচ্চ হইতে ক্রমে নিম্নদিকে সমগ্র জমি সোপানের ন্যায় দেখায়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, তথাকার চাষীগণ কিরূপ প্রণালীতে জমিকে সমতল করিয়া থাকে। জমি অসমতল থাকিলে সকল স্থানের ভূমিতে সমান পরিমাণে রস থাকিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, উচ্চ স্থানের জল গড়াইয়া নিম্নতল স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয়, ফলতঃ নিম্নতম স্থানের শৈত্যতা ও আর্দ্রতা অধিক হয়। অন্যদিকে উচ্চ কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমি কেবল যে শুকাইয়া যায় তাহা নহে, তাহার উপরিভাগের সারাংশও বিধৌত হইয়া নিম্নদিকে নামিয়া আসে, ফলতঃ উচ্চাংশের উর্ব্বরতা হ্রাস প্রাপ্ত

হয় কিন্তু সমতল ও আলবদ্ধ থাকিলে ক্ষেতের জল ক্ষেতেই শোষিত হয়, সুতরাং তাহার কোন অংশ ভূমি হইতে বহির্গত হইতে পায় না এবং সেই জন্য বর্ষার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত মাটি বেশ সরস থাকে।

অসমতল জমির সর্ব্বস্থানে সমভাবে ফসল জন্মে না। ঈদৃশ জমির উচ্চাংশে রস ও সারের অনটন হয়, অনেক সময়ে অভাব হয় কিন্তু নাবাল জমিতে তাহা হয় না। ক্ষেত্রের সর্ব্বাংশে সমভাবে ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে সমগ্র ভূমি সমতল করিয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেতের চারিদিক আল দ্বারা যে আবদ্ধ করা যায়, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য,—স্থানীয় সার ও জল যথাস্থানে আবদ্ধ রাখা। অতঃপর, ছেঁচের জল দিতে হইলে ক্ষেত সমতল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা নিম্ন স্থান হইতে উপর দিকে জল লইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব, আবার উচ্চ অংশ হইতে জল সেচন করিলে সমুদয় জল গড়াইয়া নিম্নাংশে চলিয়া আসে। এই সকল কারণে অসমতল জমিকে অংশে অংশে সমতল করিয়া লওয়া উচিত।

ভূম্যাদির মাপ নির্দ্দেশ।—দ্রব্যাদির ওজন ও জমি মাপিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। কোন স্থানে ৬০ সিক্কায়, কোন স্থানে ৮০ সিক্কায়, আবার কোন স্থানে ১০০ সিক্কায় একসের হইয়া থাকে। জমির মাপ সম্বন্ধেও এইরূপ অনিয়ম দেখা যায়। ইহাতে অনেক সময় গোলযোগে পতিত হইতে হয়, এজন্য এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরিমাণ-ব্যবস্থা না লইয়া গণিতের ওজন ও মাপ গ্রহণ করা গেল ঃ—

এক সের ৮০ সিক্কায়, এক মণ ৪০ সেরে—এইরূপ ওজনের মাপ, এবং ভূমি সম্বন্ধে ২০ কাঠায় বিঘা ধরিব। ৩২০ বর্গ হাতে অর্থাৎ ৭২০ বর্গ ফুটে এক কাঠা এবং ৬৪০ বর্গ-হাতে বা ১৪৪০০ বর্গ-ফুটে

এক বিঘা জমি হইয়া থাকে। দীর্ঘ ও প্রস্থের পরিমাণকে গুণ করিলে যে গুণফল হয় তাহাকে বর্গফল কহে। উক্ত পরিমাণ সকল গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বা গ্রাহ্য।

যাঁহারা ইংরাজি মাপের পক্ষপাতী তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইল।

১। ১ একর (Acre) ভূমি=তিন বিঘা আট ছটাক (৩৷॥)।

২। জলীয় পদার্থের মাপ।—১ পাইণ্ট=প্রায় আধসের।

২ পাইণ্ট=১ কোয়ার্ট এবং ৪ কোয়ার্টে ১ গ্যালন।

৩। শস্যাদির মাপ ঃ—

১ আউন্স=প্রায় আধ ছটাক বা ২॥০ তোলা।

১৬ ঐ=১ পাউণ্ড (প্রায় আধ সের)

১ টন=২২৪০ পাউণ্ড (২৭ মণ ৯ সের)।

খামারে ক্ষেত্রস্বামীর গৃহাদি।—বিপুল অর্থব্যয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ না করিয়া টিন বা তৃণাচ্ছাদিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে কাজ চলিতে পারে।

ক্ষেত্রস্বামীর থাকিবার জন্য যে বাংলা বা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা ক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমাংশে করা উচিত। ইহাতে সুবিধা এই যে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ উন্মুক্ত থাকিলে গৃহে আর্দ্রতা থাকে না এবং পূর্ব্বদিকের আলোক ও দক্ষিণদিকের বাতাসে স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বাংলার চতুর্দ্দিকে কিয়ৎ পরিমাণ জমির মধ্যে কোন আবাদ করা উচিত নহে। এই জমিতে দুর্ব্বাদল, মধ্যে মধ্যে ছোট জাতীয় তরুলতা যথা,—বেল, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ, গন্ধরাজ, চামেলী, হাস্নাহানা প্রভৃতি সুগন্ধ ও মনোহর ফুলের গাছপালা রোপণ করিলে স্থানীয় দৃশ্য সুন্দর হয় এবং সময়ে সময়ে পুষ্পের সুগন্ধে স্থান আমোদিত

হয়, তন্নিবন্ধন চিত্ত প্রফুল্ল থাকে। বাংলার নিমিত্ত যে স্থান নির্ব্বাচিত হইবে তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষাকৃত এরূপ উচ্চ হওয়া উচিত যে, বৃষ্টির সামান্য জলও অনায়াসে নিকাশ হইতে পারে।

গৃহটী দুই-চালা বা চার-চালা বিশিষ্ট এবং সাধারণ গৃহাপেক্ষা উচ্চ হইলে ভাল হয়। দু-চালা-গৃহ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ হইলে গৃহ মধ্যে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস পায় সুতরাং বাংলা স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। দ্বার বা জানালার বিপরীত দিকে খোলা না থাকিলে বাতাস খেলিতে পায় না, এজন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যেরূপ জানালা বা দরজা থাকা আবশ্যক, অপর দুই দিকেও সেইরূপ রাখিতে হইবে। যতই নূতন বাতাস প্রবেশ করে, ততই গৃহ স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। গৃহের চারিদিকে বারন্দা বা দালান না থাকিলে বর্ষা-কালের বৃষ্টিতে ঘরের দেওয়াল ভিজিয়া যায় এবং গৃহের অভ্যন্তর বৃষ্টির ছাটে দীর্ঘকাল ভিজিয়া থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে ঘর এমনই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, তন্মধ্যে বাস করা অসম্ভব হয়।

ক্ষেত্র সুবৃহৎ হইলে লোকজন অধিক রাখিতে হয়। ইহাদিগের জন্য এক স্থানে গৃহনির্ম্মাণ না করিয়া ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে করিলে ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সুবিধা হয়। একই জায়গায় সকলে দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে বৃহৎ ক্ষেত্র মধ্যে সময়-সময় দুষ্ট লোক আসিয়া ফসল বা তৈজস পত্রাদি চুরি করিতে পারে এবং গবাদি পশুতে গাছ-পালা নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে লোকালয় থাকিলে এ সকল উপদ্রব হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বেতনভোগী জনমজুরদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। অনেক স্থলে তাহাদিগের প্রতি

অতিশয় হতাদর দেখা গিয়া থাকে এবং তাহারাও যে মানুষ, এ কথা ক্ষেত্রস্বামীর মনে থাকে না অথবা মনে থাকিলেও তাহাদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি করেন না। লোকহিতৈষণা ছাড়িয়া দিলেও, ইহারা যে ক্ষেত্রের দক্ষিণহস্ত ইহা মনে ভাবিয়াও তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রের জন-মজুরগণ যাহাতে স্বাস্থ্য-বান ও বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ থাকিতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রভুর পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ, শীর্ণ ও রুগ্ন লোকের দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না। অনেক স্থলে এমন দেখা যায় যে, লোকের পীড়া হইলে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করা হয় অথবা তাহাদিগের বেতন বা রোজ কর্ত্তিত হয়। লোক পুরাতন হইয়া গেলে প্রভুর প্রতি তাহাদিগের একটা মমতা জন্মে, তন্নিবন্ধন প্রভুর কার্য্যে তাহাদিগের কিছু যত্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য নূতন লোক আসিলে তাহাদিগকে কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে বিলম্ব হয় এবং সেই সকল ব্যক্তি ভবিষ্যতে ক্ষেত্রের কার্য্যোপযোগী হইবে কি না, তাহারও নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক স্থানে নূতন লোক আসিয়া কিছু দিবস থাকিয়া দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলায়ন করে। এই সকল কারণে লোক-জনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বুঝিয়া তাহাদিগের জন্য স্বাস্থ্য-কর স্থানে ভাল করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহারা স্বভা-বতঃ সামান্য কুটিরে বাস করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া-ছেন তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, সে অবস্থায় থাকিয়া ইহারা কিরূপ রোগ ভোগ করে এবং ইহাদিগের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা কত অধিক!

ক্ষেত্রের লাঙ্গল ও শকট-বাহী গো-মহিষাদির জন্য একটী ঘর আবশ্যক। উক্ত গৃহ এরূপ স্থানে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যথায় আর্দ্রতা নাই এবং রৌদ্র ও বাতাস আসিবার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক নাই।

লোকালয়ের সন্নিকটে গো-শালা নির্ম্মাণ করিলে মনুষ্যের পক্ষে তথায় বাস করা অসম্ভব, কারণ উহা হইতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এজন্য বাংলা ও মজুরদিগের বাসস্থান হইতে গো-শালা দূরে সংস্থাপন করিতে হইবে। ক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উহা স্থাপন করিলে ক্ষেত্রস্বামীর পক্ষে উহা পরিদর্শনের সুবিধা হয়, কেন না, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ক্ষেত্রস্বামীর গৃহ উত্তর-পশ্চিম দিকে নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই অন্য স্থান অপেক্ষা বাংলা হইতে গো-শালা অনেক নিকট হইবে। গো-শালার ভূমি সাধারণ জমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া উচিত এবং গোয়ালের মধ্যে যাহাতে অবাধে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে কতকগুলি পশু থাকিলে তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং নানাবিধ রোগ জন্মে। গৃহমধ্যে এক একটী গোরু বা মহিষের জন্য দীর্ঘে ৪।৫ হাত এবং প্রস্থে ৩।৪ হাত স্থান থাকা উচিত। কারণ, তাহাহইলে উহারা শয়ন করিলে বা দণ্ডায়মান থাকিলে পরস্পরের গাত্রের সহিত সংস্পর্শিত হইতে পারে না। পশুর সংখ্যানুসারে গৃহটী উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ করিতে হইবে এবং প্রস্থে ১৬ হস্ত করিলেই চলিবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমের দেওয়াল হইতে ৬ হাত দূরে দুই দিকে দড়ি ধরিয়া মধ্যস্থলে যে তিন হাত স্থান পাওয়া যাইবে তাহাই বরাবর লম্বা পথ থাকিবে। পথ সঙ্কীর্ণ হইলে গৃহের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা হয়। দেওয়ালের দিকের ৬ হাত জমি রাস্তার দিকে ঈষৎ ঢালু করিয়া আনিলে,সমুদয় চোণা ও গোবর রাস্তার কিনারা বাহিয়া ঘরের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পড়িবে। চোণা একটী বিশেষ সার, এজন্য উহা যত্নসহকারে রক্ষা করিবার জন্য ঘরের বাহিরে এরূপ স্থানে একটী বড় গামলা রাখিতে হইবে যে, তাবৎ চোণা আসিয়া তাহাতেই পড়ে। চারিদিকের দেওয়ালে ভূমি হইতে দুই হস্ত উর্দ্ধে

প্রত্যেক পশুর সম্মুখে এক বর্গ-হাত পরিমিত এক-একটী গবাক্ষ রাখিয়া দেওয়া উচিত অথবা চারিদিকের দেওয়ালে বা বেড়ার গাত্রে দুই হাত ঊর্দ্ধে, এক হাত প্রস্থবিশিষ্ট জাফরি করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। ইহা দ্বারা গৃহাভ্যন্তরের দূষিত বায়ু বহিষ্কৃত হইয়া যায় এবং সতত নূতন বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। ঘরের বেড়া বা দেওয়াল,—ভূমি হইতে ছয় হাতের কম উচ্চ না হয়। সকালে ও বৈকালে পশুদিগকে বাহির করিবার জন্য গৃহের সম্মুখে একটী প্রশস্ত অঙ্গিনার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক এবং সেই অঙ্গিনা মধ্যেই প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে তাহাদিগকে জাব দেওয়া উচিত।

গো-শালার সংলগ্ন আর একটী গৃহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত গৃহমধ্যে পশুদিগের আহারীয় খৈল, ভূষি, প্রভৃতি আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ভাণ্ডার-গৃহ দূরে থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য বারম্বার আনিতে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং লোকজনের বেজার বোধ হয়। ইহার সন্নিকটে খড়ের স্তূপ থাকিলে অল্প সময়ে অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

অস্ত্র ও যন্ত্রাদি সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বাংলার সম্মুখে বা পার্শ্বে প্রয়োজনমত আকারের একখানি গৃহের আবশ্যক। প্রতিদিন লোকজনকে যন্ত্রাদি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকিলে যন্ত্রাদি হারাইতে পায় না, নতুবা উহারা প্রায়ই একটী-না-একটী যন্ত্র আত্মসাৎ করে অথবা অসাবধানতাবশতঃ কোথায় যে ফেলিয়া আসে আর খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু প্রতিদিন এইরূপে বুঝিয়া লইবার ও বুঝাইয়া দিবার নিয়ম থাকিলে সকলের মনে ভয় থাকে সুতরাং তাহারা সাবধান হয়। অস্ত্রাদির গৃহ বাংলার সন্নিকটে নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখনই মজুরগণ কাজে আইসে বা কাজ হইতে ফিরিয়া যায় তখনই তাহারা প্রভুর নজরে পড়ে,

এজন্য বিলম্ব করিয়া কাজে আসিতে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কাজ হইতে পলাইতে পারে না।

বাংলার অন্যদিকে ও নিকটে গুদাম (godown) এবং তৎসংলগ্ন প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে খলেন বা খামার (threshing floor) নির্ম্মাণ করিতে হইবে। খামার দূরে হইলে অনেক দ্রব্য চুরী হইতে পারে অথবা সদাসর্ব্বদা তদারক অভাবে নষ্ট হইতেও পারে। গো-শালার সম্মুখে যেরূপ খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা করা গিয়াছে, গুদামের সম্মুখস্থ সংলগ্ন স্থানে সেইরূপ খলেনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। খলেনে ফসল শুষ্ককরতঃ মাড়িয়া-ঝাড়িয়া অধিক দূরে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা গুদাম নিকটে থাকিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। গুদাম ঘরের মেজে উচ্চ না হইলে আর্দ্রতা হেতু সমুদায় ফসল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এজন্য সাধারণ জমি হইতে উহা অন্ততঃ আধ হাত উচ্চ করিতে পারিলে ভাল হয়। আবার যদি মেজে (floor) ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ফাঁপা হয় তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। শেষোক্ত প্রকার মেজে অতিশয় শুষ্ক হয় তন্নিবন্ধন তাহার উপরে যে সকল সামগ্রী থাকে তাহাও ভাল থাকে। গুদামের মধ্যে চারিদিকে কাষ্ঠের বা বাঁশের মাচান আবশ্যক, কেন না, তাহার উপরে ক্ষেত্রজাত ফসল রাখিতে পারিলে উহা স্যাঁতাইবার বা পচিয়া যাইবার তত আশঙ্কা থাকে না। অনাবৃত বা অর্দ্ধাবৃত খলেনে ফসল রাখিলে অনেক সময় বৃষ্টিতে ভিজিয়া যায় সুতরাং তাহার উপরে আচ্ছাদন করিতে পারিলে নিরাপদ হওয়া যায়।

খলেনের মেজে উত্তমরূপে ইষ্টক ও রাবিশ দ্বারা পিটিয়া সিমেণ্ট করিতে পারিলে ফসলের সহিত অধিক ধূলা-মাটি মিশ্রিত হইতে পারে না। মাঠ-ময়দানে ভূমির উপর খামার থাকিলে ফসলের সহিত অনেক ধূলা, মাটি, কাঁকর প্রভৃতি মিশিয়া যায় এবং তাহা ঝাড়িয়া পরিষ্কার

করিতে বিস্তর পরিশ্রম হয় ও সময় যায়, অথচ না পরিষ্কার করিলেও ফসলের মূল্য হ্রাস হইয়া থাকে। খামারের আচ্ছাদন করোগেট-আয়রণ (corrugated iron) বা টিনের চাদর দ্বারা তৈয়ার করিতে পারিলে বর্ষাকালে তন্মধ্যে সহজে আর জল প্রবেশ করিতে পারে না। গুদাম-ঘর যদি পাকা না হয়, তাহা হইলে তাহারও ছাদ ঐরূপে তৈয়ার করা উচিত কেননা, উহাকে যে কেবল বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহা নহে, অগ্নির ভয়ও বিলক্ষণ আছে। গ্রীষ্ম-কালের দিনে কিম্বা খরানীর সময় প্রায়ই খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়া থাকে সুতরাং পূর্ব্বেই সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। আপাততঃ ইহাতে কিছু নগদ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে অবিরাম ক্ষতির হস্ত হইতে নির্ভয়ে থাকিতে পারা যায়।

গুদাম-ঘরে গন্ধ-মূষিক ও ইন্দুরের বড় উপদ্রব হইয়া থাকে, এজন্য এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সহজে গৃহমধ্যে প্রবেশাধিকার না পায়। তদর্থে ঘরের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং দেয়ালের চারিদিক ঢালু করিয়া মাটি দিতে হইবে। ঐ মাটির সহিত খোলার কুচি, কাঁচ-ভাঙ্গা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকিলে উহারা সহজে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত গৃহমধ্যে কোন স্থানে মুস্কারি বা ইন্দুর-ধরা-কল বা বিষাক্ত ঔষধ রাখিতে হইবে। ইহারা এতই উপদ্রব ও এতই অনিষ্ট করে যে, ইহাদিগের বিনাশ-সাধন করিতে কোন পাপ নাই বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে আর একটী উপায় আছে। গৃহ-মধ্যে সময়ে সময়ে গন্ধক পোড়াইয়া ধোঁয়া দিলে উহারা পলায়ন করে। গুদাম-ঘরে জিনিস-পত্র একস্থানে অধিক দিন রাখিয়া দিলেই উহারা নির্ব্বিঘ্নে আপন কার্য্য করিতে থাকে সুতরাং সুবিধা ও অবসরমত সমুদায় জিনিষ গৃহমধ্যেই স্থানান্তর করা ভাল এবং কাঁচা মাল অধিক দিবস গৃহ-

মধ্যে না রাখিয়া সুবিধামত যথোচিতমূল্য পাইলেই বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত নতুবা সমধিক লাভের প্রত্যাশায় অধিক দিবস মাল ঘরেআটক করিয়া রাখিলে,প্রথমতঃ,—টাকা আবদ্ধ থাকে,দ্বিতীয়তঃ—উক্ত অনিষ্ট-কারীগণ সম্ভবতঃ লাভ সমেত আসল ভক্ষণ করে বা নষ্ট করিয়া ফেলে।

কুদ্দাল, কুদ্দালক ও কুদ্দালন।—সচরাচর জমি কুদ্দালনের জন্য যে কোদাল নিয়োজিত হইয়া থাকে, তাহা প্রায় দেশী কোদাল। এই সকল কোদালকে শায়িত বা হেলা-কোদাল বলা যাইতে পারে। কোদালের গঠনের তারতম্যে জমির কোপানী-কার্য্যের ইতর-বিশেষ হয়। সচরাচর দেশী কোদালের শিরোদেশকে ঘুরাইয়া এতই ভিতর দিকে আনা হয় যে, তাহার ছিদ্রে বাঁট পরাইলে, বাঁটটী কোদা-লের উপর যেন অর্দ্ধশায়িতভাবে হেলিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ কোদাল ব্যবহারে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

দেশী কোদালের বাঁট হেলিয়া থাকে বলিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না, কাজেই তাহা ছোট রাখিতে হয়। আর-বাঁটের ক্ষুদ্রতা ও শায়িতভাব হেতু জনমজুরগণকে বাধ্য হইয়া সম্মুখভাগে কক্ষ ঝুঁকাইয়া কোদাল পাড়িতে হয়। এতদবস্থায় তাহারা অধিকক্ষণ একভাবে কাজ করিতে সক্ষম হয় না, কারণ ইহাতে তাহাদিগের কক্ষে ও বক্ষে সমধিক দমক লাগে। বারম্বার কোমর ঝুঁকাইলে সহজেই বলিষ্ঠ মানুষও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আরও, দেশী কোদাল দ্বারা কোপাইতে হইলে প্রতিবার কোদাল পাড়িবার কালে কোমর না ঝুঁকাইলে চলে না। ক্ষুদ্র কোদাল দ্বারা কোপাইবার কালে জন-মজুরগণ অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ কক্ষ হইতে শরীরের উপরার্দ্ধভাগ ভূম্যাভিমুখী করিয়া কাজ করিতে পারে কিন্তু সে কোদাল দ্বারা ভাল কাজ হয় না। অতঃপর,—

কোদাল ও বাঁটের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ কোদাল ঠিক সরল অর্থাৎ খাড়াভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া শায়িতভাবে প্রবেশ করে। শায়িতভাবে প্রবিষ্ট কোদাল দ্বারা গভীর-কোপানী না হইয়া ভাসা-কোপানী হয়। কোদাল ৮।৯ ইঞ্চ দীর্ঘ হইলে এবং তাহা খাড়া ভাবে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে, ৮।৯ ইঞ্চ গভীর মাটি উল্‌টাইতে সমর্থ হয়, কিন্তু শোয়া-কোদাল দ্বারা মাটি গভীরভাবে উল্‌টায় না,— ভূগর্ভের ৩।৪ ইঞ্চ মাটি চাঁচিয়া লয় মাত্র। ইহাতে সকল সময়ে ও সকল প্রকার কাজ চলে না। এই জন্য,—

দাঁড়া-কোদাল ব্যবহার করায় অনেক লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁড়া-কোদালের শিরোদেশের ছিদ্র অনেকটা উর্দ্ধমুখ, তন্নিবন্ধন তাহাতে বাঁট প্রায় সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকে। বাঁটের দণ্ডায়মানতা হেতু কোদাল খাড়াভাবে আঘাত করিলে ভূমিতে খাড়াভাবে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ খাড়া-কোদাল দ্বারা মাটিতে কোপ মারিলে বা আঘাত করিয়া বাঁট ঈষৎ টানিলেই মাটির চাপ যথাস্থানে উলটিয়া পড়ে এবং মাটিও গভীররূপে খোদিত হয়। অতঃপর, খাড়া কোদাল দ্বারা কাজ করিতে কোদালেগণের কোমরে বা বুকে তত দমক লাগে না এবং কোমরে বেদনা অনুভূত হয় না। তাহা ব্যতীত, কোমর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভূমির দিকে ঝুঁকাইয়া থাকিলে স্বভাবতঃ যে কষ্ট হয়, তাহা অনুভূত হয় না। উক্ত কোদালের বাঁট অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলে, কোদালে-গণের তাদৃশ কষ্ট হয় না, পরন্তু তাহারা অধিকক্ষণ কাজ করিতে পারে এবং সমগ্র মাটির বড় বড় চাপ উল্‌টাইতে পারে।

দেশী কোদাল ভারী হয়, কিন্তু বিলাতী কোদাল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু। এতদ্ব্যতীত, দাঁড়া-কোদাল প্রায় এদেশে নির্ম্মিত হইতে দেখা যায় না। এজন্য বিলাতী দাঁড়া-কোদাল ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

সাধারণতঃ ৭-ইঞ্চ (all steel No. 4) কোদাল দ্বারা বেশ কাজ চলে। এই সকল বিলাতী কোদাল ঢালাই করা ও ইস্পাতনির্ম্মিত; সহজে ভাঙ্গে না এবং আচোট ও সুকঠিন ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করিতেও সমর্থ হয়। উক্ত কোদাল 7-inches, all steel, No. 4 নামে পরিচিত।

কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাগ-বাগিচায় দাঁড়া-কোদালের ব্যবহার আছে, কিন্তু বাঁটের স্থূলতা হেতু আশানুরূপ অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। দাঁড়া-কোদালের বাঁট এক-বুক (বক্ষ) অর্থাৎ চারি ফুট তিন ইঞ্চ দীর্ঘ হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি উহা হালকা, সুপরিপক্ক ও শুষ্ক কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। শিরোদেশ হইতে শেষাংশ পর্য্যন্ত ক্রম-সুচাল হইলে বাঁট হালকা হয়, এজন্য উত্তমরূপে চাঁচিয়া-ছুলিয়া উহা নির্ম্মাণ করা উচিত। ধরিবার স্থান অধিক স্থূল বা অপরিষ্কৃত হইলে কোদালেগণের পক্ষে উহা ভারী বোধ হয় এবং কোপাইতে কষ্টকর হয়।

ভালরূপে কোদাল পাড়িবার জন্য বলিষ্ঠ লোক নিযুক্ত করা উচিত। কোদাল পাড়িতে শক্তির আবশ্যক করে এবং কোদাল পাড়িবার একটা প্রণালীও আছে তাহা জানিয়া রাখা উচিত। যে-সে জন-মজুর ভালরূপে কুদ্দাল চালাইতে পারে না এবং জানে না। এই জন্য কোদালে বলিষ্ঠ হওয়া উচিত এবং তাহাকে কোদাল চালাইবার উপযোগী করিয়া লওয়া চাই। কোদাল পাড়িতে জানিলে কাজ ভাল হয় এবং অল্প সময়ে অধিক কাজ হয়। এ প্রকারের অনেক কোদালে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা গভীররূপে কোপান দিতে পারে না, আবার অনেক কোদালে জমি কোপাইবার কালে কুদ্দালিত মাটি এক এক স্থানে জমা করিয়া ফেলে, ফলতঃ অন্যস্থান খালি হইয়া পড়ে। ভাল কোদালেগণ মাটি কাটিয়া এক স্থানে 'ঢেরি' বা ঢিবি না করিয়া কুদ্দালিত স্থানের চাপ্‌কে ঠিক তাহার পশ্চাতেই উলটাইয়া রাখে। এইরূপে যত

অগ্রসর হইতে থাকে, তত সম্মুখের চাপ্ তৎপশ্চাতস্থ চাপের স্থানে উল্‌টাইয়া পড়িতে থাকে। অবশেষে সমুদায় কুদ্দালিত স্থানটী দেখিলে মনে হয় যেন সেই সমগ্র ভূমিখণ্ডকে কে উলটাইয়া দিয়াছে। কোপাই-বার কালে স্থানে স্থানে মাটি জমা হইয়া গেলে একটা বিষম দোষ ঘটে এই যে, সমগ্র মাটির মধ্যে উপরের কতক মাটি উপরেই থাকিয়া যাইবার এবং নিম্নতলের কতক মাটি নিম্নেই পুনর্গমন করিবার সম্ভাবনা, কিন্তু মাটি একবারে যথাস্থানে উলটাইয়া পড়িলে উপরিভাগের পরি-ক্লান্ত ও নিস্তেজ মাটি কিছুদিনের জন্য নিম্নতলে গিয়া বিরাম পায় এবং নিজ অবয়ব মধ্যস্থ অজীর্ণ পদার্থ সমূহের বিগলনে পুনরায় নবশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে; অন্য দিকে, নিম্নভাগের মাটি উপরিভাগে আসিয়া সূর্য্যোত্তাপ ও বায়ুমণ্ডলের পদার্থসমূহের সংযোগে সজীব হইয়া উঠে এবং তাহার অবয়বমধ্যস্থ আবদ্ধ জৈব ও অজৈব অর্থাৎ গলনীয় ও অগলনীয় পদার্থ সমূহের বিমুক্তি লাভ হয়, ফলতঃ ক্ষেত্র শস্যশালিনী হয়। মোটের উপর, ভাসা-কোপান্ হউক, আর ডোবা-কোপান্ হউক, মাটি একেবারে সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া যাওয়া চাই।

ভূমি কোপাইবার অনেকগুলি প্রণালী আছে, তন্মধ্যে ভাসা ও ডোবা,—এই দুইটী প্রধান। দেশী হেলা-কোদাল দ্বারা কুদ্দালিত হইলে ভাসা-কোপান এবং দাঁড়া-কোদাল দ্বারা গভীররূপে কুদ্দালিত হইলে ডোবা-কোপান্ বলা যায়।

ডোবা-কোপানের মধ্যে দুইটী রকম আছে যথা—সহজ-ডোবা ও গভীর-ডোবা। সহজ-ডোবাকে 'সিঙ্গেল-কোড়' (single) বা এক কোড় এবং গভীর-ডোবাকে ডবল (double) বা দু'কোড় বলিতে পারা যায়। কোড় অর্থে কোপান। দাঁড়া-কোদাল দ্বারা সচরাচর যে প্রণালীতে কোদ্‌লান হয়, তাহাকে সহজ কোপান বা সিঙ্গেল-কোড়

বা এক-কোড়, এবং একই স্থানে দুইবার কোদাল বসাইয়া যে চাপ গভীররূপে উল্টান যায়, তাহাকে গভীর খনন বা ডবল-কোড় বা দু'কোড় বলা যায়। দুইটী স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য উল্লিখিত দুই প্রকারের;—সিঙ্গেল বা সহজ এবং ডবল-কোড় বা দু'-কোড় প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অনেক দিন পতিত থাকায় সে সব জমি কঠিন হইয়া যায়, কিম্বা যে সব জমি উপর্য্যুপরি দুই চারি ফসল প্রদান করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে অথবা যে সকল জমিতে বৃহজ্জাতীয় ফলকরের গাছপালা থাকে, তাহাতেই ডবল-কোড়ের প্রয়োজন হয়। প্রতি দুই-তিন ফসল গ্রহণ করিবার পরে ক্ষেত্রে ডবল-কোড় দিতে পারিলে ভাল হয়। বর্ষাতি ফসল সংগৃহিত হইবার পর জমি যখন অতিশয় কঠিন হইয়া যায়, তখন তাহাতে ডবল-কোড় দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

জমি কোপাইবার পর মাটির যাবৎ চাপ চূর্ণ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। মাটি যদি নিতান্ত শুষ্ক থাকে তাহা হইলে কোপাইবার অব্যবহিতকাল মধ্যেই চাপ সকলকে চূর্ণ করিয়া না দিলে মাটি আরও কঠিন হইয়া যায়, তখন সহজে ভাঙ্গা যায় না কিম্বা ভাঙ্গা গেলেও মাটি ভালরূপ চূর্ণ হয় না—ফলতঃ অনেক ঢেলা কঠিন বা তদবস্থায় থাকিয়া যায়। আর যদি মাটি ভিজা থাকে, তাহা হইলে এক আধ দিবস চাপ সকলকে উলটান অবস্থায় থাকিতে দিলে বাতাস ও রৌদ্রে অনেক রস শুষ্ক হইয়া যায় এবং তখন তাহাদিগকে ভাঙ্গিবার সুবিধা হয়। ভিজা মাটিকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে চাপগুলি কাদার মতন হইয়া যায় এবং শুকাইলে পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া পড়ে।

লাঙ্গল ও লাঙ্গল-বাহী।—লাঙ্গলের মুখে জমির উর্ব্বরতা। লাঙ্গল ভাল হইলে ভূমি কর্ষণও ভালরূপে হইয়া থাকে। এই জন্য

লাঙ্গল সংস্কার, ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি লইয়া আজকাল নানাদেশে নানারূপে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতীয় লাঙ্গল যে কিছুই নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার আয়োজন হইতেছে। যে দেশেই হউক, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়াই সকল প্রথা ও প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। যে সকল স্থানের জমি নিতান্ত গভীর, প্রস্তরময় ও কঠিন, তথায় বিলাতী লাঙ্গল অশ্ব কিম্বা অশ্বতর দ্বারা চালিত হওয়া শোভা পায় এবং প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ দেশে সেই লাঙ্গল চালাইতে হইলে, হয় অশ্বের প্রয়োজন, না হয় দুইটীর স্থলে ছয়টী বা আটটী বলদের প্রয়োজন হয়। ভারতের সাধারণ জমি এতদূর কঠিন নহে যে তাহাতে বিলাতী লাঙ্গল চালান আবশ্যক। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, দেশীয় লাঙ্গল দ্বারা উত্তমরূপে কর্ষণ হইয়া থাকে, তবে, সাধারণতঃ চাষীগণ যাহা ব্যবহার করে তাহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। দেশী ভাল ও দীর্ঘ-ফাল লাঙ্গল দ্বারা ৩।৪ ইঞ্চ মৃত্তিকা কর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু মাটির আরও ঈষৎ গভীর কর্ষণ আবশ্যক। এইজন্য 'শিবপুর' ও 'হিন্দুস্থান' লাঙ্গল প্রবর্ত্তিত হওয়া স্পৃহনীয়। ৭৫ পৃষ্ঠায় 'শিবপুর' এবং ৭৬ পৃষ্ঠায় দেশী লাঙ্গলের চিত্র প্রদর্শিত হইল। গ্রন্থকার হিন্দুস্থান-লাঙ্গল বারবার ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহা হইতে আশাতীত ফললাভ করিয়াছেন। উহা শিবপুর লাঙ্গলের অনুরূপ।

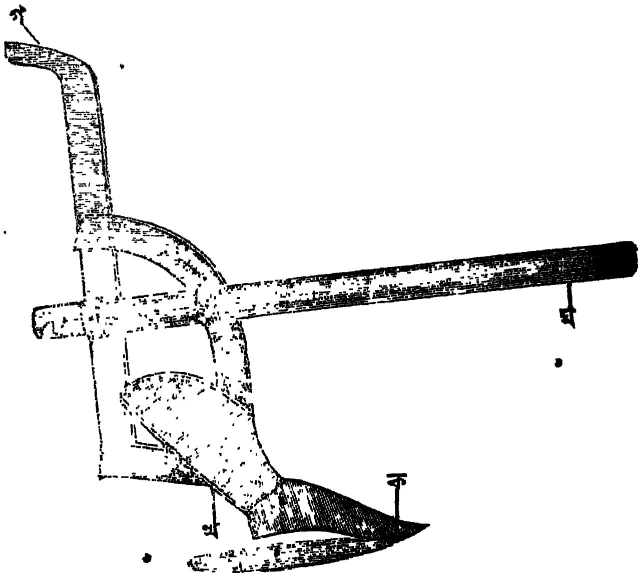
হালভেদে কর্ষণভেদ।—উচ্চাঙ্গের লাঙ্গল এদেশে প্রচলিত করিবার পক্ষে আর একটী বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমাদিগের তাবৎ ক্ষেত্রই অতি সঙ্কীর্ণ। সচরাচর ২।১ বিঘা হইতে ২।৪ বিঘার অধিক জমি এক কেতায় দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় বিলাতী উচ্চাঙ্গের লাঙ্গল এদেশে চলিতেই পারে না। প্রতি কেতায় ২০।৫০ বা শতাধিক বিঘা ভূমি থাকিলে এবং সমুদায় কেতাটীকে একবারে কর্ষণ

করিতে হইলে তাদৃশ লাঙ্গল দ্বারা সুবিধা হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষিক্ষেত্র সমূহ সুবিস্তৃত সুতরাং তথায় অশ্ববাহিত লাঙ্গল ভিন্ন কাজ চলে না কিন্তু আজকাল তথায় অধিকাংশ স্থলে প্রায় বাষ্পীয়, মোটর, কিম্বা বৈদ্যুতিক লাঙ্গল ব্যবহার হইতেছে। যদি কখনও ভারতবাসী সেইরূপে বিস্তৃত ক্ষেত্র লইয়া আবাদ করিতে সক্ষম হয়, তখন উল্লিখিত উন্নত লাঙ্গল আপনা হইতেই এদেশে প্রচলিত হইবে, কিন্তু সে দিনের জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

'হিন্দুস্থান' ও 'শিবপুর' লাঙ্গলের বিশেষত্ব এই যে, তদ্দারা দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা ঈষৎ গভীর করিয়া মাটি খোদিত হয় এবং সেই মাটি উল্টাইয়া পার্শ্বদেশে পড়ে। উক্ত লাঙ্গলদ্বয়ের ফাল হাতীর কাণের ন্যায় এবং এমন বক্রভাবে গঠিত যে, কর্ষিত মাটি উহার সংস্পর্শে আসিলে স্বতঃই উলটাইয়া যায়, কিন্তু দেশীয় লাঙ্গলে তাহা হয় না। এই কারণে দেশী অপেক্ষা 'হিন্দুস্থান' ও 'শিবপুর' লাঙ্গলকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে ইহা ব্যবহার করিতে অসম্মত এবং তাঁহাদিগের অসম্মতির কারণ এই যে, দেশী বলদে উহা টানিতে কষ্ট পায়। প্রকৃত পক্ষে উহা যে বিশেষ ভারী তাহা নহে তবে টানিবার কালে উহার কর্ষিত মাটি পক্ষে বা কাণে আটক পড়ে,ইহাতেই ভারী বোধ হয়, কিন্তু দেশী লাঙ্গলে চষিবার কালে ফালের মুখাগ্রে যে মাটি পড়ে, তাহা দুই পার্শ্বে সরিয়া যায় সুতরাং দেশী লাঙ্গল ভারী বোধ হয় না। 'হিন্দুস্থান' ও 'শিবপুর' লাঙ্গল যে সামান্য ভারী বোধ হয়, তাহা সহজেই দূর হইতে পারে। সাধারণ চাষীদিগের ক্ষুদ্র ও শীর্ণ বলদ দ্বারা উহা বাহিত হওয়া একেবারে অসম্ভব সুতরাং দেশী লাঙ্গলই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। 'হিন্দু স্থান' বা "শিবপুর' লাঙ্গল দেশী ও বড় জাতীয় বলিষ্ঠ বলদ অনায়াসে টানিতে পারে এবং মহিষদ্বারাও সহজে বাহিত হইতে পারে। 'হিন্দুস্থান'-

লাঙ্গলদ্বারা ভূমি যেমন গভীররূপে কর্ষিত হয়, তেমনি পার্শ্বদেশের মাটিও সম্পূর্ণরূপে বিচলিত হয়, তাবৎ মাটিও একবারে উলটাইয়া যায়। দেশী হালের দ্বারা তিন চারি 'ঘা' চায দিলে যে উপকার না পাওয়া যায়, হিন্দুস্থানের এক 'ঘা'য় তদপেক্ষা অল্পক্ষণে অধিক ও সহজে কাজ পাওয়া যায়। দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ইহা সামান্য ভারী বোধ হইলেও বলিষ্ঠ বলদ বা মহিষ অনায়াসে টানিতে পারে। ইহাতে ফাল সংলগ্ন যে কাণ

শিবপুর লাঙ্গল

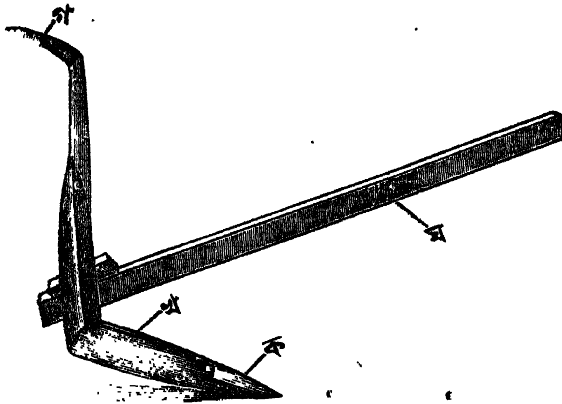


ক—ফাল। খ—পক্ষ বা কাণ। গ—হাতোল। ঘ—ঈষ।

বা পক্ষ আছে, তাহার সাহায্যে কর্ষিত মাটি আপনিই উলটাইয়া যায়। এই জন্য উহা টানিবার কালে ঈষৎ ভারী বোধ হয়, কিন্তু গ্রাম্য হেলে-বলদ বড়জাতীয় ও বলিষ্ঠ হইলে উক্ত লাঙ্গল অনায়াসে টানিতে পারে

কিম্বা 'দোয়ার' (দ্বিতীয়) চাষে অথবা সরস মাটিতে ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। সাধারণতঃ দৃঢ়িষ্ঠ ও পূর্ণবয়স্ক পশু "হিন্দুস্থান" লাঙ্গল সচ্ছন্দে টানিতে পারে। যত্নসহকারে লালনপালন করিলেই পশুগণ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হয়, সুতরাং পশুগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বলিষ্ঠ পশু দ্বারা অতি শীঘ্র ও সুন্দর কর্ষণ হইয়া থাকে। 'হিন্দুস্থান দ্বারা ছয় হইতে আট ইঞ্চ নিম্নের ও পার্শ্বের মাটি কর্ষিত হইয়া থাকে। উক্ত ফালের কাণ বা পক্ষ থাকায় প্রস্থে প্রায় ৭।৮ ইঞ্চ মাটির অধিক খোদিত ও বিচলিত হয়। উপরন্তু যখন লাঙ্গল চলিতে থাকে, তখন খোদিত তাবৎ মাটি সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া গিয়া বামভাগে পড়ে। উক্ত

দেশী লাঙ্গল



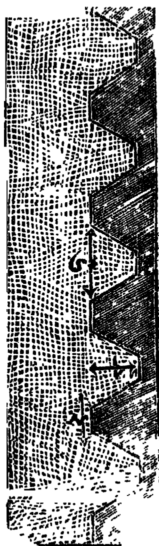
ক-ফাল। খ-মুড়া। গ-হাতোল। ঘ-ইষ্।

লাঙ্গলের সমগ্র ওজন সাড়ে সত ৭৷৷০ সেরমাত্র এবং লাঙ্গলের মূল্য ১৩৷৷০ টাকা। ইহা দুই নম্বরের লাঙ্গল। এক নম্বরের লাঙ্গলের ওজন ৬৷৷০ সাড়ে ষোল সের এবং মূল্য ১২৷৷০ টাকা। বলদের শক্তি-সামর্থ অনুসারে ১ বা ২

নম্বরের হাল ব্যবহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট বলদের পক্ষে ৯ নম্বরের হাল প্রশস্ত। *

দেশী-হাল ব্যবহার করিয়া যে আমরা কখন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি তাহা মনে হয় না, তবে উক্ত হাল ও বলদ যত ভাল হইবে, ক্ষেত্রকর্ষণ তত শীঘ্র ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

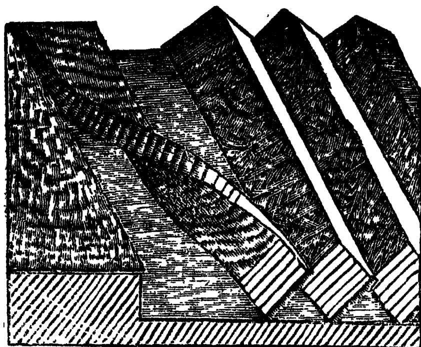
কঠিন ও আচোট মাটিতে 'শিবপুর' বা 'হিন্দুস্থান' হালের দ্বারা প্রথমবার চাষ দেওয়া চলে না, সুতরাং তাহাতে প্রথমে দেশী হাল দ্বারা চাষ দিয়া, পরবর্ত্তী চাষ 'শিবপুর' বা 'হিন্দুস্থান হালের দ্বারা দিতে হয়। আবাদী জমিতে সকল সময়ে এতদুভয়বিধ হাল দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষিত হইতে পারে।



দেশী হালের দ্বারা কর্ষিত হইলে ভূমির পৃষ্ঠতল কিরূপ বিচলিত হয় তাহা পার্শ্বস্থিত চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইল। উক্ত হালের ফাল ভূগর্ভমধ্যে ৪-ইঞ্চ মাত্র প্রবিষ্ট হয় এবং পার্শ্বদেশ উপরিভাগে ৬-ইঞ্চ মাত্র কর্ষিত হয় কিন্তু সে প্রশস্ততা নিম্নদেশে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র মাটি—উপরিভাগ হইতে ফালপ্রবিষ্ট শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমভাবে কর্ষিত হয় না। উপরিভাগ দেখিলে মনে হয় যে, সমগ্র কর্ষিত ভূমি খণ্ডে সমভাবে কর্ষিত হইয়াছে কিন্তু উপরিভাগের বিচলিত মৃত্তিকা যত্নসহকারে অপসারিত করিলে দেখা যাইবে ভূগর্ভ যেন নয়াঞ্জুলীরূপে—খাদ ও দাঁড়া

* কলিকাতার প্রসিদ্ধ দোকানদার টি, টমসন কোম্পানী কিম্বা জেসপ্ কোম্পানীর কারখানায়—'হিন্দুস্থান' ও 'শিবপুর' লাঙ্গল প্রাপ্তব্য।

রূপে কর্ষিত হইয়াছে ফলতঃ ভূপৃষ্ঠ যেরূপ কর্ষিত হইয়াছে নিম্নদেশ সেরূপ হয় নাই। এইরূপে কর্ষিত ভূমির রস ও সার ক্রমে খাদসমূহের মধ্যে সঞ্চিত হয় সুতরাং দাঁড়ার উপরবর্ত্তী গাছ সকল তাহার আস্বাদ পায় না কিম্বা আস্বাদেরও সুবিধা পায় না।



'শিবপুর' বা 'হিন্দুস্থান' লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত হইলে মাটি কত উল্‌টাইয়া যায় তাহা বাম ভাগের চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। হালের অগ্রগমনসহ সমগ্র মাটি যেন চাদরের ন্যায় এককারে উল্‌টাইয়া যাইতেছে—উপরিভাগ ও তলাচীর কোন স্থান বাদ পড়িতেছে না।

এ দেশের সর্ব্বত্রই বলদ ও মহিষ দ্বারা হলচালনার কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, মহিষ অপেক্ষা বলদ দ্বারা কাজ ভাল ও অধিক হয়। দেশী বলদ, মহিষ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও রৌদ্র নির্ব্বিশেষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেও সহজে ক্লান্ত হয় না, কিন্তু মহিষ স্বভাবতঃ বৃহদাকার ও স্থূলকায় এবং তন্নিবন্ধন মন্থরগতি। মহিষ যতক্ষণে একবার ঘুরিয়া আইসে দেশী বলদ ততক্ষণে দুইবার; অভাবপক্ষে দেড়বারও ঘুরিয়া আইসে। প্রাতঃকালে ও সায়ং-কালে মহিষ বেশ কাজ করিতে পারে কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপে আদৌ কাজ করিতে সক্ষম নহে এবং রৌদ্রে অধিকক্ষণ হাল টানিলে ক্লান্তিবশতঃ তাহাদিগের জিহ্বা বাহির

হইয়া পড়ে এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে থাকে, অগত্যা তাহাদিগকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিতে হয়।

ছেলে গরুর মধ্যে ষণ্ড ও বলদ বা দামড়া আছে, কিন্তু ষণ্ড অপেক্ষা দামড়া দ্বারা কাজ অধিক হইয়া থাকে। ষণ্ড স্বভাবতঃ খর্ব্বাকার ও স্থূল হয়, এজন্য বলদের ন্যায় ইহারা অধিকক্ষণ বা অধিক পরিমাণে কাজ করিতে পারে না। বলদের আকার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং শরীর লঘু বলিয়া তাহারা ষণ্ড অপেক্ষা ভাল কাজ করিতে পারে, অধিকন্তু তাহারা রৌদ্রে সহজে ক্লান্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত, ষণ্ডগণের কক্ষদেশের বলও কম বলিয়া শকট বা লাঙ্গলের কার্য্যে তাহারা সুপটু নহে। লাঙ্গলের কার্য্যে দামড়া গরু নিযুক্ত করাই উচিত।

হলচালনার সময়।—লাঙ্গল চালাইবার উপযুক্ত সময়—প্রাতঃকাল। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে লাঙ্গল জুড়িলে প্রাতঃকালের ঠাণ্ডায় কাজ করিতে পশুদিগের ও কৃষাণের কষ্ট হয় না। শীতকালে অধিক বেলা অবধি হাল চালাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন সহজেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায় না, তখন অধিক বেলা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খাটাইয়া লইলে তাহাদিগের শরীর রুগ্ন হইবার কথা। পশুদিগকে সর্ব্বদা তাজা রাখিতে হইবে, খাদ্যাভাব বা অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ তাহারা যেন কোন মতে দুর্ব্বল হইতে না পায়। উহাদিগকে দুই বেলা না খাটাইয়া প্রাতঃকালে যথাযথ পরিমাণে খাটাইয়া লওয়া ভাল, কেননা প্রাতঃকালে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া তাহারা দিবসের অবশিষ্ট কাল বিচরণ ও বিশ্রাম করিয়া পরদিবস পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকালে একবার খাটাইয়া অপরাহ্নে পুনরায় কাজে জুড়িলে তাদৃশ ভাল কাজ হয় না, অধিকন্তু পশুগণের কষ্ট হয়। দিবারাত্রি খাটিলে মানুষের শরীর যেরূপ

ভগ্ন হয়, সেইরূপ উহাদিগেরও হইয়া থাকে। কোন পশু পীড়িত হইলে তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া এবং তাহার চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সম্বৎসর মধ্যে ষোল বিঘা জমিতে আবাদ করিতে হইলে এক জোড়া বলিষ্ঠ দেশী বলদ ও একখানি হাল দ্বারা কাজ চলিতে পারে। এই পরিমাণ জমিকে কৃষিভাষায় 'এক-লাঙ্গল জমি' কহে অর্থাৎ এক-লাঙ্গল জমি বা ভূঁই বলিলে ষোল বিঘার অধিক জমি নহে বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অধিক কি, বাঙ্গালারই বিভিন্ন জেলায়—*এক-লাঙ্গল, জমির পরিমাণ বিভিন্ন, কারণ পশুর শক্তি, ঋতুর অবস্থা, ভূমির পরিগঠন (texture) ইত্যাদি অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া দেশ বিশেষের বা জেলা বিশেষের এক-লাঙ্গল-জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল দেশের জল বায়ু, ঋতু ও পশুর অবস্থা সমতুল্য হইলে সর্ব্বত্র এক নিয়ম চলিতে পারে, অন্যথা নহে। এই জন্য 'এক-লাঙ্গল জমি' বলিলে ১৬-বিঘা জমি ধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত নহে। বলদ ও লাঙ্গলের তারতম্যে এবং স্থানবিশেষ জমির মাপের ইতরবিশেষে এক-লাঙ্গল জমি ষোল বিঘার কম বা বেশী হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যে বিঘার কথা বলিতেছি, তাহার পরিমাণ—দীর্ঘে ৮০-হাত ও প্রস্থে ৮০-হাত এবং ইহাই বাঙ্গালা বা standard bigha।

* প্রতি চারি-লাঙ্গল জমির জন্য এক জোড়া অধিক পশু রাখিতে হয়, কারণ তাহা হইলে কোন সময়ে কোনটা পীড়িত হইলে ক্ষেতের কাজ আটক থাকে না। পালাক্রমে মধ্যে মধ্যে দুইটী পশুকে বিশ্রাম দিতে পারিলে সকল পশুই তাজা থাকে। কেবল যে লাঙ্গলের জন্যই ইহাদিগের প্রয়োজন—তাহা নহে, ইহাদিগের দ্বারা মোট হইতে জল উত্তোলন, জিনিষপত্র লইয়া স্থানান্তর যাতায়াতের জন্য শকট-বহন প্রভৃতি

কার্য্যও নির্ব্বাহিত হয়। ক্ষেত্রকার্য্যের অল্পাধিক্যানুসারে দুই একখানি নিজস্ব শকট থাকা আবশ্যক। নিজস্ব শকট থাকিলে কোন সামগ্রী কোথাও হইতে আনিবার জন্য অথবা কোথাও পাঠাইবার জন্য শকট ভাড়া করিবার প্রয়োজন হয় না। এতদ্ব্যতীত, উপযুক্ত সংখ্যক পশু না রাখিলে ক্ষেতে সার দিবার জন্য গোবরের বিশেষ অভাব হইয়া থাকে। যাহাদিগের নিজের গাই-বলদ আছে তাহারা বড় একটা সারের অভাব উপলব্ধি করে না কিন্তু, যাহাদিগের সে সুবিধা নাই, তাহাদিগকে সারের জন্য বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধার উপর আরও অসুবিধা এই যে, অর্থবিনিময়ে ইচ্ছামত সার সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। এই জন্য সকল কৃষিক্ষেত্রেই দুই-দশটা গবাদি পশু অধিক থাকা উচিত। গ্রামের মধ্যে যে সকল গৃহস্থের ঘরে অশ্ব, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি রক্ষিত হয়, তাহাদিগের আস্তাবোল, গোয়াল বা খোঁয়াড়ের আবর্জ্জনারাশি প্রতিদিন যাহাতে নষ্ট না হয়, তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে এবং সময়ে সময়ে সেই সকল কুড় আনিয়া আপন ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। সাধারণ গোরু সম্বৎসরে যে কত গোবর ও চোণা প্রদান করে তাহা বড় কম নহে। শিবপুর গবর্মেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক রায় বাহাদুর ভূপাল-চন্দ্র বসু মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেশীয় সাধারণ গোরু হইতে এক বৎসরে ৩০/ মণ গোবর ও ১৫/ মণ চোণা পাওয়া যায়। ভূপাল বাবুর উক্ত পরীক্ষা-ফল সাধারণের যে বিশেষ উপকারে আসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্ত হিসাব দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, একজোড়া বলদের মলমূত্র দ্বারা এক বিঘা জমিরও উপযুক্ত পরিমাণ সার হয় না, কারণ প্রতি বিঘাতে অনেক সময় ৫০।৬০ মণের

অধিক সার দিতে হয়। এই জন্য সারের সঙ্কুলনার্থ কয়েকটী বলদ অতিরিক্ত রাখিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয়, আবশ্যক মত বলদের সংখ্যা রাখিয়া কতকগুলি গাভী পুষিলে উভয় দিকেই লাভ আছে,—দুগ্ধ দ্বারা গৃহস্থের উপকার হয় এবং অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত দুগ্ধ বিক্রয় হইতে পারে অথচ গোবর ও চোণা দ্বারা সারেরও সচ্ছলতা হইয়া থাকে।

পশুদিগের স্বাস্থ্য-বিধান।—গৃহপালিত পশুদিগকে সর্ব্বদা যত্নসহকারে পালন করা কর্ত্তব্য। ক্ষেতের প্রধান কাজই যখন গো-মহিষাদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তখন তাহাদিগের যাবৎ অভাব-অভিযোগের উপর দৃষ্টি রাখা যেরূপ একান্ত প্রয়োজন, তাহাদিগের সুখ-সচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তদনুরূপ প্রয়োজন। তাহাদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে তাহারা সুশ্রী, সবল ও কর্ম্মঠ অবস্থায় বহুদিন জীবিত থাকিয়া প্রভুর ঋণ পরিশোধে পরাঙ্মুখ হয় না। ইতঃপূর্ব্বে উহাদিগের বাসস্থানের কথা বলিয়াছি। অতঃপর আরও একটী কথা বলিব। আবাসস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে এবং তন্মধ্যে অবাধে নির্ম্মল বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতে পারিলে তবে সে স্থান স্বাস্থ্যকর হয়, সে স্থানে বাস করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল—স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দীর্ঘ নিরাময় জীবন।

গৃহস্থের বাড়ীতে গোরু পুষিতে যে খরচা হইয়া থাকে, কৃষিক্ষেত্রে তাহাপেক্ষা অনেক কম খরচায় হয়। বাড়ীতে যে গোরু পোষা যায়, তাহার সমুদায় খোরাক খরিদ করিতে হয়, কিন্তু ক্ষেত্রের পশু ক্ষেত্রের অনেক পাতা-লতা, শাক-সবজী ও ঘাস খাইতে পায়, সুতরাং তাহাকে অন্য ক্রীত সামগ্রী অতি অল্প পরিমাণে দিলে চলে। ক্ষেত্রে ধানের চাষ থাকিলে খড় কিনিতে হয় না, শাক-সবজী থাকিলে

তাহার পরিত্যক্ত অংশ তাহারা খাইতে পায়। তাহাদিগের খোরাকের জন্য ক্ষেত্রমধ্যে কিয়দংশ জমি স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাতে নানাবিধ পশু-খাদ্যোপযোগী ফসলের আবাদ করিলে সম্বৎসর তাহাতেই তাহারা নির্ভর করিতে পারে। এবম্প্রকারের ফসলের মধ্যে রিয়ানা, গিনি-ঘাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ;—লুসার্ণ, মটর, গাজর প্রভৃতি গবাদি গৃহপালিত পশুর পক্ষে বলকারক ও উপাদেয় খাদ্য। রিয়ানা বা বিলাতি গহমার গাছ ৬।৭ হাত দীর্ঘ হয় ও বৎসর মধ্যে চারিবার কাটিয়া লইলে চলে এবং যতবার কাটিয়া লওয়া যায়, ততবারই উহা ঝাড় বাঁধিয়া জন্মে। প্রতি ঝাড়ে, রীতিমত যত্ন করিলে ৪০।৫০টী গাছ বা ফেকৃড়ি জন্মিয়া থাকে। গাছগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হইলেই কাটিতে আরম্ভ করা উচিত, নতুবা উহা পাকিয়া গেলে কঠিন হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় পশুরা উহার নিম্নাংশ পরিত্যাগ করিয়া উপরের কোমলাংশ মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। গিনি ঘাস (Guinea grass) ও বৎসরে চারি-পাঁচ বার কাটিতে পারা যায় ; উহার আকার উলুঘাসের ন্যায়, কিন্তু উহাপেক্ষা কোমল ও উপাদেয়। মাঠ-বাদামের লতিকা এবং কদলী বৃক্ষও সুন্দর খাদ্য। গোরুর খাদ্য ক্ষেত্রে মজুত রাখা উচিত। *

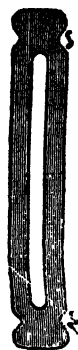
চৌকি—মদিকা—বিদ্ধক।—ক্ষেত্রে হলপ্রবাহ কার্য্য-সমাহিত হইবার অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালা দেশে মদিকা বা মই এবং বেহার অঞ্চলে চৌকি ব্যবহৃত হয়। মদিকা ও চৌকি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা কর্ষিত ক্ষেত্র সমতল হয়, ক্ষেত্রস্থিত ঢেলা ভাঙ্গিয়া যায়, তৃণ ও আগাছা সমূহ সংগৃহীত হয় এবং মৃত্তিকা কিয়ৎপরিমাণে চাপিয়া যায়। চৌকি বা মদিকা সাহায্যে

* মৎপ্রণীত "পশুখাদ্য" নামক পুস্তিকায় গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যোপযোগী নানাবিধ ফসলের আবাদ প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

ক্ষেত্রস্থিত ঢেলা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা না থাকিলে এবং মৃত্তিকা উত্তমরূপে বিচূর্ণিত না হইলে বিদ্ধক ব্যবহার করিতে হয়।

চৌকি।—ইহা একখণ্ড চারি হস্ত দীর্ঘ কাষ্ঠ। ইহা প্রস্থে দশ অঙ্গুলি এবং ঘনতায় আট অঙ্গুলি হইয়া থাকে। ইহা এক জোড়া বলদে টানে। ইহার যে-ভাগ নিম্নাংশে থাকে, সেই অংশ হইতে ডোঙ্গা বা শালতির মত শাঁস কুরিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। শাঁস কুরিয়া বাহির করিয়া লইলে চৌকি অপেক্ষাকৃত লঘু হয় এবং প্রবাহকালে উহার শূন্য স্থান মধ্যে উচ্চ স্থানের ঢেলা ও মাটী সঞ্চিত হইয়া নিম্ন স্থানে গিয়া আপনা হইতে খসিয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে উহা একপ্রকারের ডোঙ্গা বা শাল্‌তিবিশেষ। পার্শ্বে উহার চিত্র দেওয়া গেল। চিত্রে চৌকির নিম্নভাগ দেখান হইয়াছে। ক্ষেত্রে চৌকি দিবার সময় এই অংশ মাটীর দিকে থাকে। চৌকির যে যে স্থানে ১ ও ২ লিখিত আছে, সেই সেই স্থানে একটী করিয়া খাঁজ আছে এবং তাহাতে রজ্জুর একাংশ বাঁধিতে হয় এবং অপরাংশ বলদের গলার রজ্জুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। বলদের স্কন্ধে যে জোয়াল দেওয়া হয়, চৌকিতে যোজিত করিবার সময় তাহার আবশ্যক হয় না, বরং তৎপরিবর্ত্তে বলদ যাহাতে এদিক-ওদিক না গিয়া যথাভাবে চৌকি টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য সংযোজিত পশুদ্বয়ের শৃঙ্গে রজ্জু বাঁধিয়া দিতে হয়।

চৌকি



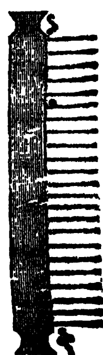
চিত্রে ছোট চৌকি প্রদর্শিত হইল—ইহা একজোড়া পশুতে টানে। বড় চৌকি—ইহার ঠিক দ্বিগুণ দীর্ঘ হয় এবং তাহাতে দুইজোড়া বলদের প্রয়োজন হয়। বড় চৌকি দ্বারা অতি শীঘ্র কার্য্য সমাধা হয়, এইজন্য

বড় চৌকি ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। কাঁটাল, তিন্তিড়ী, গাম্ভীর, শাল, বাবলা প্রভৃতি ঘন ও ভারী কাঠে উত্তম চৌকি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত কাঠ সকল অপেক্ষাকৃত ভারী, রৌদ্রবৃষ্টিসহ ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

মদিকা।—মই বা মদিকার বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই কারণ ইহা কাহারও নিকট অবিদিত নহে। ইহাও ছোট ও বড়—দুই আকারের হয়। ছোট মই—একজোড়া, এবং বড় মই—দুই জোড়া পশুতে টানিয়া থাকে। হাল্‌কা মাটীতে মই দ্বারা চৌকির ন্যায় সুচারুরূপে কাজ হয় না, এইজন্য মদিকার পরিবর্ত্তে চৌকি ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় কিন্তু চৌকির পশু অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক।

বিদ্ধক বা বিদে।—মদিকা ও চৌকির ন্যায় বিদ্ধকও ছোট এবং বড়—এই দুই আকারের হয়। ছোট বিদে—একজোড়া, এবং বড় বিদে—দুই জোড়া পশুতে টানে। ছোট বিদ্ধক ৪-হাত এবং বড় বিদ্ধক ৮-হাত দীর্ঘ হয়। বিদ্ধকের কাষ্ঠ আট অঙ্গুলি চওড়া এবং ছয় অঙ্গুলি স্থূল হয়। বিদ্ধকের আকার চিরুণীর মত। চিরুণীর দ্বারা চুল কুলাইলে চুলের জট্ ছাড়িয়া গিয়া চুলগুলি স্বতন্ত্র হয় ও কোমল হয়। বিদ্ধকদ্বারা মৃত্তিকা পরিচালিত হইলে মাটীরও ঘনতা ও দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া গিয়া মাটী ঝুরা ও কোমল হয়, অধিকন্তু আগাছা শিকড় প্রভৃতি বিদ্ধকের দন্ত পঙ্‌ক্তিতে আট্‌কাইয়া যায় এবং বিদ্ধক-পরিচালক—আবশ্যকমত সময়ে সময়ে—সেইগুলিকে দন্ত হইতে পাচন-বাড়ী দ্বারা ছাড়াইয়া দেয়।—বিদ্ধকের স্থূলাংশের একদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহশলাকা থাকে এবং উক্ত শলাকা

বিদ্ধক



পরস্পরের মধ্যে চারি অঙ্গুলি ব্যবধান থাকে। বলা বাহুল্য পরিচালনা-কালে দন্তপঙ্‌ক্তিকে ভূমিতে সংলগ্ন রাখিয়া ১ ও ২ চিহ্নিত খাঁজের সহিত রজ্জুদ্বারা পশুদ্বয়কে বাঁধিয়া দিতে হয়। মাটী রসা থাকিতে বিন্ধক ব্যবহার নিষিদ্ধ। উত্তম যো'য়ে উহা পরিচালনা করা উচিত। কর্ষিত ক্ষেত্রে বিন্ধকের পর মাদিকা বা চৌকি দেওয়া উচিত।

সপ্তম অধ্যায়

ভুগর্ভে রসের পরিক্রমণ।—মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জগৎ পর্যান্ত দেখা যায় যে, সকলের শরীর মধ্যে শোণিত বা রস পরিক্রমনের ব্যবস্থা আছে। সেই গতি বা প্রবাহ কোন প্রকারে রুদ্ধ হইলে জীব হউক বা উদ্ভিদ হউক—অধিকক্ষণ সতেজ বা জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের লোমকূপগুলিকে কোন রং অথবা ভস্মদ্বারা একেবারে লেপিয়া দিলে সে কতক্ষণ বাঁচিতে পারে? উদ্ভিদের পত্রদল এবং শাখা-প্রশাখার কোমল ও হরিৎ অংশকে ঐরূপে প্রলিপ্ত করিয়া দিলে উদ্ভিদও বাঁচিতে পারে না। মৃত্তিকার মধ্যে রস-পরিক্রমনের শক্তি আছে এবং রস-আহরণের ও বর্জ্জনের পথ আছে। উক্ত শক্তির মূলে উত্তাপের কার্য্য দেখা যায়।

জীবশরীরে যতক্ষণ উত্তাপ থাকে ততক্ষণ তাহাতে শোণিত প্রবাহিত হয় কিন্তু যেমন উহা উত্তাপহীন হয়, অমনই উক্ত ক্রিয়া স্থগিত হয়। মরণোন্মুখ ব্যক্তির হস্তপদাদি ক্রমে যখন স্থির হইয়া আইসে তখন সেই সকল অংশে আর উত্তাপ পাওয়া যায় না। উত্তাপই প্রবাহের মূল। ভূগর্ভে যে রস থাকে, তাহা সূর্য্যোত্তাপে সঞ্চালিত হয়। সূর্য্যোত্তাপ যখন না থাকে তখন ভূগর্ভস্থ রস স্থির থাকে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের অদর্শনহেতু ভূমির রস অল্পাধিক স্পন্দহীন হয়, তবে যে সামান্য প্রবাহ থাকে তাহা ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত উত্তাপের ক্রিয়াফল।

যাহা হউক, মৃত্তিকামধ্যে কিরূপে রস প্রবাহিত হয় তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কটাহে বা কোন পাত্রে দুগ্ধ জ্বাল দিবার কালে দেখিতে পাওয়া যায়, দুগ্ধ যত উত্তপ্ত হইতে থাকে ততই চঞ্চল ও উলট্‌পালট্‌ হয়, নিম্নের দুগ্ধ উপরে ও উপরের দুগ্ধ নিম্নে যাইতে থাকে। সুপরিষ্কৃত কটাহে জল রাখিয়া যদি উত্তাপে দেওয়া যায়, তাহা হইলে আরও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্নের জল যত গরম হইতে থাকে ততই উপরে ঠেলিয়া উঠে, আর উপরের জল কাজেই নিম্নে নামিয়া গিয়া উত্তপ্ত হয়। উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মবশে সূর্য্যোত্তাপে ভূমির উপরিভাগ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে মৃত্তিকার অণু-পরমাণু দ্বারা বাহিত হইয়া সেই উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেই ভূগর্ভ মধ্যে রস সঞ্চালিত হয়।

ছিদ্রপথ।—ভূমির গর্ভদেশ হইতে যে সকল সূক্ষ্ম প্রণালীর ভিতর দিয়া তন্মধ্যস্থিত রস পৃষ্ঠভাগে উঠে এবং ভূপৃষ্ঠের রস বা জল ও উত্তাপাদি ভূগর্ভমধ্যে প্রবেশলাভ করে, তাহাদিগকে ছিদ্রপথ (capillary tubes) কহে। উক্ত ছিদ্রপথ জালবৎ বিন্যস্ত। উহারা পরস্পরে এমনই সংযুক্ত যে উহাদিগের সমষ্টিকে জালবৎ বোধ হয় এবং

এই কারণেই ভূপৃষ্ঠের কোন এক স্থানে জল পড়িলে নানাদিক দিয়া বহুদূরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। ফল কথা—ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভ মধ্যে সম্বন্ধ রাখিবার জন্যই ছিদ্রপথ সৃজিত হইয়াছে।

ছিদ্রপথের উৎপত্তি।—ইহাদিগের নিজস্ব কোন আকার নাই। যে সকল উপাদানে মৃত্তিকার উৎপত্তি তাহাদিগের একত্র সমাবেশ হইলে স্বতই ছিদ্রপথেব উদ্ভব হয়। মৃত্তিকার উপাদানসমূহ স্থূল পদার্থ এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের আকার ও অবয়ব আছে। উক্ত পদার্থসমূহ সাকার সাবয়ব কণা বা পরমাণু একত্রিত হইলে পরস্পরের ব্যবধানে যে সকল অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বা শূন্য স্থানের আবির্ভাব হয়, তাহারাই ছিদ্রপথের মুখ বা মোহনা (pores)। কণাসমূহের সমাবেশফলে একদিকে যেরূপ ছিদ্রপথের মোহানা (mouth) উৎপন্ন হয়, অন্যদিকে সেইরূপ সেই সকল ক্ষুদ্র ছিদ্র পরস্পর সংযুক্ত হইলে ছিদ্রপথের আবির্ভাব হয় এবং তখন উহা জালবৎ আকার ধারণ করে। অতএব দেখিতে হইবে যে,—

যে জিনিস নিরাকার ও নিরবয়ব তাহার আকার ও অবয়বের উৎপত্তির মূল কি? বিষয়টী বিশেষ গুরুতর মনে হইলেও-মীমাংসা অতি সহজ। মৃত্তিকার তাবৎ স্থূল উপকরণেই আকার ও অবয়ব আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহাদিগের আকার প্রায় গোল বা গোলক সদৃশ। ইহারাই ছিদ্র ও ছিদ্রপথের মূল। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা একাধিক একত্রে সমাবিষ্ট ও ঘননিবদ্ধ না হইলে মাটীর ছিদ্র বা ছিদ্রপথ উৎপন্ন হয় না।

মৃত্তিকার উপাদানসমূহের আকারানুসারে ছিদ্রপথ ও তাহাদিগের মোহানা সমূহের স্থূলতা বা কৃশতা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কণা বা দানাসমূহ স্থূল হইলে ছিদ্রপথ ও মোহানা স্থূল হয়, এবং সূক্ষ্ম

হইলে কৃশ বা সঙ্কীর্ণ হয়। ইহাদিগের স্থূলতা বা কৃশতা অনুসারে মৃত্তিকার শোষকতা, ধারকতা ও উৎক্ষেপণ শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। এই জন্য কোন জমি অধিক, আবার কোন জমি অল্প, রস শোষণ ও বর্জ্জন করিতে সক্ষম। মাটীর ছিদ্রপথের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনুসারে বিলম্বে বা শীঘ্র ভূমি সরসতা বা নীরসতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর, এঁটেল ও বেলে মাটীর প্রকৃতি ও গঠন বিষয়ের অনুশীলন করিলে অবশিষ্ট কথা বোধগম্য হইতে বাকী থাকিবে না।

আচোট জমির উর্ব্বরতা।—যে জমি বহুকাল পতিত ও অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকে তাহাকে অক্ষত বা আচোট জমি কহে। আচোট জমিকে ইংরাজীতে virgin soil বলে। বাঙলা দেশের নানাস্থানে এরূপ পতিত জমি বিস্তর দেখা গিয়া থাকে। ইদৃশ জমি যে পতিত থাকে, তাহার দুইটী কারণ আছে, প্রথমতঃ—স্থানীয় প্রদেশ বা জেলার লোকাভাব; দ্বিতীয়তঃ—চাষবাসের পক্ষে মৃত্তিকার অনুপযোগীতা।

যে সকল ভূমি স্বভাবতঃ আবাদোপযোগী অথচ পতিত থাকিয়া গুল্মলতাদি দ্বারা বহু দিবস হইতে আবৃত, তাহারা অধিক উর্ব্বরা হইয়া থাকে। একেই ত আবাদ না হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত বা স্বাভাবিক সারপদার্থসমূহ ক্ষেত্রমধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তাহাতে আবার বহু দিবসের আগাছা ও জঙ্গল থাকায়, সেই জঙ্গলের পাতালতা, শাখাপ্রশাখাদি ও শিকড় পচিয়া গিয়া জমিতেই মজুত থাকে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ফসলের আবাদ করিলে যেরূপ জমির উর্ব্বরতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জঙ্গল জন্মিয়াও ত ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা নষ্ট করে। এরূপ ধারণা যে অমূলক—তাহা নহে, কারণ ক্ষেত্রে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাতেই জমির সারাংশ ন্যূনাধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে

সমুদয় উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, তাহা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত না হইলে রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় ক্ষেত্রমধ্যেই স্থান পায়। অধিকন্তু সেই সকল উদ্ভিদের দ্বারা বায়বীয় পদার্থও ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়। এতদ্ব্যতীত, সেই সকল উদ্ভিদ মৃত্তিকার অভ্যন্তরদেশ হইতে নানাবিধ সার পদার্থ উপরিভাগে আনয়ন করিয়া ক্ষেত্রকে সজীব রাখে। অক্ষত জমিতে সচরাচর নাইট্রোজেন নামক পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে। এই কারণে তাহাতে যেকোন ফসল দেওয়া যায়, তাহাই সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হয়।

জমি যতই অধিক দিনের পতিত হয়, যতই জঙ্গলময় হয়, ততই সারবান হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রের জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাদিগের উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং অনাবশ্যক স্থলে ক্ষেত্রের জঙ্গল কাটিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিলে মাটীর উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষেত্রের জঙ্গল কাটিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। আর যদি নিতান্তই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্র মধ্যেই পচিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে জমির সার পদার্থ জমিতেই আবদ্ধ থাকে অধিকন্তু, সেই সকল উদ্ভিদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত নানাবিধ সার জমিতে সংযোজিত হয়।

মুরসিদাবাদের 'রৈইসবাগ' মধ্যে কিয়দংশ জমি বহুকাল হইতে অনাবাদী ছিল এবং তাহাতে এতই উলুঘাস ও জঙ্গলাদি জন্মিত যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। বিগত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত জমির জঙ্গলমুক্ত করতঃ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া ৩।৪ মাস কাল তদবস্থাতেই ফেলিয়া রাখা হয়। তদনন্তর তাহাতে পাটের, তৎপরে সর্ষপের আবাদ করা যায়। বলা বাহুল্য যে, আবাদী ক্ষেত্র অপেক্ষা নূতন ক্ষেত্রে বহু অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল।

যে সকল জমি লবণ, ক্ষার, চূণ প্রভৃতির আতিশয্যবশতঃ অনেক দিবসাবধি পতিত আছে, তাহাতে সমধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযোজিত করিলে সারবান হইয়া উঠে, নতুবা তদবস্থাতেই চাষ আবাদ করিলে লবণাক্ত পদার্থের প্রাচুর্য্যবশতঃ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না।

মৃত্তিকার বিরাম।—প্রাণী ও উদ্ভিদগণের মধ্যে যেরূপ ক্লান্তি আছে এবং তাহা দূর করিবার জন্য যেরূপ বিশ্রামের প্রয়োজন, তদ্রূপ মৃত্তিকারও ক্লান্তি আছে, সুতরাং তাহারও বিশ্রামের আবশ্যক হয়। অবিরাম শ্রম করিলে জীবদেহ ভগ্ন হয়, উদ্ভিদ দুর্ব্বল হয় এবং মৃত্তিকা ক্ষীণশক্তি হয়। অতএব, ক্লান্তির পরে বিশ্রামের আবশ্যক থাকে।

বারংবার এক ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করিলে ক্ষেত্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাতে উদ্ভিদখাদ্যের আপাততঃ অভাব হয়। উক্ত অভাব মাচন করিবার জন্য ক্ষেত্রকে বিরাম দিবার নিয়ম আছে। মৃত্তিকার ক্লান্তির সময় অনুমান করা সহজ। প্রথম অবস্থায় উহাতে যেরূপ ফসল জন্মিবে, ক্ষেত্র যতই পুরাতন হইবে, ততই তাহার সে শক্তি হ্রাস পাইতে থাকিবে, কিন্তু সার প্রদান করিলে সে অভাব আর অনুভূত হয় না। সার প্রয়োগ করিলেও সময়ে সময়ে জমিকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, ধরিত্রী সহজে ক্লান্ত হয়েন না। ক্ষেত্র হইতে এক ফসল উঠিয়া যাইবার পর ক্ষেত্রকে অকর্ষিতাবস্থায় পতিত রাখিলে কোন উপকার হয় না। ক্ষেত খালি হইলে তাহাকে উত্তমরূপে কর্ষণ করতঃ মই বা চৌকি দিয়া রাখিলে বায়ুমণ্ডল হইতে বায়ব্য পদার্থ স্বতঃই তাহাতে সঞ্চিত হয়।

২।৪ বৎসর অন্তর একবার ২।৪ মাসের জন্য ভূমিকে বিশ্রাম দিয়া পরে তাহাতে সারসংযোগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, চাষীগণ জমিকে বিশ্রাম দিলে তাহাতে

আর সার প্রদান করে না, কারণ বিশ্রামকালমধ্যে মৃত্তিকা স্বতঃই বায়ুমণ্ডল হইতে সমধিক পরিমাণে বায়ব্য পদার্থ আহরণ করতঃ পুনরায় সজীব হইয়া উঠে।

সকল ক্ষেত্রেরই যে বিশ্রাম আবশ্যক হয় তাহা নহে, কারণ এরূপ অনেক জমি আছে, যাহাতে প্রতি-বৎসর জলে প্লাবিত হইয়া যাওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়। সেই সঙ্গে মাটীতে অনেক উদ্ভিদখাদ্য বহির্দ্দেশ হইতে স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ভিন্ন প্রস্তাবে পলির বিষয় স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়াছে, তজ্জন্য এস্থলে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, যে সকল ভূমি জল-প্লাবন, বন্যা বা অতিরিক্ত বর্ষায় ডুবিয়া যায় তাহাদিগের বিরামের আবশ্যক হয় না, বরং জল শুকাইয়া গেলে তাহাতে যে ফসল জন্মিতে থাকে, তাহা ডাঙ্গা জমির অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। নদীর কিনারায় বা গর্ভে যে সমুদায় চর আছে, তাহা বর্ষায় ডুবিয়া যায় বলিয়াই এত উর্ব্বরা,—এত শস্যশালিনী হয়।

বস্তী-জমি।—গ্রন্থকারের বাসস্থানের সম্মুখে পাঁচ বিঘা পরিমিত একখণ্ড জমিতে শতাধিক বৎসরব্যাপী এক বস্তী ছিল। উহাতে বহু প্রজা খাপরার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আধুনিক নিয়মানুসারে উক্ত বস্তী রক্ষা করা অসুবিধাজনক বোধ করিয়া ভূমির সত্ত্বাধিকারী উক্ত জমি খালি করেন, ফলতঃ প্রজাগণ স্থানান্তরে গমন করিল। উক্ত খালি জমিতে কোন ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে কয়েক মুষ্টি সর্ষপ ছড়াইয়া দিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে জমির কোনরূপ পরিচর্য্যা হয় নাই। কিন্তু বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। পৌষ-মাঘ মাসে সেই সকল গাছ যেমন তেজাল, তেমনই ঝাড়াল হইয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে বিস্মিত

করিয়াছিল। প্রত্যেক গাছই ৪-হাত হইতে ৪॥০-হাত উচ্চ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক গাছ ২-হাত হইতে ২॥০ হাত স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই সর্ষপ ক্ষেত্রে কেহ কেহ প্রবেশ করিলে বহির্দ্দেশ হইতে কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না। গাছগুলি যেমন তেজাল, ঝাড়াল ও নয়নরঞ্জক হইয়াছিল, সুঁটীর পরিমাণ ও পরিপুষ্টি—তেমনি বিস্ময়কর হইয়াছিল। গাছগুলি আর ৩।৪ সপ্তাহকাল জীবিত থাকিতে পাইলে সাধারণ সর্ষপক্ষেত্র অপেক্ষা ৭।৮ গুণ অধিক এবং উৎকৃষ্ট সর্ষপ পাওয়া যাইত কিন্তু মিউনিশিপ্যাল অধস্তন কর্ম্মচারীগণের শ্যেন দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ফলন্ত গাছগুলিকে সমূলে বিনাশ করিতে হইল!

সেই জমিতেই পরবৎসর কতকগুলি স্বরোপিত পেঁপে ও এরণ্ড গাছ জন্মিয়াছিল। সেগুলিও সুদীর্ঘ ও সুপ্রসারিত হইয়াছিল। সচরাচর এরূপ দেখা যায় না বলিয়া উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করা গেল। ইহা হইতে সহজে বুঝা যায়—দীর্ঘকালের বস্তী জমি কত উদ্ভিদখাদ্যে পূর্ণ থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্তিকার উৎপত্তি।—সৃষ্টিকালে এই সুবিশাল পৃথিবীতে মৃত্তিকা নামক কোন পদার্থ ছিল না। নানা ধাতবীয় পদার্থ, কঠিন, প্রস্তর রাশি ও অসীম বারিধি—এই কয়টি ধরিত্রীর মৌলিক উপাদান। উক্ত কঠিন প্রস্তরাদি ক্রমে বিগলিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হয়। অতঃপর সেই সকল পরমাণু বৃষ্টির জলে শৈলাঙ্গ বিচ্যুত হইয়া নিম্নতলে নামিয়া আসে কিন্তু গুরুত্বহেতু সেই সকল কণা বা পরমাণু জলের সহিত সংমিশ্রিতভাবে থাকিতে না পারিয়া ক্রমশঃ স্থিরভাব ধারণ করে। পরমাণুগণের ঈদৃশভাবের ফলে ভূমি উৎপন্ন হয়। ইহাই হইল—মৃত্তিকা বা মৃত্তিকার ভিত্তি।

পরমাণু।—বজ্রসম কঠিন শৈলরাজি হইতে কিরূপে পরমাণুগণ উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব। পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্ট পদার্থ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এবং সেই স্বাভাবিক নিয়মবশতঃ তাবৎ পদার্থ অজ্ঞাতসারে অহর্নিশ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শিশির ও বৃষ্টি,—এতদুভয়ই শৈলাঙ্গ হইতে পরমাণুদিগকে বিচ্যুত করিয়া দিতেছে। অতঃপর, সেই সকল পরমাণু শৈলাঙ্গ মধ্যে সামান্য ফাটাল বা ছিদ্র উৎপন্ন হইলে তাহাতে শৈবাল বা তৎসদৃশ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র প্রাথমিক উদ্ভিদ—শৈবাল প্রভৃতি জন্মে। উক্ত উদ্ভিদগণ পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া ও মরিয়া সেই সকল স্থানে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ করিয়া দেয়। অনন্তর, তাহাতে অপেক্ষাকৃত বড় জাতির

গুল্মাদি উদ্ভিদ জন্মে। এইরূপ যত দিন যায় ততই শৈলাঙ্গে বৃহত্তর উদ্ভিদ জন্মে এবং ততই শৈলাঙ্গে উদ্ভিজ্জ পদার্থের বাহুল্য হয়। বৃষ্টির সহিত অথবা শৈলজাত নির্ঝরিণীসহ উক্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও শৈলকণাগণ ভূতলে নামিয়া আসে। এতদ্ব্যতীত তাবৎ উদ্ভিদের মূলে যে অম্ল (acid) বিদ্যমান থাকে সেই অম্ল দ্বারা তৎসন্নিহিত অজৈব পদার্থও জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে শৈলাঙ্গসম্ভূত কণাসমূহকে পৃথক্ করিয়া দিলে তাহারা নিম্নদেশে নামিয়া আইসে। উক্ত পরমাণুগণ শৈলবিশেষে বিভিন্ন পদার্থসঙ্কুল হইয়া থাকে। সকল শৈল সম উপাদানে সংগঠিত হইয়া থাকিলে পরমাণুসমূহও যে সমপ্রকারের হইত সে বিষয়ে সংশয় নাই। পাহাড়-পর্ব্বতের তাবৎ প্রস্তররাশি ধাতব পদার্থের জমাট ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে কোন স্থানে কোন পাহাড়ের অবয়বে কোন কোন ধাতুর প্রাধান্য থাকে, আবার কোন কোন ধাতুর অভাব থাকে। এই কারণে সকল স্থানের মাটীতে উপাদানের পার্থক্য দেখা যায়।

মৃত্তিকার প্রকৃতিভেদ।—মৃত্তিকান্তর্গত পরমাণুগণের আকারানুসারে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকার উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে স্থূল-কণা ও সূক্ষ্মকণা—এই দুইটী প্রথম বিবেচ্য। সচরাচর স্থূলকণা-সম্ভূত মৃত্তিকাকে বেলেমাটী ও সূক্ষ্মকণাজাত মৃত্তিকাকে এঁটেল মাটী নামে আমরা অভিহিত করিয়া থাকি। এতদুভয়ের আনুপাতিক, পরিমাণানুসারে ও জৈবাদি অপর পদার্থের অল্পাধিক্য হেতু মৃত্তিকা মধ্যে বহু প্রকার জাতি দেখা যায়। জৈব পদার্থ সমন্বিত মৃত্তিকার নাম দো-আঁশ, দো-বরা বা দো-রসা মাটী। দো-আঁশ মাটীও উপকরণের তারতম্যে নানা প্রকারের হইয়া থাকে। *

এতৎসম্বন্ধে তাবৎ জ্ঞাতব্য কথা 'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

মৃত্তিকার পূর্ণতা।—মৃত্তিকার প্রথম উপাদান বা বনিয়াদ-মসলা স্থূল হউক বা সূক্ষ্মই হউক তাহাতে তত আসিয়া যায় না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহাতে জৈব (organic) পদার্থের সমাবেশ বা সংযোগ হয়, ততক্ষণ তাহাকে মৃত্তিকা নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। এই জন্য উক্ত পদার্থ-বিহীন মৃত্তিকা, মৃত্তিকা শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। বনিয়াদ-মসলার সহিত জৈব পদার্থ সংযোজিত হইলে তবে তাহাকে মৃত্তিকা বলিতে পারা যায়। অতঃপর, জৈব পদার্থের পরিমাণানুসারে ভূমির গুণাগুণ বিচার করিতে হয়।

মৃত্তিকার স্থিতিস্থাপকতা।—স্থিতিস্থাপকতা মৃত্তিকার একটী বিশেষ গুণ। উক্ত গুণের অস্তিত্ব হেতু ভূমির শোষকতা, ধারকতা প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব হয়। জৈব পদার্থের আধিক্য বা অল্পতা-হেতু ভূমি কোমল বা কঠিন হইয়া থাকে। যে জমি যত কোমল হয়, সে জমি তত শোষক ও সরস হইয়া থাকে কিন্তু জৈব পদার্থ যত জীর্ণ হইতে থাকে, মৃত্তিকার কোমলতা তত হ্রাস পাইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শোষকতা, ধারকতা প্রভৃতিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই জন্য কোন ভূমির স্থিতিস্থাপকতা ও তজ্জাত গুণ স্থায়ী নহে। ভূমির গুণ চিরস্থায়ী হইলে মৃত্তিকাসংস্কারের কোন প্রয়োজন হইত না। যে সামগ্রীর সংস্কার করিতে পারা যায় তাহাকে কোন ক্রমেই পূর্ণ বলিতে পারা যায় কি? তথাপি সাময়িক সুবিধার জন্য মৃত্তিকার বর্ত্তমান পরিগঠন (texture) ও গুণ দেখিয়া তাহাকে কোন-না-কোন একটী শ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলে মাটী। এতৎ সম্বন্ধে একবার স্থানান্তরে বলিয়াছি, কিন্তু যে জমির কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে অল্পায়াসে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে অথবা যে প্রকার জমিতে আবাদ করা চলিতে পারে কিন্তু যে জমিতে বালির ভাগ অধিক

ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের নিতান্ত অভাব, তাহাতে কোনও ফসল সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহা অকর্ম্মণ্যপ্রায় ভিন্ন আর কি? রৈইসবাগে (মুরসিদাবাদ) এইরূপ একখণ্ড ক্ষেত ছিল। প্রথমতঃ তাহাতে কোন গাছই জন্মাইতে পারা যায় নাই, অধিক কি, বর্ষাকালে কদাচ তাহাতে তৃণ জন্মিত। পরে, উক্ত ভূমি খণ্ডে ঘনভাবে কদলীবৃক্ষের আবাদ করা যায়। ঐ সকল গাছ ফলিলে যথারীতি ফল কাটিয়া আনা হইত এবং অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ কাণ্ডাদি টুকরা টুকরা করিয়া জমিতেই ফেলিয়া রাখা হইত। কদলী-ক্ষেত্রে সর্ব্বদা রসের অবস্থান হেতু এবং গাছের কাণ্ডাদি পচিয়া মাটীতেই সংযোজিত হইতে থাকায় উক্ত ক্ষেত দুই বৎসরের মধ্যে আবাদোপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল।

বেলে ভূমি একবারে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখা কোন মতে উচিত নহে। তাহাতে কদলী-কানন রচনা করিলে আয় হইয়া থাকে, মৃত্তিকারও সংস্কার হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা ঈদৃশ জমিতে কদলী-কানন রচনা করিবার পরামর্শ দিই। এ বি'য়ে অধিক কিছু বলিরার নাই, কারণ ইতঃপূর্ব্বে অন্য প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

নোনা-মাটী।—লবণাধিক্য বশতঃ অনেক জমিতে কোনরূপ আবাদ হয় না, এতন্নিবন্ধন তাদৃশ ভূমি প্রায় অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকে। নোনা জমিতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি পরাস্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে অনেক নোনা ভূমিতে চাষ-বাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

নোনা ভূমির প্রধান লক্ষণ,—প্রচণ্ড উত্তাপের দিনে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তাহার উপরিভাগে শুভ্রবর্ণের এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ আপনা হইতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইবার পর যখন

মাটী শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সেই সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণের গুঁড়া ভূমির পৃষ্ঠদেশে দেখা দেয়। উহা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারেন না সুতরাং অনুমান ও স্থানীয় অবস্থার অনুশীলন দ্বারা অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু উহা যে ভূগর্ভস্থ লবণের অংশ তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। উক্ত শ্বেত পদার্থ বেহার অঞ্চলে 'রে' বা 'উষর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উষরের মধ্যে প্রধানতঃ সল্‌ফেট-অব-সোডা (Sulphate of soda) ও কার্ব্বনেট-অব-সোডা বা সাজিমাটী (Carbonate of soda) লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উহা খনিজ পদার্থ এবং উহার আস্বাদ লবণাক্ত। এজন্য যে জমিতে উহার আতিশয্য দেখা যায়, তাহাতে কোন ফসল জন্মিতে পারে না। উষর ভূমির সঙ্গে ভাল জমিও থাকে, আবার ভাল জমির সন্নিকটেও উষর ভূমি দেখা যায়। উষর বা নোনা ভূমিতে যে জলাশয় থাকে, তাহার জলও লবণাক্ত হয়। কলিকাতা হইতে দমদমা যাইবার রেলপথের পূর্ব্বাংশে উল্টাডিঙ্গী নামক স্থানে কাশীপুর ইন্‌ষ্টিটিউশনের কৃষিকার্য্যের জন্য একখণ্ড সুবৃহৎ জমি ছিল। উহা এক কেতায় প্রায় ১০০/ একশত বিঘার অধিক জমী হইবে। উক্ত জমীর কিয়দংশ উষর বা নোনা ছিল সুতরাং তাহাতে দুই-তিন বৎসর কোনরূপে কোন উদ্ভিদ জন্মাইতে পারা যায় নাই। বলা বাহুল্য যে, সেই জমিকে আবাদোপযোগী করিতে বিস্তর অর্থব্যয় হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ চাষ ও রাশি রাশি সাঁর দিয়াও দুই তিন বৎসর তাহাতে কোন ফসল সুচারুরূপে উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দেখা গিয়াছে যে, ক্ষেত্রময় লবণ ভাসিয়া আছে; কিন্তু বৃষ্টির সময় উহা লক্ষিত হইত না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেলে আর

সে লবণ ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিগোচর হইত না, জলের ভারে উহা ভূগর্ভের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। ডাক্তার ভোয়েল্কার সাহেব শেষোক্ত মতের পোষকতা করিয়া বলেন যে, বৃষ্টি হইলে উহা ভূগর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে এবং যতই মৃত্তিকার রস শুষ্ক হইতে থাকে, ততই সূর্য্যের আকর্ষণে পুনরায় জমীর উপরিভাগে আসিয়া পোঁছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে, জমীর আর্দ্রাবস্থায় উক্ত লবণের অস্তিত্ব আদৌ লক্ষিত বা অনুভূত হইত না, কিন্তু জমী শুকাইয়া গেলেই ফসলের অনিষ্ট হইত। এই জন্য উক্ত জমীকে নিরন্তর আর্দ্র রাখা হইত। উক্ত জমিতে বা ইহার মৃত্তিকাতে যখনই কোন বীজ বপন করা হইত, অঙ্কুরিত হইবামাত্রই চারাগুলির গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। লবণের ধর্ম্ম,—সংলগ্ন পদার্থকে ক্ষয় করা, সুতরাং লবণ সংস্পর্শে গোড়া ক্ষয় হইয়া চারাগুলি পড়িয়া যাইত। উক্ত জমিখণ্ডকে আবাদোপযোগী করিয়া তুলিতে উক্ত ইনষ্টিটিউশনের কর্ত্তৃপক্ষের বহু মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল, তথাপি ৮।১০ বৎসরকাল তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আবাদ করিতে পারা যায় নাই। রাজনগর মধ্যে দ্বারবঙ্গ-রাজের 'কলম-বাগ' নামক একখানি বৃহৎ বাগান আছে। তাহার একাংশে অনেকগুলি লিচু গাছ, অপরাংশে আম্র-কানন আছে। যে অংশে লিচু গাছ আছে তাহার উত্তরাংশস্থিত গাছগুলি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট, ঝাড়াল এবং নয়নানন্দদায়ক, কিন্তু দক্ষিণাংশস্থিত গাছগুলি রুগ্নাকৃতি, বৃদ্ধিহীন ও পত্রবর্জ্জিতপ্রায় এবং যে কয়টী পত্রও গাছে থাকিত, তাহাও অসম্পূর্ণ, বিবর্ণ ও জ্যোতিহীন। এই শেষোক্ত অংশে দুই তিন বৎসর হইতে বারম্বার হলচালনা করতঃ মাটী চূর্ণ করিয়া দেওয়ায় এবং বৎসরান্তে বর্ষার প্রারম্ভে একবার গাছের গোড়ায় সার প্রদান করায়, সেই শীর্ণ ও পত্রহীন বৃক্ষগুলি সুন্দর ঝাড়াল

ও পত্রসম্বলিত হইয়া উঠে এবং তদবধি প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করিতেছিল। আবার, যে সকল গাছের গোড়ায় কলা-গাছ কুচাইয়া বা টুকরা-টুকরা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগের শ্রী ততোধিক মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত দক্ষিণাংশের ভূমিখণ্ড উষরময়, কিন্তু, অতঃপর, সে ভূমিখণ্ডে উষরের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

উষর ভূমি খালি ফেলিয়া রাখিলে, তাহাতে আরও লবণ দেখা দেয় এবং তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। ঈদৃশ ভূমিতে ক্রমাগত চাষ দিয়া যে কোন ফসল বুনিয়া ভূমিকে সর্ব্বদা আবৃত রাখা আবশ্যক। যদি কোনও ফসল না জন্মে, অন্ততঃ দূর্ব্বা ঘাস বাবুল, ডিবিডিবি প্রভৃতির ঘন আবাদ করিয়া দেওয়া উচিত। অনেকে বলিতে পারেন যে, যাহাতে কোন ফসল জন্মে না, তাহাতে এ সকল গাছ জন্মিবে কেন? তাহার উত্তর এই যে, উল্লিখিত উদ্ভিদগণ উষর ভূমির জন্য বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত। তবে, উহাদিগকে রোপণ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে উত্তমরূপে বারম্বার লাঙ্গল দিতে ও সমধিক পরিমাণে সার প্রদান করিতে হইবে। মানুষের মলমূত্র দিতে পারিলে ভালই হয়, তদভাবে গোময় বা অন্য প্রাণীজ সার, খৈল, উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট ইত্যাদি দ্বারাও সমধিক উপকার পাওয়া যায়। দূর্ব্বাদল ঘনভাবে জন্মিলে গবাদি পশুগণ যাহাতে সেই সমুদয় ঘাস না খাইয়া ফেলে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিছুদিন উহা দ্বারা ক্ষেত্র আবৃত হইয়া থাকিলে, উহারই সারে ক্ষেত্রের লবণ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে।

উষর-ভূমিতে আবাদ করিবার আর একটী উপায় আছে। জমী সমতল করতঃ চারিদিকে আল বাঁধিয়া দিলে ক্ষেতের সমুদয়

জল বহির্গত হইতে না পাইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, ফলতঃ তাহাতে উষর বা লবণ সহজে উপর দিকে আসিতে পায় না। অধিক রৌদ্র লাগিলেই উষর বা লবণ উপরে আইসে, সুতরাং ক্ষেত সর্ব্বদা ফসল দ্বারা আবৃত থাকা আবশ্যক। বর্ষাকালের ফসলের উপর উষর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না কারণ বৃষ্টির জলে জমী সর্ব্বদা সিক্ত থাকে, উপরন্তু ক্ষেতে ফসল থাকিলে ভূগর্ভে রৌদ্রের উত্তাপ অধিক প্রবিষ্ট হইতে পারে না কিন্তু, উহাতে রবি শস্যের আবাদ করিতে হইলে ক্ষেত্রে বিস্তর জল যোগাইতে হয়, এই কারণে সাময়িক ফসল না দিয়া স্থায়ী অড়হর বা ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের আবাদ করিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ হইতে পারা যায়। বৃক্ষগণ ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া গেলে জমী ছায়াযুক্ত হয় তন্নিবন্ধন মৃত্তিকায় রসাভাব হয় না এবং সূর্য্যোত্তাপ প্রবেশ করিতে না পারায় উষর আর উপরে আসিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত সেই সমুদয় গাছের শাখাপত্রাদি ক্ষেত্রমধ্যে নিপতিত হইয়া ক্রমে সারে পরিণত হইয়া থাকে।

জমি পোড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্য।—আবাদ করিবার পূর্ব্বে জমি পোড়াইয়া দিবার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। নূতন জমী অথবা আবাদী জমীর ফসল সংগৃহিত হইলে কৃষকেরা জমী পোড়াইয়া দেয়। অনন্তর, যথাবিধি চাষ দিয়া ক্ষেত্রকে আবাদের উপযোগী করিয়া লয়। কিন্তু. কি উদ্দেশ্যে উক্ত প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে এবং কি প্রকারেই বা তাহা সম্পন্ন করা উচিত, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইবে।

অনেক দিবস হইতে আবাদ হওয়ায় যে ক্ষেত্র পরিক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিম্বা যে জমিতে অতিরিক্ত উলু ঘাস বা অপর বিরক্তিকর আগাছা জন্মে, অথবা যে জমীর প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করা

আবশ্যক, এইরূপ জমিকেই সচরাচর পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ, কৃষকগণ যে প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া আমাদিগের ধারণা, কারণ আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি যে, ক্ষেত্রের অবস্থা ও পরিগঠন (texture) নির্ব্বিশেষে জমি পোড়াইয়া দিলে কোথাও সুফল, কোথাও কুফল প্রসবিত হইয়া থাকে।

আবাদী ফসল সংগৃহীত হইবার পর ক্ষেত্রে ফসলের যে অবশিষ্ট অংশ থাকিয়া যায় এবং যে সকল আগাছা জন্মিয়া থাকে, সচরাচর কৃষকগণ তাহাতেই অগ্নি লাগাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। ইহার ফলে কোন স্থান পোড়ে, কোন স্থান পুড়িতে পায় না। এইরূপ অবস্থাতেই কৃষক স্বীয় ক্ষেত্রে হলচালনাদি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু মাঠে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে. এইরূপে যাহারা ক্ষেত্রে আগুণ লাগাইয়া দেয় তাহাদের উদ্দেশ্য সমধিক পরিমাণে বা সম্যকরূপে সংসাধিত হয় না। যে জমীতে যবক্ষারজানের অভাব থাকে তাহাতে উহা পুনরায় আনয়ন করিবার জন্য জমী জ্বালাইয়া দিতে হয়। জমীতে কি পরিমাণ যবক্ষারজান আছে তাহা বুঝিবার জন্য অপর কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হয় না। যে ক্ষেত্রের গাছ সবল, সুপুষ্ট, ঘন ও স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে তাহাতে যবক্ষারজানের অভাব নাই জানিতে হইবে এবং তাদৃশ জমীকে পোড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই জানিয়া উহা হইতে নিরস্ত হওয়া উচিত, নতুবা তাহা উপেক্ষা করিয়া যদি সেই জমীকে পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, ক্ষেত্রস্থ যবক্ষারজান হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অনেকে বলেন যে জমী পুড়াইয়া দিলে এক দিকে যেমন ক্ষেত্রস্থ যবক্ষারজান নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে অঙ্গার-জানের প্রাদুর্ভাবহেতু উক্ত পদার্থ অর্থাৎ যবক্ষারজান বায়ুমণ্ডল ও বৃষ্টি হইতে আসিয়া পুনরায় সঞ্চিত হয়। একথা আমরা জানি যে, অঙ্গার

জ্ঞান সংযোগে বায়ু ও বৃষ্টি হইতে সোরাজান বা যবক্ষারজান ক্ষেত্রে সঞ্চিত হয় কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই যে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সোরাজান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে পুনরায় উহা সংযোজিত হইলে কেবল উদ্ভিদের অবয়ব পরিপুষ্ট হইবে, কিন্তু যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য (যেমন ধান্য ও গোধূম গাছের ফসল ধান্য ও গোধূম) তাহা সাধিত না হইয়া ক্ষতি হইবার অধিক সম্ভাবনা। কৃষকেরা যে প্রণালীতে ক্ষেত জ্বালাইয়া দিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা জমীতে সাক্ষাদ্ভাবে অগ্নির কোন কার্য্য হয় না, সুতরাং জঙ্গলাদি পুড়িয়া যে 'রাখ্' বা ক্ষার উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা যবক্ষারজানই সংগৃহীত হয়। আবার, যাহারা জমীতে দুই একবার লাঙ্গল দিয়া তদুপরে জঙ্গলাদি পুরু করিয়া বিস্তৃত করতঃ জ্বালাইয়া দেয় তাহারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রের জৈব-পদার্থকে (organic matters) জ্বালাইয়া দেয়। জৈব পদার্থ ভস্মে পরিণত হইলে ক্ষেত্রস্থ কার্ব্বণের (carbon) অংশ কমিয়া যায়। মৃত্তিকা মধ্যে কার্ব্বণের অংশ না থাকিলে উহাতে আমোনিয়া নামক পদার্থ থাকিতে পারে না। জল-জান (Hydrogen) ও সোরাজান (Nitrogen) সংযোগে আমোনিয়ার (Ammonia) উৎপত্তি। উক্ত আমোনিয়া নামক বাষ্পীয় পদার্থ সংগৃহীত হইয়া কার্ব্বণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আবর্জ্জনাদি জ্বলিয়া একবারে ছাই হইয়া গেলে, উহার মধ্যে কেবল অজৈব বা ধাবতীয় পদার্থের এবং লবণাদির আধিক্য হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে যে জৈব পদার্থ ছিল, তাহারও অভাব হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ কিছুই উপকার হয় না। মৃত্তিকামধ্যে উদ্ভিজ্জপদার্থ না থাকিলে, উহার রস-ধারক শক্তির অভাবে মৃত্তিকা কঠিন হয় ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে। আমরা

যে প্রণালীতে জমী পোড়াইয়া দিয়া থাকি, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি ঃ—

ক্ষেতের ফসল সংগৃহীত হইলে জমীতে একবার দীর্ঘে ও প্রস্থে হলচালনা করিয়া নানাবিধ আবর্জ্জনা সংগ্রহ করতঃ সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে একত্র করতঃ সর্ব্বত্র পাতলা ভাবে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়। যে সময় বাতাসের কিছুমাত্র বেগ থাকে না, এরূপ সময়ে অগ্নি প্রদত্ত হইলে সমুদায় আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে দগ্ধ হইতে থাকে। বেগে বাতাস বহিতে থাকিলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে সুতরাং তাহাতে আবর্জ্জনা রাশি অতি শীঘ্র জ্বলিয়া যায় এবং ভস্মে পরিণত হয়। ভস্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে জমীতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব হইয়া থাকে। এই কারণে সংগৃহীত আবর্জ্জনা যাহাতে প্রজ্জ্বলিত হইতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যদি জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার উপর লগুড়াঘাত করিয়া অথবা জল ছিটাইয়া কিম্বা অল্প পরিমাণে মাটী বা ছাই ছড়াইয়া অগ্নির প্রকোপ হ্রাস করিয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে আবর্জ্জনারাশি ধীরে ধুমাকারে পুড়িতে থাকিবে। ক্ষেত্রময় অতি পাতলা করিয়া আবর্জ্জনা বিস্তৃত করিয়া দিলে, ভূগর্ভের অধিক নিম্নে এবং অধিকক্ষণ উত্তাপ লাগিতে পায় না। যে অল্প পরিমাণ উত্তাপ লাগে, তাহাতেই মাটীর দোষ ক্ষালিত হয়, তন্মধ্যস্থিত পোকা-মাকড়ও মরিয়া যায়, কিন্তু আবর্জ্জনা পুরু করিয়া দিলে এবং অগ্নি অধিকক্ষণ প্রজ্জলিত হইতে থাকিলে, মৃত্তিকার জৈব পদার্থ (organic matters) পুড়িয়া যায়, বাষ্পীয় পদার্থ (volatile matters) উড়িয়া যায় এবং মৃত্তিকা লাল বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। ঈদৃশ জমি অতিরিক্ত পুড়িয়াছে ও উদ্ভিদ্-খাদ্যবিবর্জ্জিত হইয়াছে জানিতে হইবে।. এই কারণে ক্ষেত্রের পৃষ্ঠদেশে পাতলাভাবে আবর্জ্জনা

প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে, উপরন্তু যাহাতে উহা ধীরে ধীরে ও বিনা প্রজ্বলনে দগ্ধ হইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে ক্ষেত্র এইরূপে উত্তাপিত হইতে পায়, তাহার মৃত্তিকা লাল বা পাটকিলে বর্ণ প্রাপ্ত হয় না এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থসমূহ একবারে ভস্মে পরিণত হয় না। উল্লিখিত প্রণালীতে জমীর সংস্কার হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বালুকা-ভূমি স্বভাবতঃই অনাট বা আল্‌গা, ফলতঃ নীরস। এরূপ জমীতে অগ্নি সংযোজিত হইলে মৃত্তিকার জৈবাংশ পুড়িয়া গিয়া আরও নীরস ও সারহীন হইয়া পড়ে। মোট কথা, ইহাতে মাটীর 'জান' চলিয়া যায়। বোদ ও হাল্কা মাটিকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য উল্লিখিত উপায়ে সাবধানে পোড়াইতে পারিলে কিয়ৎ পরিমাণে দাহ্যাংশ জ্বলিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত ঘনতা প্রাপ্ত হয়। চিক্কণ বা সূক্ষ্ম মাটীকে হাল্কা করিবার জন্য ক্ষেত্রোপরি আবর্জ্জনা প্রসারিত করিয়া দুই তিনবার অগ্নি প্রদান করা উচিত। অনেক দিবসের পতিত ও জঙ্গলময় জমী লইয়া যাঁহারা কৃষিকার্য্যের সূচনা করেন, তাঁহারা তাহাকে সচরাচর এত অধিক দগ্ধ করিয়া থাকেন যে, তাহার গর্ভস্থিত অধিকাংশ উদ্ভিদখাদ্য জ্বলিয়া যায়। পতিত জমীতে স্বরোপিত নানাবিধ আগাছা জন্মিয়া থাকে এবং তাহাদিগের শাখাপত্রাদি ক্রমান্বয়ে ভূপতিত হয়, তন্নিবন্ধন মাটি সারবান হইয়া উঠে। অতঃপর হলচালনাদি করিলে স্বতঃই সে মাটী উর্ব্বরা হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা ভাল নহে। জঙ্গলাদি বিনষ্ট করিতে হইলে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া ক্ষেতের কোন নিভৃত অংশে জ্বালাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না।

যে সকল ভুঁই অতিশয় নিকৃষ্ট বা অনুর্ব্বরা অথবা অনেক দিবস

হইতে ফসল প্রদান করায় হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে পোড়াইয়া দিলে উপকার হয়। আবর্জ্জনাসমূহ অসম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি পায়, তন্নিবন্ধন উহা বাতাস ও বৃষ্টি হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিতে পারে, কিন্তু উহা ভস্মাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মৃত্তিকার উপর কেবল বায়ু দ্বারা কোন উপকার হয় না এবং যে বারিপাত হয়, তাহাও অতি শীঘ্র বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া জমীর পূর্ব্বাবস্থা আনয়ন করে। অতঃপর—

কেহ মনে না করেন যে, ক্ষার বা ভস্ম দ্বারা জমীর কোন উপকার নাই। ক্ষার সকল জমীতেই অল্পাধিক পরিমাণে আছেই, কিন্তু ভূমিকে নির্ম্মম ভাবে পোড়াইয়া দিলে, কেবল ক্ষার, ফসফরিক অম্ল, চূণ ও সামান্য পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ থাকিয়া যায় এবং জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ সমূহ বিমুক্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলে গিয়া আশ্রয় লয়। ক্ষার, চূণ প্রভৃতি অদাহ্য পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদ-শরীরের কাষ্ঠ (wood) ও ফলের পুষ্টিসাধন করে, কিন্তু যবক্ষারজান ও আমোনিয়া দ্বারা উদ্ভিদের বাহ্যাবয়ব অর্থাৎ পত্র, শাখা, ছাল প্রভৃতি পুষ্টিলাভ করে। সুতরাং উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন হইলে, স্থানান্তর হইতে ভস্ম আনিয়া দিলে সে উদ্দেশ্য সমাহিত হইতে পারে।

আর একটী কথা বলিলেই আমাদের এ প্রস্তাব শেষ হয়। ক্ষেত্র মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়া দিলে তন্মধ্যস্থিত কীটাদি নষ্ট হইয়া যায়, ক্ষেত্রের দূষিত বায়ু সংশোধিত হয় এবং যে স্থানে দুর্গন্ধ থাকে সেখানকার দুর্গন্ধ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, ক্ষেত্রের অবস্থা, মৃত্তিকার উপাদান, জ্বালাইবার উদ্দেশ্য—এই কয়টীর সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

জল, বায়ু ও সারের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ।—প্রাণী-জীবনের জন্য প্রথমে বায়ু, তৎপরে জল এবং সর্ব্বশেষে পুষ্টিকর আহারীয় সামগ্রীর যেমন প্রয়োজন, উদ্ভিজ্জীবনের জন্যও ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন। বায়ু ব্যতিরেকে মনুষ্য এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারে না। অতঃপর বাঁচিয়া থাকিলে জীবনধারণের জন্য জলের আবশ্যক। জলপান করিয়া মানুষ ১০।১৫ দিবসের অধিক বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র জলপান করিয়া শীর্ণ শরীরে বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা; সুতরাং সুস্থ ও সচ্ছন্দে থাকিতে হইলে পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। উদ্ভিদগণও বিনা সারে—মাত্র জল ও বাতাসের উপর নির্ভর করিয়া কয়েক দিন জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু সার ব্যতীত পুষ্টিসাধন হয় না।

বায়ু হইতে উদ্ভিদ অম্লজান (oxygen) আহরণ করিয়া জীবনধারণ করে; উহার অভাবে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। জীবন থাকিলেই তাহার আহারের প্রয়োজন এবং সেই আহার্য্য—জল। বিশুদ্ধ বা বন্ধ্যা (sterilised) জল পান করিয়া উদ্ভিদ কিয়দ্দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ফল-ফুল ধারণ করিতে পারে না। এই জন্য ক্ষেত্রে সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেত্রে যতই উৎকৃষ্ট সার দেওয়া যায়, ততই জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সার প্রয়োগে যে কেবল ফসলের উপকার হইয়া থাকে, কিম্বা জমীর

সাময়িক উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে ইহা দ্বারা ক্ষেত্রের পূর্ব্বসঞ্চিত সার নষ্ট না হইয়া ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে। বিনা সারে যে সকল জমীর আবাদ হইয়া থাকে, তাহা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ফসলও ভালরূপে জন্মিতে পারে না। এজন্য বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, সার ব্যতীত কোন ফসল সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত সারের প্রয়োজনীয়তা মনে রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে, আবাদ করিয়া লাভবান হওয়া সম্ভবপর নহে।

সার প্রয়োগের গুপ্ত উদ্দেশ্য।—সারের সহিত ক্ষেত্রজাত-ফসল-ভোজী জীবদিগের সম্বন্ধ অতি নিকট। উর্ব্বরা ভূমিজাত ফসল পরিপুষ্ট ও সুস্বাদু হয়—ইহা আমরা জানি, আর এই জন্যই দৈন্য মৃত্তিকায় সার দিয়া উর্ব্বরা করিয়া লই। এতদ্ব্যতীত উর্ব্বরতা হেতু আরও একটি বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ক্ষেত্রজাত ফসল যেরূপ পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ ইহা ভোক্তাদিগের পক্ষে পুষ্টিকর হইয়া থাকে। পুষ্টিকর ফসল ভোজনে মৃত্তিকান্তর্গত শরীরের বলকারী অনেক পদার্থ আমরা প্রতিনিয়ত উদরস্থ করিয়া থাকি। ধান্য দ্বিদল, ফল-ফুল, লতা-পাতা যাহাই ক্ষেতে উৎপন্ন হয় তৎসমুদায়ই মৃত্তিকার রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে, সুতরাং মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট সার প্রদত্ত হইলে দাল, অন্ন, দুগ্ধ, চিনি প্রভৃতির ভিতর দিয়া কত পুষ্টিকর পদার্থ শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা শরীর মধ্যে ফস্‌ফরস্‌ সংযুক্ত করিবার জন্য কি বিলাতী দেশলাই ভক্ষণ করি? না, লৌহ আহরণের জন্য লোকের জানালার গরাদে চর্ব্বণ করি? ও সকল আমরা কিছুই করি না—ইহা নিশ্চিত, তথাপি শরীরের মধ্যে ঐ সকল পদার্থ কোথা

হইতে আসিয়া স্থান পায়? শরীর গঠণকারী তাবৎ পদার্থই পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্যের ভিতর দিয়া সকল জীবকেই গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে উত্তম সার দিবার ইহাও একটী বিশেষ ও প্রধান কারণ।

উদ্ভিজ্জ-সার।—সচরাচর সারকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, যথা—উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ। প্রত্যেক সারই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, ক্ষেত্রস্বামীগণ আবাদ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র-মধ্যস্থিত যাবতীয় জঙ্গলাদি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু অভিজ্ঞ কৃষকগণ সে প্রথার অনুমোদন না করিয়া বরং নিন্দাই করেন। অনিপ্সিত গুল্মলতাদি আপাততঃ বিরক্তিকর বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জলজ ও স্থলজ যত প্রকার বৃক্ষ, লতা, পাতা ও গুল্ম পচিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই উদ্ভিজ্জসার কহে। উদ্ভিজ্জসার এ দেশ মধ্যে তাদৃশ যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, লতা পাতা ঘাস পালা প্রভৃতি লোকে সংগ্রহ করিয়া জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহার করে, কিন্তু ইহাতে ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। যদি ক্ষেত্রের পাতা লতা ও জঙ্গলাদি সংগ্রহ করা না যায় এবং ক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া পচিয়া যাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকার সামগ্রী মৃত্তিকায় পুনরাবর্ত্তন করে। উদ্ভিজ্জ-সারের ব্যবহার যে এত অল্প, তাহার কারণ এই যে, উহা অতিশয় স্নিগ্ধ এবং উহার শিরাদি বিগলিত হইয়া মৃত্তিকাস্থিত জলভাগের সহিত সম্মিলিত হইতে কথঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, যে কোন সার হউক, উহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জলের সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া যায় ততক্ষণ উহা উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয় না।

উদ্ভিজ্জসারসম্বলিত জমীর মৃত্তিকা কোমল হয়, ভূগর্ভ মধ্যে

রৌদ্রের উত্তাপ ও বায়ু অধিক দূর প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। তাহা ব্যতীত, বৃষ্টির সময় তন্মধ্যে যথেষ্ট জল অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, তন্নিবন্ধন নিম্নদেশের মৃত্তিকাস্তরও সুন্দর ঝুরা ও সরস থাকে। এই সকল কারণে তজ্জাত উদ্ভিদগণ ভূগর্ভমধ্যে অনায়াসে মূল প্রসারিত করিতে পারে এবং রসের প্রাচুর্য্যহেতু বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে।

হরিৎ-সার।—উদ্ভিজ্জ-সারের মধ্যে হরিৎ-সার (green manure) অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়। শন, নীল, অড়হর, ছোলা, ধঞ্চে, পুষ্করণীর পানা, শেওলা প্রভৃতি কোমল জাতীয় উদ্ভিদ সদ্য আনিয়া ক্ষেত্রে বর্ষার পূর্ব্বে বিস্তৃত করিয়া দিলে, প্রচণ্ড রৌদ্রে, এবং বর্ষাকালের ঘন ঘন বৃষ্টিতে শীঘ্রই দ্রবীভূত হইয়া যায় ফলতঃ তাহাতে জমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে। যে কোন গাছপালাকে হরিৎ-সারের উপাদান মনে করা যাইতে পারে কিন্তু উদ্ভিদের মধ্যে তারতম্য আছে। অনেক উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন নামক বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিয়া থাকে এবং আহরিত যবক্ষারজান উদ্ভিদের অঙ্গময় পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্রমে তাহার অঙ্গীভূত অংশ—পত্রাদি বৃক্ষচ্যুত হইলে ভূমিতে স্থান পায়। একেত উদ্ভিদগণ পত্রাদি বর্জ্জন করিয়া ভূমিকে পাতাসার প্রদান করে এবং সেই সঙ্গে নাইট্রোজেন ও স্বতঃই মাটিতে স্থান পায়। এইজন্য ভূমিতে হরিৎ-সার সংযোজিত করিবার জন্য যবক্ষারজানিক উদ্ভিদই বিশেষ স্পৃহনীয়। পুষ্করিণীর পানা বা শেওলা প্রসারিত করিবার পর তাহা বিগলিত হইলে হরিৎ-সারের কাজ করে। অতঃপর যথারীতি হলচালনাদি দ্বারা জমীর পাট করিতে হয়। হরিৎ-সার দ্বারা যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাগপুর গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষাক্ষেত্রে গোধূম ফসলে হরিৎ-সারের যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

খৃষ্টাব্দ	যে সার দেওয়া হয়	উৎপন্নের পরিমাণ (পাউণ্ড ওজন)		বাঙ্গালা ওজন (মণ হিসাবে)	
	নাম	শস্য	খড়	শস্য	খড়
১৮৯০—৯১	তারোটা গাছ	৬৬৫	১২৩৯	৮॥২॥	১৫।৯।
”	(cassia auriculata,	·৪৪৩	৭৭২	৫॥১॥	৯/১
”	বিনা সারে	৭৪৩	১১৮৫	৯/৭	১৪৸২॥
”	শণগাছ (crotolaria juncea)	৬১২	৯৬২	৭॥৬	২/১
”	বিনা সারে	৫৭০	৯১৭	৭/৫	১১/৩॥
১৮৯১—৯২	তারোটা বিনা সারে	৪৮৩	৭৬৭	৬/১॥	৯॥৩॥
”	শণগাছ	৯১১	১৭০৫	১১॥৫॥	২১।২॥
১৮৯২—৯৩	হাকুট	৭৭৩	১১০৩	৯॥৬॥	১৩৸২॥
১৮৯৩—৯৪	Psorolia corylifolia				
”	বিনা সারে	৬১২	৮৮০	৭৸৬	১/০

উপরে যে পরীক্ষার ফল লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হরিৎ-সার প্রদান করিয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশেও অনেক দিবস হইতে চাষ-আবাদ করায় যে জমী নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহাতে লোকে অড়হরের আবাদ করে। অড়হর, বুট, নীল, শন প্রভৃতি সিম্বীকবর্গীয় উদ্ভিদ দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধিত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্ভিদগণ লিগুমিনোসা (Leguminosæ) বর্গভুক্ত এবং এই শ্রেণীর উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে বহুল পরিমাণে যবক্ষারজান সঞ্চয় করিয়া থাকে, সুতরাং সেই সমুদায় গাছ ক্ষেত্রে

সাররূপে ব্যবহার করিলে মৃত্তিকায় যবক্ষারজানের অংশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ক্ষেত্র নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অথবা ক্ষেত্রে যবক্ষারজান আনয়ন করিতে হইলে, সেই সকল ফসল আবাদ করিয়া—ফল পাকিবার পূর্ব্বে—সেই সমুদায় গাছ কাটিয়া ক্ষেত্র মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। অতঃপর কিছুদিন পরে উহাতে লাঙ্গল দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। স্থূল কাণ্ড ও শিকড়াদি মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইতে বিলম্ব হয়।

নীল, অড়হর, শন প্রভৃতি ফসলকে সারে পরিণত করিতে হইলে যে সহজ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে। পৌষ-মাঘ মাসে জমি একবার মোটামূটি চষিয়া ঘনরূপে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহার জন্য বিঘা প্রতি অল্লাধিক ৪।৫ সের বীজ লাগে। বর্ষার প্রারম্ভে ফসল সমেত ক্ষেত্রকে চষিয়া এবং মই বা চৌকা দ্বারা মাটি সমতল করিয়া দিতে হয়। এতদবস্থায় এক মাস কাল পড়িয়া থাকিলে তাবৎ গাছই প্রায় পচিয়া যায়। তখন সেই ক্ষেত্রকে অন্য ফসলের জন্য তৈয়ার করিতে পারা যায়।

মাঠ-ময়দানে এরূপ অনেক জমি দেখা যায় যথায় সহজে বা আদৌ কোনরূপে আবাদ করা চলে না। তাহার কারণ এই যে, তাহাতে প্রয়োজনমত উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিলক্ষণ অভাব। ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, রৈসবাগ মধ্যে এক টুকরা বেলে জমি ছিল, তথায় তৃণটী পর্য্যন্ত জন্মিতে পারিত না। পরে সেই জমিতে খুব ঘন ঘন করিয়া কতকগুলি কদলীর তেউড় রোপণ করা হয়। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে উক্ত ভূমিখণ্ড হইতে সেই সকল গাছকে একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে হলচালনাদি দ্বারা আবাদোপযোগী করতঃ ফসল বপন

করিলে আশাতিরিক্ত ও উত্তম ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। এত অল্পকাল মধ্যে সেই তৃণশূন্য ভূমি যে এরূপ ফসল প্রদান করিল তাহার কারণ এই যে, ক্ষেত্রময় কদলী রোপণ করায় কলার এঁটে, বাইল ও পত্রাদি গলিত হওয়ায় মৃত্তিকায় যথেষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। এইরূপে পাহাড়ে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। কোন পাহাড়ের কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার অব্যবহিতকাল মধ্যে তাহাতে কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, কারণ উদ্ভিদপোষণোপযোগী মৃত্তিকা বা কোন সার পদার্থই তখন তাহাতে থাকে না। শৈলাঙ্গ এইরূপে ভাঙ্গিয়া গেলে প্রথমতঃ তাহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল ও গুল্ম জন্মে এবং কিছুদিন পরে তাহারা মরিয়া যায়। অনন্তর সেই সকল মৃত গুল্মাদি পচিয়া মৃত্তিকা ও সারে পরিণত হয়। এক্ষণে সে স্থানে অপেক্ষাকৃত বড গাছ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে পর্ব্বতগাত্র যত পুরাতন হইতে থাকে বৃক্ষলতাদি ততই বারম্বার জন্মিয়া ও মরিয়া এবং গলিত হইয়া বৃহত্তর বৃক্ষাদির উপযোগী হইয়া উঠে। উক্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অনুকরণে হরিৎ-সারের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পাতা-সার।—বৃক্ষলতাদির বর্জ্জিত পত্র, ফুল ফল ও কোমল শাখা-প্রশাখাদি বিগলিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পাতা-সার কহে। সচরাচর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রায় সকল উদ্ভিদই পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সেই সকল পত্র সংগ্রহ করতঃ ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে একটী গর্ত্ত মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে কিছুদিন পরে তাহা বিগলিত হইয়া যায়। পাতার পরিমাণানুসারে গর্ত্তের আয়তন ছোট বা বড় করিতে হয়। অনেকে সংগৃহীত আবর্জ্জনারাশিকে গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা এ প্রথার অনুমোদন করি না। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে গর্ত্তের আবর্জ্জনা

পচিতে অধিক বিলম্ব ঘটে, কিন্তু অনাবৃত থাকিলে, বৃষ্টি, বাতাস, শিশির প্রভৃতির সংযোগে তৎসমুদায় শীঘ্রই বিগলিত হইয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আবর্জ্জনা দ্বারা গর্ত্ত বোঝাই করিয়া রাখিলে এবং বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে উহা ব্যবহারোপযোগী হইবার সম্ভাবনা। উক্ত আবর্জ্জনারাশিকে মধ্যে মধ্যে উল্টাইয়া দিতে পারিলে তাবৎ আবর্জ্জনাই সমভাবে ও শীঘ্র পচিয়া যায়। একভাবে থাকিতে দিলে উপরিভাগের অংশ পচিয়া যায়, কিন্তু নিম্নতর স্তরের আবর্জ্জনা প্রায় টাট্‌কা থাকে, সুতরাং শেষোক্ত অংশ সদ্য ব্যবহারের উপযোগী হয় না।

সকল প্রকার উদ্ভিদই পচিয়া পাতা-সার হইতে পারে, কিন্তু কোমলপ্রকৃতি বা অল্পজীবী উদ্ভিদ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী বৃক্ষাদির পাতায় ভাল সার হইয়া থাকে। কপি, শালগম, লাউ, কুমড়া বা ছোট ছোট গুল্মাদি অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে বলিয়া তাহাতে স্থুল বা অজৈব পদার্থের ভাগ অতি অল্পই থাকে, কিন্তু স্থায়ী বৃক্ষাদির পাতায় স্থুলাংশ অধিক থাকে, ফলতঃ তাহা হইতেই উত্তম পাতা-সার উৎপন্ন হয়।

পাতা-সারে স্বভাবতঃ অম্লের অংশ অধিক থাকে, এজন্য সেই অম্লক্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিবার জন্য আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে মধ্যে এক স্তর চূণ অতি পাত্‌লা ভাবে বিস্তৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। লিচু, তিন্তিড়ী প্রভৃতি যে সব গাছের ফলে অম্লাস্বাদ থাকে, তজ্জাত পাতা-সার অল্পাধিক অম্লাক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাদিগের স্তূপে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চূণ দেওয়া আবশ্যক। অম্লাক্ত জমী (sour land) কিম্বা যে জমীতে সমধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বর্ত্তমান তাহাতে আদৌ পাতা-সার দেওয়া উচিত নহে। অনন্তর বেলে-মাটিতেও উহা সংযোজ্য নহে, কারণ ঈদৃশ

মাটিতে পাতা-সার সংযুক্ত হইলে মাটিকে ফাঁপা ও হাল্কা করিয়া দেয়, তন্নিবন্ধন উক্ত মৃত্তিকার ধারকতা হ্রাস পায়। তবে, যে পাতা-সার অধিক দিনের পুরাতন এবং পচিয়া গিয়া একবারে মৃত্তিকাবৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা সংযোগ কারলে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকারই হইয়া থাকে।

এঁটেল মাটি (Argillacious soil) ও চূণ-প্রধান বা কষায় জমীতে (Calcarious soil) পাতা-সার দিলে, প্রথমোক্ত মৃত্তিকার ঘনতা বিলুপ্ত হইয়া লঘু হয়, এবং শেষোক্ত মাটিতে দিলে চূণের শক্তি ও তীব্রতা হ্রাস হইয়া মৃত্তিকা মধুর হয়। আরও, দেখা যায় এঁটেল মাটির শোষণশক্তির (Absorption) মন্থরতা হেতু উহা শীঘ্র রস পরিশোষণ করিতে পারে না এবং ঘনতাবশতঃ কিম্বা ছিদ্রপথের (Capillary tubes) সূক্ষ্মতা হেতু অধিক রস ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও উদ্ভিদের সূক্ষ্ম মূলগণ সহজে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু, পাতা-সার বা হরিৎ-সার সংযোজিত হইলে এটেল মাটি দো-রসা হয়, সহজে ফাটে না, শীঘ্র রস পরিশোষণ করিতে সক্ষম হয়, সমগ্র মাটি স্থিতিস্থাপক হয়।

অনেক স্থানে 'দ'-পড়া খাল, বিল ও বাদা দেখিতে পাওয়া যায়। বহু দিন হইতে উক্ত জলাশয়ে হিংচা, কল্মী, শুস্নী প্রভৃতি নানাবিধ জলজ শাক, শর, কচুরী প্রভৃতি অপরাপর গাছ জন্মিয়া, জলাশয়ের গর্ভ ক্রমে ভরাট করিয়া আনে। এই সকল দ-পড়া জলাশয়ের মধ্যে যে-যে স্থানে মৃত্তিকাস্তূপ উৎপন্ন হয়, তাহা উল্লিখিত উদ্ভিদ সমূহের বিগলিত অংশমাত্র—ইহা অতি উত্তম সার। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এই সকল জলাশয়ের জল শুকাইয়া বা নামিয়া গেলে সেই স্তূপ কাটিয়া আনিয়া ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে মাটি অতিশয় সারবান হইয়া উঠে। বালুকা-প্রধান ক্ষেত্রের পক্ষে ইহার ন্যায় মূল্যবান সার আর

দেখা যায় না। উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে ইহাকে গণ্য করিলে অন্যায় হয় না বলিয়া এ স্থলে তাহা উল্লিখিত হইল।

মসিনা, তিল, সর্ষপ, নারিকেল, মাঠ-কলাই, কাপাস প্রভৃতি নানা প্রকারের খৈল আছে। তন্মধ্যে সর্ষপ, মসিনা, রেড়ী, মহুয়া ও মাঠ-কলায়ের খৈল বিশেষ প্রচলিত ও ফলপ্রদ। জলের সহিত ইহা সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং ইহাতে সোরাজান বা নাইট্রোজেনের পরিমাণ অধিক থাকায় এই সকল খৈল দ্বারা ফসলের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইক্ষু, আলু, পাট, ধান্য প্রভৃতি ফসলে রেড়ীর খৈল সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

খৈল সাররূপে ব্যবহৃত হইলে জমীর ত সবিশেষ উপকার হইয়াই থাকে, অধিকন্তু যে সকল পশু ভক্ষণীয় খৈল ভক্ষণ করে, তাহাদিগের চোনা ও পুরীষ,—সার হিসাবে বিশেষ ফলদায়ক হয়। খৈলভক্ষিত গবাদি পশুর চোনা ও গোবর 'দল-চোরা' পশুর সার অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের ও সারবান। *

কৃষিক্ষেত্রর সাররূপে যতপ্রকার খৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে তৎসমুদাই তৈল শস্যজাত। যতই উত্তমরূপে সেই সকল শস্য চূর্ণীকৃত হউক, তজ্জাত পিষ্টকে অল্লাধিক তৈল থাকেই। ঈদৃশ খৈল গৃহপালিত পশুদিগের পক্ষে পুষ্টিকর কিন্তু ভূমির, তথা উদ্ভিদের পক্ষে বিষবৎ। এইজন্য যে খৈলে যত কম তৈল থাকে তাহা উদ্ভিদের পক্ষেও তত প্রীতিপ্রদ এবং যে খৈল একবারেই তৈলবিবর্জ্জিত তাহা

* পল্লিগ্রামে অনেক অনেক ঘোড়া, গরু প্রভৃতি ঘাটে-মাঠে চরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের যে কেহ মালিক আছে তাহা বোধ হয় না, কিম্বা থাকিলেও ইহারা পালিত পশুর ন্যায় যত্ন পায় না। তাহারা ঘাস-পালা খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদিগকে 'দল-চোরা' কহে।

নির্দ্দোষ সুতরাং উপকারী। যে সকল খৈল আমরা সাধারণতঃ সারের জন্য বাব্যহারে নিয়োজিত করি তৎসমুদায়ই অল্পাধিক তৈলপূর্ণ। ঈদৃশ খৈল ভূমিতে বারম্বার সংযোজিত হইলে মৃত্তিকা অম্লবহুল হইয়া পড়ে—তন্নিবন্ধন উক্ত পদার্থজাত খাদ্য উদ্ভিদগণের সুখদায়ক না হইয়া পীড়ার কারণ হইয়া থাকে। অনন্তর ইহাও দেখা যায়, তৈলসংক্রান্ত কোন পদার্থ শীঘ্র বিগলিত হয় না। তৈলহীণ খৈল অপরাপর জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থের ন্যায় অতি শীঘ্র গলিয়া যায় ও পচিয়া যায়। এই সকল কারণে তৈলহীন খৈল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

গবাদি গৃহপালিত পশুদিগকে প্রতিদিন খৈল খাওয়াইলে দুইদিকে লাভবান হওয়া যায়। প্রথমতঃ—পশুগণ সবল হয়, দ্বিতীয়তঃ—তাহাদিগের চোনা ও গোবর অধিকতর সারবান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, খৈল খাইতে পাইলে পশুগণ অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে এবং গাভীগণ অধিক পরিমানে ঘন ও সুমিষ্ট দুগ্ধ প্রদান করে। এতাধিক সুবিধা ও লাভ সত্বেও যাঁহারা গো-জাতিকে খৈল দিতে কুণ্ঠিত হয়েন তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী ও দৃষ্টিকৃপণ।

ক্ষেত্রে দিবার পূর্ব্বে খৈল চূর্ণ করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয় নতুবা বড় বড় টুক্‌রা বিগলিত হইতে বিলম্ব হয় এবং ক্ষেত্রময় সমভাবে ছড়াইয়া না পড়িয়া কোথাও বেশী, কোথাও কম পড়ে, ফলতঃ ফসলও ক্ষেত্রময় সমভাবে না জন্মিয়া কোথাও ভাল, কোথাও সাধারণ-ভাবে জন্মিয়া থাকে।*

ভিন্ন ভিন্ন পশ্বাদির মল-মুত্র ও তাহার গুণা-গুণ।—গো, অশ্ব, ভেড়ী, ছাগ প্রভৃতির প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের

---

* এতৎসংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য মৎপ্রণীত 'উদ্ভিদখাদ্য' নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

মল-মূত্রের গুণের তারতম্য হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের আহার, অবলম্বন ও অবস্থানুসারে সারের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

নিরামিষাশী যাবতীয় পশুর মধ্যে গো-জাতির মল-মূত্রে যবক্ষারজান নামক পদার্থের ভাগ অতি অল্পই থাকে এবং তাহাতে জলের ভাগই অধিক। অন্যান্য পশুদিগের সারের ন্যায় ইহাদিগের সার-স্তূপ শীঘ্র ও অধিক উত্তপ্ত হইতে পারে না, এজন্য উহা গলিত হইতেও অধিক সময় লাগে।

গো অপেক্ষা ঘোটকের সার অধিক পরিমানে যবক্ষারজান-জনিত এবং তদপেক্ষা ইহাতে জলের অংশ অনেক কম, এইজন্য অশ্ব-নাদির সংগঠন স্থুল এবং সহজে আল্গা হইয়া যায়। অশ্বনাদির এই সকল সুবিধা থাকায় সহজেই মাটির সহিত সংমিশ্রিত হইতে থাকে এবং শীঘ্রই পচিয়া যায়, ফলতঃ শীঘ্রই উদ্ভিদের আহরণের উপযোগী হইয়া উঠে।

আবার ঘোটক অপেক্ষা ছাগ মেষাদির সার আরও নীরস কিন্তু তাহাতে যবক্ষারজানের পরিমান কম থাকে। ইহাদের নাদি যদিও অপেক্ষাকৃত স্থুল ও নিরেট, তথাপি শীঘ্র পচিয়া উদ্ভিদের আহরণের উপযোগি হয়।

উপরে জাতিবিশেষ সারের কথা সঙ্ক্ষেপে বলা গেল। উহাদিগের মধ্যেই আবার কিরূপে সারের তারতম্য হয় এক্ষণে তাহা বলা যাইতেছে। পশুর বয়ঃক্রম ও শারীরিক অবস্থানুসারে সারের ইতর-বিশেষ হয়। অল্পবয়স্ক পশুদিগের অবয়বের দ্রুত পরিবৃদ্ধির বা পরিপুষ্টির জন্য তাহারা যাহা কিছু পানাহার করে, তৎসমুদায়ের অধিকাংশ সারভাগই শরীর গঠনে ব্যয়িত হইয়া যায়, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক বা স্থবির পশুদিগের অস্থি বা শিরাগণের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য

তত সার পদার্থের আবশ্যক হয় না। একটী বর্দ্ধনশীল ও একটী বয়স্ক পশুকে একত্রে একই খাদ্যে পালন করিলে দেখা যাইবে যে শেষোক্ত পশুর নাদিই অধিকতর সারবান।

অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, গৃহস্থের সযত্নপালিত পশুর নাদি, নিরন্তর কঠিন পরিশ্রমক্লান্ত পশুর সার অপেক্ষা অধিকতর সারবান এবং পরিমাণেও অধিক হইয়া থাকে।

দুগ্ধবতী অপেক্ষা শুষ্ক পশুর নাদি অধিক সারবান হইয়া থাকে কারণ, পশু যখন দুগ্ধবতী থাকে, তখন সে যাহা কিছু ভক্ষণ করে, তদন্তর্গত তাবৎ সারাংশ দুগ্ধ যোগাইতে খরচ হইয়া যায়, সুতরাং সে অবস্থার নাদি তত সারবান হয় না। উক্ত দুগ্ধবতী পশু পুনরায় যখন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ দুগ্ধহীন হইবে, তখন আবার তাহার নাদিও শুষ্ক পশুর ন্যায় সারবান হইবে।

পশুর খাদ্য সামগ্রীর তারতম্যে সারের বিচার হইয়া থাকে। পশুদিগকে যাহা খাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে যত অধিক জল থাকে, উহাদিগের নাদিও সেই পরিমাণে সার পদার্থ বিহীন এবং জলীয় হইয়া থাকে। যদি কোন পশু খুব রসাল এক মণ ঘাস খায় এবং অপর একটী পশু পাঁচ সের শুষ্ক ঘাস বা অন্য শুষ্ক সারবান শস্য ভক্ষণ করে তাহা হইলে প্রথমোক্ত পশু অধিক ভক্ষণ করিল বলিয়া যে তাহার নাদি অধিক ও সারবান হইবে, ইহা কখন সম্ভব নহে। উক্ত এক মণ রসাল ঘাসে হয় ত পাঁচ সেরের অধিক সার পদার্থ নাই, সুতরাং তাহাকে পাঁচ সের সারবান খাদ্য দেওয়া হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

চোনা।—নাদিকে অধিক সারবান করিতে হইলে তাহার সহিত যথোপযুক্ত পরিমাণে চোনা সংমিশ্রিত করা আবশ্যক।

নাদির স্তূপরাশি যে পরিমাণে চোনা শোষণ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহার সারবত্তা ও উপকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। যথেষ্ট পরিমাণে চোনা মিশ্রিত সার অনতিকাল মধ্যে উত্তপ্ত ও বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। চোনা-বিহীন সার কিন্তু সেরূপ হয় না। এইজন্য যাহাতে সমুদয় চোনা একস্থানে সঞ্চিত হইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রাণীজ সার।—মনুষ্য, গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি এবং চোনা গোবর ও মৃত জীবদেহ মাত্রেই প্রাণীজ সারের অন্তর্গত। যদিও উপরোক্ত তাবৎ সারই উদ্ভিজ্জ পদার্থের রূপান্তর মাত্র এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের সহিত সম্বদ্ধ, তথাপি ইহাদিগের গুণ ও কার্য্য উদ্ভিজ্জ-সার হইতে অনেক দ্রুত ও ফলদায়ক। বাঙ্গালা দেশে প্রাণীজ-সারের মধ্যে অশ্ব, গো-মহিষ ও ছাগ-মেষের মল-মূত্র সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালা দেশে মনুষ্য-মলমূত্রের একবারে কোন ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, কিন্তু উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে যথেষ্ট ব্যবহার আছে। উহার ব্যবহার না থাকিবার অনেকগুলি কারণ আছে। হিন্দুর পক্ষে উহা একেবারে অস্পৃশ্য এবং কোন প্রকারে উহা স্পর্শিত হইলে স্নান না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না, সুতরাং হিন্দুর পক্ষে উহা ব্যবহার করা সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত উহার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা হেতু অপর জাতিও উহা ব্যবহার করিতে নারাজ। যদিও উহাদের কোন সংস্কার নাই, তথাপি ইহার যে দুর্গন্ধ, তাহাতে সহজে কেহ ব্যবহার করিতে সম্মত হয় না। কিন্তু ইহা যে একটী বিশেষ সার, একথা অনেকেই বিলক্ষণ অবগত আছে এবং প্রকারান্তরে প্রায় সকলেই তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করে। পল্লীগ্রামে সাধারণ লোকে প্রায়

মাঠ-ময়দানে, বন-জঙ্গলে বা ক্ষেত-পগারে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এই উপায়ে ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের কাজ বিনা চেষ্টায় হইয়া থাকে। এতদ্দারা সার প্রয়োগের তাবৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না. কারণ এইরূপে ত্যক্ত পুরীষ শুস্ক বা গলিত না হওয়া অবধি ক্ষেত্রে হলচালনাদি কার্য্য কেহ করে না। অনেক সময়ে মিউনিসিপ্যালটী কর্ত্তৃক করদাতাদিগের পায়খানা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং সেই পুরীষ নিকটস্থ কোন মাঠ ময়দানে প্রোথিত হয়। কিছুদিন পরে উক্ত পুরীষ-প্রোথিত জমি (Trenching ground) উচ্চ হারে বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। মেথর চাকর রাখিতে পারিলে ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা চলিতে পারে, তথাপি অনেকের আপত্তির কারণ এই যে, ক্ষেত্রে উহা প্রদান করিলে ফসলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কোন ফসলের শেষ অবস্থায় যদি ক্ষেত্রে টাট্‌কা বিষ্ঠা প্রদান করা যায়, তাহ হইলে তাহার দুর্গন্ধে ফসল সংক্রামিত হইতে পারে। ফসলের প্রথম বা মধ্যম অবস্থায় প্রদান করিলে সে দুর্গন্ধ ফসলের উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না, কারণ অধিক দিবস অনাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকিলে সে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর ক্ষেত্রে বিষ্ঠা ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপরে ছাই অথবা অল্প পরিমাণে চুণ চাপা দিলে, সে দুর্গন্ধ আর প্রসারিত হইতে পারে না। ছাই ও চুণ দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্পীয় (ammonia) পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখে, কিন্তু বিষ্ঠা প্রসারিত অবস্থায় রাখিয়া দিলে, তদন্তর্গত বাষ্পীয় সারাংশ উড়িয়া যায়, সুতরাং ছাই বা চূণ চাপা দিয়া উক্ত পদার্থকে ধরিয়া রাখা উচিত। অনেক স্থানে নরবিষ্ঠা গুঁড়ার আকারে প্রস্তুত করিয়া পরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিষ্ঠা চূর্ণ (Poudrette) প্রস্তুত

করিতে হইলে ক্ষেত্রের কোন প্রান্তভাগে বিষ্ঠা বিস্তৃত করিয়া তাহার সহিত ছাই, চূন বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ রাখিয়া দিলে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যাইতে পারে। উষর ভূমিতে অধিক পরিমাণে বিষ্ঠা মিশ্রিত হইলে তাহার অনেক দোষ কাটিয়া যায়।

গোময়।—কৃষিকার্য্যের জন্য গোময় বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী এজন্য তাহা না জ্বালাইয়া যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা উচিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, গোবর কেবল গৃহস্থের জ্বালানীর কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে গৃহস্থের সাশ্রয় হয় বটে, কিন্তু কৃষির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কলিকাতা সহরের যাবতীয় গোবর ও গো-মূত্রাদি প্রায় নষ্ট হয়, এবং পল্লীগ্রামবাসিরা প্রায় পোড়াইয়া ফেলে। পল্লীগ্রামে সকল সময় জ্বালানী কাষ্ঠের সচ্ছলতা থাকে না এবং দরিদ্র লোকেরা অর্থাভাববশতঃ কাষ্ঠ খরিদ না করিয়া বারমাসই গোবর হইতে ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া থাকে। গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দিবার জন্যও অনেক গোবর পোড়ান হয়। এইরূপ নানা কার্য্যে গোবর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আবাদী ক্ষেত্র-সমুহ উহা হইতে বঞ্চিত হয়। যাঁহাদিগের ক্ষেত-খামার আছে, তাঁহাদিগের নিকট গোবর অতি মূল্যবান সামগ্রী। এইজন্য যাহাতে তাঁহাদিগের স্ব স্ব এবং প্রতিবেশীদিগের গৃহপালিত পশুদিগের গোময় পাওয়া যায় এবং যাহাতে তাহা কোন মতে নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রতিবেশীগণ উহা দিতে অসম্মত হইলে মূল্য দিয়া অথবা তাহার বিনিময়ে জ্বালানী কাষ্ঠ দিয়া সার আনয়ন করা উচিত। প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করা যেরূপ প্রয়োজন, তাহাতে সার প্রদান করা ততোধিক কর্ত্তব্য।

সার প্রস্তুত প্রণালী।—প্রতিদিন গোয়াল ঘর, আস্তাবল ও খোঁয়াড় হইতে জঞ্জাল বাহির করিয়া যথেচ্ছা ফেলিয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। যে সার কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করা উচিত, নতুবা এক্ষণে সচরাচর যে ভাবে প্রাণীজ আবর্জ্জনাদি রক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত কদর্য্য প্রথা এবং অনেক সারাংশ আবর্জ্জনা হইতে নিঃসৃত হইয়া সারকে সারবিহীন করে। সমতল ভূমিতে ও অনাবৃত স্থানে ওঁচলারাশি স্তূপীকৃত হইলে সেই স্তূপ হইতে জলীয় অংশ, জল ও বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া যায় এবং যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাও তাদৃশ ফলদায়ক হয় না। এতদ্ব্যতীত সার স্তূপাকারে থাকিলে স্বতঃই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তন্নিবন্ধনও তাহার সারাংশ—কতক জলের আকারে ও কতক বাষ্পাকারে—নির্গত হইয়া যায়। অনন্তর, সেই উত্তাপে তাহার অবিগলিত দাহ্যাংশ নষ্ট হইয়া যায়। সার, অগ্নিদগ্ধ হইলে যে ফল হয়, অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও প্রায় তদনুরূপ হয়। সংগৃহীত সার-রাশি যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করা দুষ্কর। উত্তপ্ত স্তূপের মধ্যে তাপমান যন্ত্র (Thermometer) প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার উত্তাপের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। স্তূপ মধ্যে যখন উত্তাপের বা পবনের ক্রিয়া (Fermentation) আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা হইতে বাষ্প উত্থিত হইতেছে এবং যতই উহা উত্তপ্ত হইতে থাকে, ততই অধিক বাষ্প নির্গত হয়। উত্তাপের ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে অর্থাৎ দাহ্য পদার্থ সমুদায় দগ্ধ হইয়া গেলে আর উত্তাপ দেখা যায় না। যতক্ষণ সারের মধ্যে জলীয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, প্রায় ততক্ষণ তাহার অভ্যন্তর দগ্ধ

হইতে থাকে কিন্তু যে ক্ষণ হইতে জলের অভাব হয়, সেই ক্ষণ হইতে উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। সারের প্রথমাবস্থার সহিত এই অবস্থার তুলনা করিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে, টাট্‌কা সার হইতে বিদগ্ধ-সার কত লঘু ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছে! বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়াও যদি কেহ সারের তারতম্য নিরাকরণ করিতে না পারেন তাহা হইলে টাট্‌কা-সার ও দিগ্ধ সার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিলে সকল সংশয় আপনা হইতেই মীমাংসিত হইবে। তাই বলিয়া একবারে টাট্‌কা-সার (fresh dung) ব্যবহার করিতে আমরা পরামর্শ দিই না, কারণ ইহারও কয়েকটী দোষ আছে এবং সেই দোষ ক্ষালিত না হইলে যদি উহা ক্ষেত্রে প্রদান করা যায় তাহা হইলে ক্ষেত্র ও ফসল উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হয়।

টাট্‌কা-গোবর বা নাদি (Long dung) ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইতে দেওয়া উচিত, কেন না, তাহা হইলে সেই উত্তাপে সার মধ্যে যে কিছু শস্যাদি থাকে, তাহা মরিয়া যায় অর্থাৎ সেই উত্তাপে তাহাদিগের অঙ্কুরিত হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা দ্বিতীয় উপকার এই যে স্তূপের সার ভৌতিক পদার্থের সংস্রবে ও রাসায়ণিক ক্রিয়াবশে অপেক্ষাকৃত সারবান হইয়া উঠে। উক্ত স্তূপকে অধিক উত্তপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে তাহাতে আবশ্যক মত জল সেচন করিয়া উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। উত্তপ্ত স্তূপে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিলে কিম্বা তাহাকে উলট-পলট করিয়া দিলে উহা শীতল হয় এবং উত্তাপ আরও বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমে উপশমিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সার অনাবৃত স্থানে রক্ষা করা বিধি নহে।

সার রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ইষ্টকের হৌজ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয় এবং সার রক্ষার পক্ষেও নিরাপদ হওয়া যায়। হৌজের ভিতর সিমেণ্ট প্রলিপ্ত হইলে সারের জলীয়াংশ হৌজের গাত্রে শোষিত হইতে পারে না। যেখানে হৌজ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব, তথায় একটী একটী গভীর ও প্রশস্ত গর্ত্ত খনন করতঃ তাহাকে উত্তমরূপে মাটি ও গোবর দ্বারা লেপন করিয়া তন্মধ্যে, কিম্বা বৃহদাকারের পিপে, গামলা বা লৌহের আধার মধ্যে, সংগৃহীত আবর্জ্জনা নিত্য সঞ্চিত করিতে হইবে। এইরূপে সার সংগৃহীত হইলে হৌজ বা আধারের উপরে একটী আবরণ দিতে হয়। হৌজ বা গর্ত্তের অধিক উপরে চালা নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যক নাই, তবে এরূপ ভাবে করিতে হইবে যে, তাহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিতে না পারে। সাররাশি মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা উল্টাইয়া দিলে তাহার অনেক উত্তাপ হ্রাস হইয়া যায় এবং সমুদায় সার সমভাবে উত্তপ্ত ও গলিত হইয়া থাকে, নতুবা অধিক উত্তাপ পাইয়া ভিতরের সার এক প্রকার হয় এবং উপরিভাগের সার অন্য প্রকার হয়।

টাট্‌কা সার (long dung) ও পুরাতন সারের (muck) কার্য্যফল স্বতন্ত্র। টাট্‌কা সার দ্বারা জমী আল্‌গা ও সারবান হয়, কিন্তু পুরাতন সারে তাহা হয় না। টাট্‌কা সার দিলে এঁটেল মাটি আল্‌গা হয় কিন্তু বেলে মাটিতে দিলে উহা আরও আল্‌গা হইয়া গিয়া মাটি নীরস হইয়া পড়ে, সুতরাং শেষোক্ত প্রকারের জমীতে সদ্য টাট্‌কা সার না দিয়া পুরাতন ও গলিত সার দিলে বালির আল্‌গা প্রকৃতি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। পুরাতন সারের মধ্যে উদ্ভিদ-খাদ্য অল্পই থাকে, এজন্য উহার শক্তিও অধিক দিন থাকে না। সারবিশেষ ১০।১৫ দিন হইতে ২।৩ মাস স্তূপের

মধ্যে থাকিলেই উহা ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে, অধিক দিবস স্তূপের মধ্যে রাখিতে হইলে উপরোক্ত প্রণালীতে উহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

টাট্‌কা সার অপেক্ষা পুরাতন সারের স্নিগ্ধতা অধিক, এজন্য উভয়ের ফল স্বতন্ত্র। সবজী ক্ষেতে নূতন ও পুরাতন সার ভিন্নরূপে ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নূতন সারে গাছের শক্তি শীঘ্র বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেই সকল সব্জীর আস্বাদ কথঞ্চিৎ বিকৃত হয়, সুতরাং সব্জীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত পুরাতন সারই প্রশস্ত।

অশ্ব-নাদি।—ঘোড়ার নাদি বড় তেজস্কর এবং নানাবিধ খনিজলবণবিশিষ্ট। স্তূপের মধ্যে কিছু কাল রাখিয়া তাহার উগ্রতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইলে তবে তাহা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে, অন্যথা ব্যবহার করিলে উদ্ভিদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে অশ্বশালার আবর্জ্জনা ব্যবহার হইতে দেখা যায় না, কারণ উহা সাধারণ চাষীগণের আয়ত্তাধীন নহে। ধনীদিগের আস্তাবলে অনেক ঘোড়া-সার উৎপন্ন হয়, কিন্তু সহিস-কোচম্যানেরা তাহা রাত্রিকালে জ্বালাইয়া ফেলে। যাহা হউক, উক্ত সার কোন মতে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। নিস্তেজ ভূমিতে অথবা যে ভূমিতে গহমা, ইক্ষু, বা ভুট্টা সদৃশ বুভুক্ষু ফসল জন্মে, তাহাতে ইহা প্রদান করিলে উপকার হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, অশ্বনাদি অতিশয় উগ্র সার এবং জমীতে উহা প্রদত্ত হইলে কিম্বা উদ্ভিদ রোপণকালে উহা ব্যবহৃত হইলে গাছ-পালা মরিয়া যায়। আমারও সেই বিশ্বাস ছিল বলিয়া আস্তাবলের সার ব্যবহার করিতে আমি ইতস্ততঃ করিতাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহীশূরে অবস্থানকালে 'চালুভাম্বা-বিলাস' নামক বিস্তৃত প্রমোদোদ্যানে ঘোড়া-সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে দীক্ষিত

হই। সেখানে বিস্তর সারের প্রয়োজন ছিল কিন্তু গোবর যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়ায় অশ্বশালার আবর্জ্জনা ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। উক্ত সার দলবদ্ধ বা ডেলা অবস্থায় থাকিলে উদ্ভিদের কোন লাভ হয় না। এইজন্য মাটির সহিত উহা উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হয় এবং তাহা না করিলে মাটিতে উইয়ের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা। তাহা ব্যতীত, উহার সহিত বালুকা মিশ্রিত করিলে উই পোকার ভয় নিবারিত হয়। এইরূপে অশ্বনাদি বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহার করিয়া সফলকাম হইয়াছি বলিয়া সাহস করিয়া সকলকে উহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতে উদ্যোগী হইয়াছি। আর, ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, গবাদি পশুর গোবর-চোনা অপেক্ষা আস্তাবলজনিত আবর্জ্জনা বিশেষ উপকারী। গো-মহিষাদির গোময় বা চোনাতে যবক্ষারজান অতি অল্প মাত্রায় বিদ্যমান কারণ উক্ত পশুগণ যাহা কিছু আহার করে তাহার তাবৎ অংশ উদর মধ্যে পরিপাক হয়, ফলতঃ যাহা বর্জ্জিত হয় তাহাতে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী সার পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় থাকে কিন্তু অশ্বেরা যাহা ভক্ষণ করে তাহা সম্যকরূপে পরিপাক হয় না। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, অশ্ব অপেক্ষা গরু বাছুরের হজম শক্তি অধিক। এই জন্য অশ্বদিগের নাদি ক্ষণকাল স্তূপীকৃতাবস্থায় থাকিতে পাইলে তাহা হইতে বাষ্পোত্থিত হয়। এইরূপে ২।৪ দিবস স্তূপীকৃতাবস্থায় থাকিলে উক্ত স্তূপের সার উত্তমরূপে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয়, এবং তখন উহা ব্যবহার করিলে অনিষ্টের আদৌ আশঙ্কা থাকে না। তবে উইপোকা নিবারণোদ্দেশ্যে উহার সহিত অল্পাধিক বালুকা মিশাইয়া লইলে ভাল হয়। বেলে জমিতে দিতে হইলে উহার সহিত বালুকা মিশ্রিত করা উচিত নহে।

ভেড়ীসার।—ইহা অতি অল্পই পাওয়া যায়, এজন্য উহা

কৃষকের পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে। যাহারা সজীর আবাদ করে তাহারা উহা ব্যবহার করিলে লাভবান হইতে পারে। তামাকের পক্ষে উহা উৎকৃষ্ট সার। ভেড়ী ও ছাগলের নাদী অত্যন্ত নীরস এজন্য উহার স্তূপ সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা উচিত। উক্ত সার অতি অল্প স্থানের মধ্যে রক্ষিত হইতে পারে সুতরাং উহা সংগ্রহ করতঃ বড় বড় জলপূর্ণ জালা বা গামলায় রাখিলে অচির-কাল মধ্যে ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। যাহাতে উহার বাষ্পীয় ভাগ উড়িয়া না যায়, সে জন্য তাহার উপরে কোন আচ্ছাদন দেওয়া উচিত এবং সমভাবে পচিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গামলার মধ্যস্থিত সার উল্টাইয়া দিয়া পুনরায় ঢাকিয়া দিতে হয়। ভেড়ীর সার সার-হিসাবে অমূল্য সামগ্রী। যাঁহারা ভেড়ী পুষিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ মাসিক বন্দোবস্তে উহা সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে. কোন সারের মধ্যে যে বাষ্প জন্মে এবং ক্রমে যাহা বায়ুমণ্ডলে উপিয়া যায়, উক্ত বাষ্প যাহাতে নির্গত হইয়া যাইতে না পারে তাহার উপায় করা উচিত, এতদর্থে সারস্তূপের উপরে অল্পাধিক কাষ্ঠজাত কয়লার গুঁড়া প্রসারিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কাঠ-কয়লা কার্ব্বনপূর্ণ এবং উক্ত কয়লার যে ওজন, তাহাপেক্ষা ৯৯ (নিরানব্বই) ভাগ অ্যামোনিয়া ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। এইজন্য বাসগৃহ মধ্যে বিশেষতঃ হাঁসপাতালে রোগীর ঘরে কাঠ কয়লার ঝুড়ী টাঙ্গান থাকে।

পুরীষ ও চোনা।—পুরীষ অপেক্ষা চোনা মূল্যবান। চোনার মধ্যে আমোনিয়া নামক সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থের অংশ থাকাতেই তাহার এত মূল্য, কিন্তু সাধারণতঃ চোনা সংগ্রহ করিবার. জন্য কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, অনেক চোনা নষ্ট হয়। গোয়াল ঘরের মেজেয়

সিমেণ্ট দেওয়া থাকিলে উহা না শোষিত হইয়া কিম্বা না শুকাইয়া, কোন স্থানে সঞ্চিত হইতে পারে। মেটে গোয়াল ঘরের চোনা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রতি দিবস প্রাতঃকালে গোয়াল-ঘর ব্যাপিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ছাই, খড়ের কুচি বা শুষ্ক পত্রাদি ছড়াইয়া দিতে হয় এবং পরদিবস তৎসমুদায় সংগ্রহ করতঃ গোময়ের স্তূপে ফেলিতে হয়। এইরূপে প্রতিদিন ছাই বা খড়ের কুচি দিলে সমুদায় চোনা উহাতে শোষিত হয়। যেখানে চোনা সংগ্রহের পাকা বন্দোবস্ত আছে সেখানে প্রতিদিনের চোনা সংগ্রহ করিয়া স্তূপের উপর ঢালিয়া দিলে এতদুভয়ের সম্মিশ্রণে সুন্দর সার প্রস্তুত হয়। সংগৃহীত মূত্রের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিলে অতি শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। সকল প্রকার সারই জলে গুলিয়া এই প্রকারে ব্যবহার করিলে শীঘ্রই উপকার দর্শিয়া থাকে। কোন সারই ঘন (solid) থাকিতে উদ্ভিদের ব্যবহারে আইসে না, কিন্তু যতই তরল পদার্থের সহিত উহা একীভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে তত শীঘ্র তাহা উদ্ভিদের ব্যবহারে আইসে। ঘন-সার উপরোক্ত অবস্থায় পরিণত হইতে বিলম্ব হয় বলিয়াই উহার ফল উদ্ভিদ্-শরীরে কার্য্যকরী হইতে বিলম্ব হয়। তরল-সার গাছের গোড়ায় দিলে ৫।৬ দিবসের মধ্যে তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তরল-সার ফুল-বাগানে ও সব্জীক্ষেত্রে সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তরল-সার গাছের পূর্ণাবস্থায় অর্থাৎ ফল বা ফুল ধারণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সময়ে দিতে হয়, নতুবা গাছের অবয়ব বর্দ্ধিত হইয়া ফলধারণ করিতে উদ্ভিদগণ অসমর্থ হয়। ফল বা ফুল ধরিবার অধিক দিবস পূর্ব্বে তরল-সার গাছের গোড়ায় দিলে অবিলম্বে উদ্ভিদ তদন্তর্গত সার আহরণ করিয়া লয়, সুতরাং তাহার আর অধিক দিবস শক্তি বা কার্য্যকারিতা থাকে না।

তরল-সার।—কেবল যে গবাদি পশুর মল-মূত্র হইতে ইহা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা নহে। চোনার সহিত নানাবিধ খৈল, পচা মাছ ও মাংসাদিকে কিছুদিন পচিতে দিলে অল্পদিন মধ্যেই তদ্দ্বারা উত্তম তরলসার তৈয়ার হয়। সুপ্রসিদ্ধ কৃষি-রাসায়নিক স্যার হম্ফ্রী ডেভী (Sir Humfrey Davy) বলেন যে, তরলসার অধিক দিবস রাখিয়া দিলে তদন্তর্গত উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী পদার্থ নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমে তাহাতে আমোনিয়া জাতীয় লবণের আবির্ভাব হয়। উক্ত লবণ (Ammoniacal salts) তত কার্য্যকরী নহে সুতরাং তরলসার সদ্য সদ্য ব্যবহার করা উচিত। সার উত্তপ্ত হইয়া পড়িলে যে তাহার অনেক শক্তি কমিয়া যায়, তাহা অন্য প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। চীন দেশে তরল সারের বিশেষ আদর। তথায় গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অতি অল্প, এজন্য তথায় পশু-দিগের উপর সারের জন্য নির্ভর করা চলে না। চীনবাসীগণ মনুষ্যের আবর্জ্জনা সংগ্রহ করতঃ তাহাতে জল মিশাইয়া তরল সার প্রস্তুত করে। অনন্তর, কোন উচ্চতম কর্ম্মচারী (Mandarin) সেই তরল-সারবিশিষ্ট পাত্রকে কোন আবরণ দ্বারা আবদ্ধ করতঃ শীল-মোহর করিয়া দেন। পাঁচ-ছয় মাস পরে যখন উহা তৈয়ার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তখন তিনি স্বয়ং সেই মোহর ভাঙ্গিয়া পাত্রস্থিত সার ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করেন। ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকিলে তিনি এক প্রশংসাপত্র দেন, পরে তাহা বোতলমধ্যে আবদ্ধ হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়।

আলুগা জমিতে তরল-সার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। উহা যে-কোন ফসলে প্রদান করা গিয়াছে, তাহাতে, দেখা গিয়াছে যে, গাছের শ্রী তৎপর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অতিরিক্ত ও পরিপুষ্ট ফসলও

জন্মিয়াছে। জাপান দেশেও মনুষ্যের পূরীষাদি প্রধান সার, এজন্য প্রত্যেক কৃষকের ক্ষেত্রে একটী পায়খানা থাকে। পথিকগণ তথায় ইচ্ছামত আসিয়া শৌচপ্রস্রাবাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যায়। ক্ষেত্রস্বামী প্রতিদিন সেই পায়খানার মলমূত্র হয় কোন স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়, কিম্বা ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিয়া আবাদ করে। এদেশে পল্লীগ্রামবাসীদিগের নিকট মনুষ্যের মলমূত্রের কার্য্যকারিতা অজ্ঞাত নাই কারণ তথায় অধিকাংশ লোক উক্ত প্রাত্যহিক কার্য্য মাঠ ময়দানে সারিয়া আইসে। এতন্নিবন্ধন তথায় যাহা কিছু জন্মে, তাহাই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। পতিত ক্ষেত্রে লোকে এই সকল কার্য্য সমাধা করে বলিয়া সে সকল স্থান উহার প্রভাবে এত জঙ্গলময় হয় যে তথায় প্রবেশ করা যায় না।

মনুষ্যের মলমূত্র সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না, কারণ আজকাল অনেক সহরেই মেথরে ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যায়। অনেক সহরে মিউনিসিপ্যালিটী দ্বারাও উক্ত কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। মেথর বা মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত কোনরূপ আর্থিক বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, তাহারা ক্ষেত্রে গিয়া সেই ময়লা ঢালিয়া আসিতে পারে এবং তাহার দুর্গন্ধ উপশমিত হইলে ক্ষেত্রস্বামী অনায়াসে তাহাতে চাষ-আবাদ করিতে পারেন। ক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে দুই চারিটী মেথর চাকর থাকিলে উক্ত সার দ্বারা ক্ষেত্রের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার সুবিধা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম ও বোম্বাই অঞ্চলে অনাবাদী ও পতিত জমি অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া চাষ আবাদের জন্য কেহ গ্রহণ করিত না, কিন্তু উক্ত সার ব্যবহারের প্রচলন হইবার পর হইতে সেই প্রকার জমির খাজনা ৩০।৪০ টাকা

পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। খাস কলিকাতার পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে ও ধাপা অঞ্চলে পূর্ব্বে জমির বড় মূল্য ছিল না, কারণ সে সকল জমি এত লোনা যে তাহাতে কোনও ফসল জন্মিত না, কিন্তু ইদানীং সেই সকল জমিতে মিউনিসিপ্যালিটী-সংগৃহীত মানুষের মলমূত্রাদি প্রোথিত হইয়া থাকে, ফলতঃ তৎসমুদায় জমি আশাতীত পরিমাণে উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে এবং খাজনাও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল জমিতে যে তরিতরকারি উৎপন্ন হয় তাহা যেমন সুপুষ্ট ও রসাল, তেমনি বৃহদাকার হয়। এক্ষণে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, দ্রব্যাবি যে প্রকার দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ ধান্য উৎপন্ন করিলে চলে না, সুতরাং তাহার উর্ব্বরতা সাধন করিবার জন্য নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১॥০ বা ২৲ টাকায় ১/০ মণ চাউল পাওয়া যাইত কিন্তু এক্ষণে ৭।৮৲ টাকা বা ততোধিক মূল্য না দিলে ভারতের কুত্রাপি তাহা পাওয়া যায় না। এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য পূর্ণমাত্রায় শস্যোৎপাদন করিতে না পারিলে উপায়ান্তর নাই। অতএব পূর্ণমাত্রায় শস্যোৎপাদন করিতে হইলে ক্ষেত্রের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে হইবে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় জাগরিত ও কর্ম্মঠ করিতে হইবে, ক্ষেত্রের আধ হাত, অধিক কি—চার অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ও অকর্ষিত ও অব্যবহার্য্যরূপে পতিত না থাকে,—তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অস্থি-চূর্ণ।—যাবতীয় মৃত প্রাণীর অস্থি চূর্ণ করিলে যে গুড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে অস্থি-সার কহে। অস্থি-সার ব্যবহার করিয়া অনেকে অনেক প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, এজন্য তাহার কার্য্য সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক পক্ষ

সমর্থন করেন যে, উহার ব্যবহার মাত্রেই উপকার পাওয়া যায় ; অপরপক্ষ বলেন যে, মৃত্তিকার গঠনের উপর উহার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। এই ভিন্ন মত অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যতই দিন যাইবে ও তাহার পরীক্ষা হইবে, ততই উভয় মতাবলম্বীদিগের মত সম্বন্ধে নানা শাখা-প্রশাখা বাহির হইবে।

অস্থির মধ্যে চূণের অংশ অধিক থাকায় সকল জমিতে একই ভাবে কোন মতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। চূণবিশিষ্ট জমিতে (Calcareous soil) স্বভাবতঃ ২০-ভাগের অধিক চূণ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং অবিবেচনার সহিত তাহাতে চূণবিশিষ্ট সার মিশ্রিত করিলে কোন কোন ফসলের অনিষ্ট হইতে পারে। বেলে জমিতে সংযোজিত হইলে উহার মাটি অধিকতর আল্‌গা হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন জমি সমধিক নীরস হইয়া পড়ে এবং মৃত্তিকার ছিদ্রপথ সকলও (Capillary tubes) আল্‌গা হইয়া যায়, ফলতঃ উপরের উত্তাপ ভূগর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়া ভূপৃষ্ঠকে অতিশয় উত্তপ্ত করে এবং তাহাতে ক্ষেত্রস্থ ফসলের অনুপকার হয়। এক দিকে যেরূপ অস্থি-সার দ্বারা অপকার হইয়া থাকে, অন্য দিকে স্থানবিশেষে আবার তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অস্থিচূর্ণকে যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে উহাকে আমরা সার মধ্যে না গণিয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবার পক্ষে সাহায্যকারী বলিলেও বলিতে পারি। প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জসার যেরূপ সাক্ষৎ ভাবে উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে, অস্থিসার সেরূপ পারে কিনা, তাহা এখনও বিবেচ্য ও পরীক্ষাসাপেক্ষ। অমরা যতদূর স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি এবং অপরাপর কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার ফলাফল শুনিয়াছি, তাহতে কোন প্রকারে

বলিতে পারি না যে, অস্থিচূর্ণ সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্য করিতে পারে। একই ফসল দুই খণ্ড জমিতে আবাদ করতঃ তাহাতে অস্থিচূর্ণ বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ দ্বারা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতেই আমাদিগের এই ধারণা। কোন এক ক্ষেত্রে কেবল অস্থিচূর্ণ ও উদ্ভিজ্জসার একত্র মিলাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, যে খণ্ড জমিতে কেবলমাত্র অস্থিসার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অপর খণ্ড জমির ফসলের পরিমাণ অধিক এবং ফসল পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, বিনা সারে যে পরিমানে ফসল হইয়া থাকে, অস্থিচূর্ণ প্রদত্ত জমিতে তাহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস যে মৃত্তিকার সহিত অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত হওয়ায়, মৃত্তিকার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, কেবলমাত্র অস্থিচূর্ণের উপর কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে কি না? তাহাতে বীজ রোপণ করিলে গাছ জন্মে, কিন্তু কিছু দিবস পরে মরিয়া যায়, সুতরাং ইহা দ্বারা আমরা বুঝিয়াছি যে, অস্থির মধ্যে যতদিন জৈব (organic) পদার্থ থাকে, ততদিন গাছটী বাঁচিয়া থাকে ও বৰ্দ্ধিত হয়, কিন্তু সেই জৈব পদার্থ নিঃশেষিত হইলে উহা মরিয়া যায়। বিনা অস্থিসারে যে ফসল কম পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং জমিতে অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিলে যে জমির ফসল অধিক ও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়, তাহার একমাত্র কারণ—অস্থিচূর্ণের সংসর্গতাহেতু মৃত্তিকার কার্য্যকরী শক্তির পরিবৃদ্ধি। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অস্থি সাক্ষাৎ সার নহে, পরোক্ষ সার অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সারের কার্য্য করিয়া থাকে এবং সেই কারণেই উহাকে সারশ্রেণী মধ্যে গণনা করা যায় না। যাহা

হউক, সাধারণ পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত আমরা উহাকে সাররূপে আলোচনা করিব। অস্থিমধ্যে চুণ ও খনিজ পদার্থ থাকায় উদ্ভিদের কাঠাম ও ফল সংগঠনের সুবিধা হইয়া থাকে। যে জমিতে এতদুভয় বস্তুর অভাব ও সোরাজানের আধিক্য, তাহাতে ফসল ভালরূপে জন্মে না, এবং যে সকল শস্যে চুণ, লবণ ও হাড়জান অম্লের (Phosphoric acid) অভাব বা তাহা অল্প পরিমাণে অবস্থিত তাহা জীবশরীরের পক্ষে পুষ্টিকর নহে, সুতরাং ফসলকে পুষ্টিকর করিতে হইলে ক্ষেত্রে অস্থি-সার দেওয়া আবশ্যক। ফল ফুল, মূল বা কন্দরূপে যে সকল সামগ্রী আমরা উদরস্থ করি, তৎসমুদায় পুষ্টিকর হইলে তবে আমরা স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ হইতে পারি। সেই জন্য বলকারী আহার্য্য উৎপন্ন করিতে হইলে ক্ষেত্রে সারবান উদ্ভিদখাদ্য সংযোজিত করিতে হইবে।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ বালি-গ্রামে একটী হাড়-সার উৎপন্ন করিবার কল * আছে। সেখানে নানাবিধ অস্থিচূর্ণ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। তথায় যে কয় প্রকারের অস্থিচূর্ণ পাওয়া যায় নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এক্ষণে উহাদিগের মূল্য কত তাহা অবগত নহি। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে সেই সকল দ্রব্য যে দরে ক্রয় করিয়াছিলাম, এস্থলে সেই মূল্য উদ্ধৃত হইল :—

১নং	মূল্য	৫৫৲	প্রতি টন	(মোটা ও সরু দানা)
২নং	”	৬০৲	”	(মোটা দানা)
৩নং	”	৫৫৲	”	(ঐ)
৪নং	”	৫৫৲	”	(সরু দানা)

* Balli Bone Mills—এই কলের এজেণ্ট Messrs. Graham & Co., 9 Clive Row, Calcutta.

৫নং	মূল্য	৫০৲	প্রতি টন	(অতি সূক্ষ্ম দানা)
৬নং	"	৫০৲	"	(গুঁড়া)

বাঙ্গালা হিসাবে প্রতি টনের ওজন ২৭/৯ (সাতাইশ মণ নয় সের)। ৬-নম্বরের গুঁড়ার মূল্য পূর্ব্বে ২৫৲ ছিল। উহা অতি শীঘ্র বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয়, এইজন্য ইহাই সমধিক প্রচলিত এবং তাহারই ফলে গুঁড়ার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে।

হাড়ের গুঁড়া শীঘ্র মৃত্তিকাতে মিলিত হইয়া যায়, কিন্তু হাড়ের কুচাবিশিষ্ট যে সার তাহা বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইতে অধিক বিলম্ব হয়, এজন্য যে স্থলে উহার কার্য্য শীঘ্র আবশ্যক, সেখানে ধুলিবৎ অস্থিচূর্ণ বা গুঁড়া ব্যবহার করাই উচিত। অস্থিসার কুচাবিশিষ্ট হইলে বর্ষার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া দিলে বর্ষার জলে উহা ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহারোপযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে যখন মৃত্তিকার রস কমিয়া যায়, তখন উহা বিগলিত হইয়া কার্য্যোপযোগী হইতে ৩।৪ মাস বা ততোধিক সময় লাগে। গুঁড়া-সার বর্ষাকালে এক মাসের মধ্যেই মৃত্তিকার সহিত অল্পাধিক মিশিয়া যায়। আমাদিগের মতে গুঁড়া সার ব্যবহার করাই উচিত কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, মোটা-সার দিলে উহা অনেক দিবস পর্য্যন্ত কাজ করে। এ কথা সত্য কিন্তু চূর্ণের আকারানুসারে কার্য্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

মোটা-সার যেমন এক দিকে অনেক দিবস কার্য্য করে, অন্য দিকে আবার দেখা যায় যে, তদ্দ্বারা যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহা অতি সামান্য, সুতরাং উদ্ভিদগণ আবশ্যকমত যথাসময়মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে সার না পাইলে তাদৃশ ফল প্রসব করিতে পারে না। অস্থি-সারকে শীঘ্র দ্রবীভূত করিবার জন্য অনেক স্থানে উহার সহিত তেঁতুল, আমড়া-

পাতা বা গোবর মিশাইয়া কিছু দিন রাখা হয়। অস্থিচূর্ণ বা অস্থি-ভস্মের সহিত সাল্‌ফিউরিক দ্রাবক (Sulphuric acid) মিশ্রিত হইলে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সুপার' বা সুপার-ফস্‌ফেট-অব-লাইম (Super-phosphate of lime) কহে। অস্থি-ভস্মও সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

ফসল রোপণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিতে অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে (মুরসিদাবাদ) রৈইসবাগে যে আলুর আবাদ করা যায়, তাহাতে উক্ত প্রণালীতে অর্থাৎ বীজ রোপণ করিবার সময় মাটির সহিত অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, সেই অস্থিচূর্ণ কুচিবিশিষ্ট ছিল, সুতরাং তাহা দ্বারা আলুর বিশেষ উপকার হয় নাই, বরং কয়েক মাস পরে সেই ক্ষেত্রে কার্পাসের আবাদ করা হইলে তাহাতে অস্থি-সারের বিশেষ ফল দেখা গিয়াছিল। অতএব উহা ব্যবহার করিতে হইলে ফসল রোপণ করিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা হইলে উক্ত ফসল যথাসময়ে তাহা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সুফল প্রসব করিবে। চাউল, দ্বিদল প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী অপক্ক অবস্থায় যেরূপ মানুষের কোন কাজে আইসে না, সেইরূপ যে কোন সারই হউক, তাহা উত্তমরূপে বিগলিত না হইলে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয় না। এই কথাটী স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক এবং তদনুসারে কাজ করিলে সারের দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে। ব্যবহার করিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে যদি একটী ইষ্টক নির্ম্মিত হৌজ বা বড় বড় পিপের মধ্যে গোবর বা খৈলের সহিত

অস্থিচূর্ণ একত্রিত করিয়া পচিয়া যাইতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ফসল বুনিবার সময় উহা ব্যবহার করিতে পারা যাইবে।

চুণ।—কৃষিকার্য্যে চুণ একটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী। উহা সাক্ষাৎ সার না হইলেও ভৌতিক ক্রিয়াবলে মাটির মধ্যে তাহার কার্য্য হয়। ক্ষেত্রে চুণ প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকার অন্যান্য পদার্থকে উহা কার্য্যকরী করিয়া লয়। মৃত্তিকার কোন দোষ থাকিলে চুণ প্রয়োগে তাহা ক্ষালিত হয় এবং পোকা-মাকড় ও গাছের মৃত শিকড়াদি জীর্ণ হইয়া এবং তৎসমুদায় পচিয়া গিয়া ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করে। যে ক্ষেত্র অনেকদিন চাষ-আবাদ হওয়ায় দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহাতেই চুণ দেওয়া উচিত। উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী জমিতে চুণ প্রদান করিলে তাহার সারাংশ প্রথমতঃ নিষ্কর্ম্মা হইয়া যায় এবং আপাততঃ আবাদ হইবার পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠে। এঁটেল মৃত্তিকাবিশিষ্ট জমিতে চুণ প্রদান করিলে মাটি আলগা হয় কিন্তু বালি মাটিতে দিলে অনেক সময় চুণ ও বালিতে জমাট বাঁধিয়া যায়।

চুণ দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে—১ম, শম্বুক ও গুগ্‌লি অগ্নি সাহায্যে ভস্ম করিলে এক প্রকার চুণ উৎপন্ন হয় এবং তাহা বাখরি চুণ নামে অভিহিত। অন্য প্রকার—কঙ্কর, ঘুটীং প্রভৃতি প্রস্তরবিশেষ দগ্ধ করিলে উৎপন্ন হয়। নূতন চুণ ব্যবহার করিবার পক্ষে বিশেষ আপত্তি আছে, কারণ উহার তেজ এতই অধিক যে, ক্ষেত্রে প্রদান করিবামাত্র অগ্নিবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। কারণ, তদ্দারা মাটির স্বাভাবিক বা অবস্থিত নাইট্রোজেন অপসারিত হয়। যদিও অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না, তথাপি তাহার উগ্রতাবশতঃ ক্ষেত্রস্থিত যাবতীয় উদ্ভিজ্জপদার্থ অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে কিন্তু পুরাতন বা

নিস্তেজ চুণ ব্যবহার করিলে ক্ষতি না হইয়া উপকার হইয়া থাকে। পুরাতন চুণ তাদৃশ উগ্র নহে এবং তাহার কার্য্যও ততদূর বা তত অধিক নহে। চুণ ব্যবহারের পক্ষে দুইটা মত আছে। এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, ক্ষেত্রে ক্ষীণ বা মরা চুণ দেওয়াই ভাল কারণ তাহা হইলে জমির তত অনিষ্ট হয় না। অন্য সম্প্রদায়ের মতে নূতন চুণ দেওয়াই ভাল। আমরা টাট্‌কা ও তেজ-মরা—উভয়বিধ চুণই ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, এবং তাহার ফলে নূতন চুণের পক্ষপাতী হইয়াছি। চুণ,—জল ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে জমাট বাঁধিয়া যায় এবং তাহা সহজে চূর্ণ করা যায় না। জমাট অবস্থায় প্রসারিত করিলে, ক্ষেত্রময় তাহা সমভাবে ও সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত হয় না। নূতন চুণ সূক্ষ্ম ধূলাবৎ সুতরাং মৃত্তিকাকণার সহিত মিশ্রিত হইতে বিলম্ব হয় না এবং যত সূক্ষ্ম ও ঘনভাবে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয়, ততই অধিক ও শীঘ্র তাহার ফল কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু, গাছের গোড়ায় সাররূপে প্রদান করিতে হইলে চুণকে হীনতেজ করিয়া অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা বা অন্য কোন প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। মুরসিদাবাদের রৈইসবাগে ইক্ষুর আবাদে পুরাতন হীনতেজ চুণ ব্যবহার করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম। প্রত্যেক ইক্ষুর ঝাড়ে ৷৷৹ (আধ সের) আন্দাজ চুণের সঙ্গে গোবর-সার ও খৈল যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। এক মাসের মধ্যে তাহার শুভ ফল প্রত্যেক ঝাড়ে প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অপর কতকগুলি ঝাড়ে অন্য সারও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু যে সকল গাছে চুণ ব্যবহার করা হইয়াছিল, দুই তিন মাসের মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি এত অধিক ও শ্রী এত সুন্দর হইয়াছিল যে, দেখিলে আশ্চর্য্য

হইতে হইত এবং প্রত্যেক ঝাড়ে প্রায় ৩০।৪০টী করিয়া ইক্ষু দণ্ড বা গাছ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু অপর গুলিতে ১০।১২টীর অধিক হয় নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত রাজনগরে কতকগুলি শীর্ণ ও মৃতপ্রায় লেবু গাছে চুণ ব্যবহার করি। রাজনগরে কতকগুলি লেবু গাছে ফল হওয়া দূরের কথা, পত্রও অধিক হইত না। উপরন্তু গাছের অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, তাহাদিগকে দেখিলে কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইত। সে বৎসর আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে উহাদিগের সংস্কার সাধন করা যায়। এবং যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা বিবৃত করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, গাছের গোড়ার মাটি অনেক দূর ব্যাপিয়া খুঁড়িয়া ফেলিয়া ১৫।২০ দিবস শিকড়গুলিকে অনাবৃত রাখা যায়। অতঃপর চুণ-মিশ্রিত সার দিয়া গোড়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। যে প্রণালীতে উক্ত সার তৈয়ার করিয়াছিলাম তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ঃ—এক ঝুড়ি টাট্‌কা পাথুরে চুণ, দশভাগ গোবরের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া ও বারম্বার উলটাইয়া স্তূপের মধ্যস্থলে, তাগাড়ের ন্যায় গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে জল পূর্ণ করতঃ কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া যায়। তাবৎ জল চতুষ্পার্শ্বস্থিত সারমধ্যে শোষিত হইয়া গেলে তাগাড় বারম্বার উলট-পালট করা হইত। ৬।৭ দিন কাল প্রতিদিন ঐরূপে তাগাড়কে উলট-পালট করিবার পর সার ব্যবহারোপযোগী হয়। এই অবস্থায় প্রায় সকল গাছেই ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করিতে পারা গিয়াছিল। অতঃপর, সেই সমুদায় বৃক্ষ তদবধি সুন্দর সুঠাম অবস্থায় থাকিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং প্রচুর ফল প্রদান করিতেছিল।

'উষর' ভূমিতে বিবেচনামত চুণ প্রয়োগ করিলে লোণা কাটিয়া গিয়া আপাততঃ নিঃস্ব (neutral) হয়। এবং সে অবস্থায় অপর

সার প্রদান করিলে তাহাতে যে কোন গাছ বা ফসলের আবাদ করা চলিতে পারে। ক্ষেত্রে চুণ দিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ক্ষেত্রের অবস্থা ও অভাব, ভাবী ফসলের প্রয়োজন, ঋতু ইত্যাদি না বুঝিয়া অবিমৃষ্যভাবে চুণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। হাল্কা, কষায় (calcareous soil) বা ঘন অর্থাৎ এঁটেল মাটিতে, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, কখনই চুণ দেওয়া উচিত নহে। শস্য বপন করিবার অন্ততঃ ৩।৪ মাস পূর্ব্বে ক্ষেতে চুণ দিতে হয়। চুণ প্রদান করিবার অব্যবহিত পরেই শস্য বপন করিলে শস্যের ভ্রূণ বা কল মরিয়া যায়। প্রতি বৎসর ক্ষেতে চুণ দিতে হয় না। এক ক্ষেতে প্রতি দশ বৎসরে একবার চুণ দিলেই যথেষ্ট হয়। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেতে চুণ দিয়া রাখিলে, আগতপ্রায় বর্ষার পর ক্ষেত্র আবাদোপযোগী হইয়া উঠে।

নাইট্রেট-অব সোডা।—ইহা যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন উৎপত্তির কারণ স্বরূপ। উক্ত সোডা এঁটেল মাটির বিশেষ উপযোগী। উক্ত লবণ মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হইয়া মৃত্তিকান্তর্গত ফস্‌ফেট ও পোটাস্‌কে বিযুক্ত করতঃ ফসলের আহরণোপযোগী করিয়া দেয়। যাবতীয় সোরাজানপ্রধান সারের মধ্যস্থ নাইট্রেট-অব-সোডা উদ্ভিদশরীরে অতি শীঘ্র কার্য্যকরী হয়। এইজন্য ফসলের পূর্ণাবস্থায় জমির উপরে বা গাছের গোড়ায় অল্প পরিমানে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

সাধারণতঃ উক্ত লবণে শতকরা ৫ হইতে ২১ ভাগ ভেজাল থাকে। বিশুদ্ধতার পরিমাণানুসারে সোডার মূল্যের ইতরবিশেষ হয়। জিনিস ভাল হইলে অর্থাৎ ভেজালহীন হইলে তাহাতে শতকরা ১৫-ভাগ

সোরাজান বিদ্যমাণ থাকে এবং উক্ত ১৫-ভাগ সোরাজান ৩৮-ভাগ য়্যামোনিয়ার সমতুল্য। উৎকৃষ্ট সোরা হইলে পেরু দেশের গুয়ানো-সার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তেজস্কর হইয়া থাকে।

নাইট্রেট-অব-সোডা অতি শীঘ্র ও সহজে জলের সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া হাল্কা, বেলে ও আলুগা মাটির পক্ষে তাদৃশ উপযোগী নহে, কারণ উহা বিগলিত হইবামাত্রই মৃত্তিকার নিম্নদেশে চলিয়া যায়, সুতরাং ফসলের বিশেষ উপকারে আইসে না। তবে লঘু মাটিতে দিতে হইলে একেবারে অধিক না দিয়া কিয়দ্দিবস অন্তর অল্প পরিমাণে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কাজ সংক্ষেপ করিবার জন্য ফসল বুনিবার পূর্ব্বে জমিতে উহা দিয়া রাখিলে চলিবে না, কারণ সামান্য বৃষ্টিতেই উহা বিগলিত হইয়া ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফসলের বৃদ্ধির সময় দিলে উহা উদ্ভিদের ব্যবহারে আইসে।

নাইট্রেট-অব-সোডা নিজে কোন সার নহে, তবে ইহার এরূপ শক্তি আছে যদ্দ্বারা মৃত্তিকান্তর্গত ফস্‌ফেট ও পোটাস্‌কে শীঘ্র কার্য্যকরী করিতে পারে এবং নিজে বিগলিত হইয়া তাহাদিগের গুণ ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। উক্ত সোডা মধ্যে এতদুভয় পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব, সুতরাং যে মৃত্তিকায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাতে উক্ত দুই পদার্থ—ফস্‌ফেট ও পোটাস—সমধিক পরিমাণে থাকা আবশ্যক। এজন্য মাটির উপাদান না বুঝিয়া সোডা ব্যবহার করা উচিত নহে।

লবণ।—(Chloride of Sodium)।—লবণ দুই প্রকার যথা,—সামুদ্রিক ও খনিজ বা ধাতবীয়। এতদুভয়ের মধ্যে সামুদ্রিক

লবণ (যাহা আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যাহাতে সোডিয়াম (sodium) নামক লবণ সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান) কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী ।

ক্ষেত্রে লবণ প্রদান করিলে অধিক পরিমাণে যে শস্য জন্মে তাহার কারণ এই যে, তাহাতে উদ্ভিদের ত্বরিত বৃদ্ধির গতি যথেষ্ট পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং অতিরিক্ত পরিমানে প্রদান করিলে উদ্ভিদের নাশ হইবারও সম্ভাবনা থাকে । বিবেচনার সহিত লবণ প্রদান করিলে উদ্ভিদের ত্বরিত বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া উদ্ভিদের অবয়ব পরিপুষ্টি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে শস্যের পরিমাণ ও পরিপুষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । যে জমিতে লবণ কম থাকে, তজ্জাত উদ্ভিদ অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় কিন্তু তাহা তাদৃশ সবল বা ফলশালী হয় না, কারণ দ্রুত গতিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে জমি হইতে উদ্ভিদ সমধিক অধিক কি, নিজ প্রয়োজনমত খনিজ দ্রব্য ভূগর্ভ হইতে আহরণ করিতে অবসরও পায় না ।

অনেক সময় দেখা যায় যে, মাটি অতিশয় সারবান হওয়ায় গাছ অতি তেজাল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিলে এবং মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষেত্রে লবণ সংযোজিত করিতে পারিলে, গাছের বৃদ্ধি অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হয় এবং ফসলও অধিক হয়। সমুদ্রের নিকটস্থ জমি মাত্রেই প্রায় অল্পাধিক লবণময়। উক্ত লবণ বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত ২০।২৫ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত গিয়া থাকে এবং মৃত্তিকা সেই বায়ু শোষণ করিয়া লবণ সংগ্রহ করে। এই জন্য সমুদ্রকূল সন্নিহিত জমির ফসলে খড় অপেক্ষা শস্যের পরিমাণ অধিক হওয়া সম্ভব।

কৃষিক্ষেত্রে লবণ অতিশয় শীঘ্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে। লবণাক্ত ভূমিতে লবণ প্রদান করিলে ফসল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক দিতে পারিলে আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। লবণ যে কেবল উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করে তাহা নহে, উহা দ্বারা ক্ষেত্রের পোকা-মাকড় ও তৃণাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লবণ দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক দফা বীজ বপনের সহিত; অপর,—গাছে ফল আসিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়।

লবণের দ্বারা জমি সরস থাকে এবং মৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থ সহজে দ্রবীভূত হইয়া যায়। জমি সরস থাকিতে প্রদান করিলে শীঘ্র উহা গলিয়া যায়, কিন্তু মৃত্তিকা শুষ্ক থাকিলে বিগলিত হইতে ঈষৎ বিলম্ব হয় এবং প্রখর সূর্য্যকিরণে গলিত অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, এজন্য যাহাতে শীঘ্রই উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

লবণ-সার সব্জী-ক্ষেত্রে প্রদান করিলে সব্জী সুস্বাদ হয়, এজন্য অনেকে সব্জী-ক্ষেতে লবণ দিয়া থাকেন। কৃষিক্ষেত্রে প্রদান করিলেও অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায়। গবাদি পশুদিগের আহারীয় তৃণ, কলাই প্রভৃতি ফসলের জমিতে উহা প্রদান করিলে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা পশুগণ আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সকল কারণে লবণ-সার কৃষকের পক্ষে বড় আবশ্যকীয় দ্রব্য। কৃষিক্ষেত্রের জন্য পরিষ্কার সাদা লবণ না হইলেও চলিতে পারে। বাজারে যে খাঁড়ি নিমক বা করকচে লবণ বিক্রয় হয় তাহাই যথেষ্ট। খাঁড়ি নিমকের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম, এজন্য সাধারণে অল্প ব্যয়ে অনায়াসে উহা ব্যবহার করিতে পারে।

উল্লিখিত লবণ অপেক্ষা যদি "চাম-নিমক" * সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ফসলের আহার ও ঔষধ—দুই কাজই হয়, কারণ লবণের যে কার্য্য তাহা ত সে করিবেই, তাহা ব্যতীত উহা চামড়ার সহিত থাকায় প্রাণীজ অংশও উহাতে মিশ্রিত হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাণীজ সারের যে কাজ তাহাও উহা দ্বারা অনেক পরিমাণে সাধিত হয়।

সোরা।—(Nitrate of Potash) ক্ষারের সম্মিলনে সোরার উৎপত্তি। পুরাতন কাঁচা ঘরের দেয়ালে এবং ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। বেহার প্রদেশে বহুল পরিমানে সোরা উৎপন্ন হয়। ব্যবসায়ীগণ উহা সংগ্রহ করতঃ পরিষ্কার করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। কলিকাতার উপকণ্ঠে,—দমদমা, উল্টাডিঙ্গী, প্রভৃতি স্থানে ধান-জমিতে আমন-ধান সংগৃহীত হইবার পরে ভূপৃষ্ঠে শুভ্র গুঁড়ার আবির্ভাব হয়—তাহা লবণ।

যে জমিতে নাইট্রোজনের অভাব আছে মনে হয়, তাহাতে সোরা প্রদান করিলে সে অভাব দূর হয়। নাবাল জমি স্বভাবতঃই সার-পূর্ণ, সুতরাং সে জমিতে সোরা দিলে ফসলের উপকার না হইয়া অপকারই হইবার সম্ভাবনা। ভাদুই ফসলে সোরা দিবার কোন আবশ্যক হয় না, কারণ সে সময়ে বৃষ্টি হইতে জমিতে অনেক নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। ফসলের মধ্যমাবস্থায় জমিতে সোরা প্রদান করিলে, ফলন

* জীব-জন্তুর চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানী করিতে হইলে অথবা অধিক দিন সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইলে, তাহাতে লবণ দিয়া রাখিতে হয়। কিছু দিন পরে ঐ চামড়া ঝাড়িলে যে গুড়া বাহির হয়, তাহাকে "চাম-নিমক" কহে। চর্ম্ম ব্যবসায়ী-দিগের গুদামে ইহা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অধিক হয়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় দিলে গাছের বৃদ্ধি ও তেজ এতই অধিক হয় যে, ফসলের পরিমাণ সমধিক কমিয়া যায়।

শুষ্ক জমিতে সোরার দ্বারা কোন কাজ হয় না, এজন্য ক্ষেত্রে সোরা দিবার পরে যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হইবে। জলের সংশ্রবে আসিলে সোরা অবিলম্বে গলিয়া গিয়া উদ্ভিদ-শরীরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর একই জমিতে সোরা প্রদান করিলে প্রথম-প্রথম বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পরে ক্রমশঃ উক্ত, জমি সোরা-সঙ্কুল হইয়া পড়ে, স্থতরাং ক্ষেত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহাও আশঙ্কার কথা। এজন্য এককালে অধিক দিন এক ক্ষেত্রে সোরা ব্যবহার করা উচিত নহে, কিন্তু অভাবপক্ষে যদি নিতান্ত করিতেই হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে জমিতে অন্য কোন পদার্থের সহিত সংযোজিত করা উচিত। অস্থিচূর্ণ প্রদান করিলে সে উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে। সোরার সহিত সমধিক পরিমাণে ছাই মিশ্রিত করিলেও অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অপরিষ্কার সোরার মূল্য একদিকে যেমন কম, অন্য দিকে পরিমাণে অধিক লাগে স্থতরাং ভাল বা মন্দ সোরা ব্যবহারে একই ব্যয়। এস্থলে ভাল জিনিস ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। বিঘা প্রতি ১৫।১৬ সের সোরা দিলেই যথেষ্ট হয়।

দুই ভাগ লবণের সহিত এক ভাগ সোরা মিশ্রিত করিয়া যে সার প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা অনেক ফসলের বিশেষ উপকার হয়। ক্ষেত্রস্থ কোন ফসল সারাভাবে বিবর্ণ হইয়া গেলে তাহাতে উক্ত মিশ্রিত-সার ছড়াইয়া দিলে উদ্ভিদগণ আবার সতেজ হইয়া উঠে।

ঝুল ও ভুসা।—ঝুল ও ভূসার ব্যবহার এ দেশে অতি

অল্পই দেখা যায় কিন্তু এতদুভয়ের উপকারিতা যিনি একবার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

নানাবিধ কলের চিম্‌নী এবং পাকশালা ও গৃহমধ্যে উহা জন্মিয়া থাকে। বাসগৃহ অপেক্ষা চিম্‌নী ও পাকশালার ঝুল বা ভূসা সার হিসাবে বিশেষ ফলপ্রদ, কারণ তাহাতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বন (Carbon) ও আমোনিয়া (Ammonia) বিদ্যমান থাকে বলিয়া তদ্দারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। ক্ষেত্রে উহা ছড়াইয়া দিয়া পরে জমি চষিতে হয় কিম্বা কোন কোন বীজ বপন করিবার সহিতও অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। আলু, গাজর প্রভৃতি ফসলের গোড়ায় অল্প পরিমাণে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত, ইহার প্রয়োগে উদ্ভিদমূলে কোন পোকা-মাকড় লাগিতে পারে না, কারণ কীটাদির পক্ষে ঝুল বা ভূসা বড়ই তিক্ত ও বিষাক্তবৎ সুতরাং উদ্ভিদের আহার, পরিষেধ ও ঔষধরূপে ক্ষেত্রে উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঝুল বা ভূষা যে ক্ষেত্রে প্রদান করা যায়, তথাকার ফসল সুন্দর শ্রীসম্পন্ন হয় এবং পরে পুষ্ট হইয়া ফসল বৃদ্ধি করে, ফসলকে নীরোগ করে এবং ফসলের আকার ও গুণ বৃদ্ধি করে। ঝুল দুই প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম,—সদ্য আনীত অবস্থায়; এবং দ্বিতীয়,—তরল অবস্থায়। সদ্য ঝুল ব্যবহার করিতে হইলে ফসল লাগাইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে অল্প-স্বল্প দেওয়া ভাল, কারণ তাহা হইলে সকল স্থানে সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তরল অবস্থায় দিতে হইলে, উহাতে জল মিশ্রিত করিতে হয় কিন্তু উহা এত হাল্কা যে সহজে জলের সহিত মিশিতে চাহে না, সুতরাং ঝুল বা ভূসাকে একটি চটের থলে বা এক খণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে তৎসমুদায় ঝুল বা ভূসা ভিজিয়া যাইবে। তখন তাহাকে জলের সহিত মিশ্রিত

করিয়া লওয়া সহজ হয়। উক্ত তরল পদার্থ ইচ্ছা ও আবশ্যকমত গাছের গোড়ায় দেওয়া যাইতে পারে।

ঝুল ও ভূসা অতি অল্পদিনের মধ্যেই উদ্ভিদশরীরে কার্য্য করিয়া থাকে কিন্তু তাহার শক্তি অতি অল্পকাল স্থায়ী হয় এবং এক ফসল-কাল মধ্যেই উহার সমুদায় শক্তি ও কার্য্যকারিতা নিঃশেষিত হইয়া যায়। প্রত্যেক ফসলের জন্য উহা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা উচিত।

পলি মাটি।—ঘোলা জলের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ-রাশি ভাসমান থাকে তাহাকে পলি কহে। বর্ষাকালে নদীর জলে ইহা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্ষাকালের জলে পাহাড় ও নানা স্থানের মাটি বিধৌত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং সেই বিধৌত সূক্ষ্ম পদার্থ যে ভূমিতে স্থান পায় তাহাকে পলি-পড়া জমি কহে।

পলি-পড়া জমি সচরাচর অতিশয় উর্ব্বরা হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, উক্ত মৃত্তিকা বা পলি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ পদার্থে পূর্ণ। নানা স্থানের জমি বিধৌত হইয়া মৃত্তিকার সহিত অনেক সার পদার্থ ভাসিয়া আইসে, ফলতঃ যে জমিতে সেই সকল পদার্থ সঞ্চিত হয় তাহাও উর্ব্বরা হইয়া উঠে। পলির সহিত খনিজ ও জৈব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমাণ থাকে, এইজন্য পলি-পড়া জমিতে প্রায় সকল ফসলেরই সুন্দর আবাদ হইয়া থাকে।

নদীর জলেই যে কেবল পলি পড়ে, তাহা নহে। বর্ষার জলে অনেক পুষ্করিণী, খাল, বিল, ডোবা প্রভৃতি অনেক সময়ে ভাসিয়া যায় অর্থাৎ জলের অতিরিক্ততা হেতু জলাশয় সকল পূর্ণ হইয়া উথলিয়া ক্ষেত-পাথার প্লাবিত করিয়া দেয়, তন্নিবন্ধন নানাস্থানের শুষ্ক বা বিগলিত লতা-পাতা, ঘাস-পালা, মল-মূত্র, কীট-পতঙ্গ ও পশু-

পক্ষ্যাদির দেহাবশিষ্ট সেই জলের সহিত মিশিয়া যায়। ক্রমে সেই সকল পদার্থ জমিতে আসিয়া থিতাইতে থাকে। যে সকল পদার্থ জমিতে স্থিতিলাভ করে তাহাই পলি এবং তদ্দ্বারাই ক্ষেত-পাথারের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে নাবাল জমি, উচ্চ জমি অপেক্ষা সারবান হইয়া থাকে। যে সকল ভূমি বর্ষায় জলপ্লাবিত হয়, তাহাতে বিনা সারে দুই তিন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে।

যে জমিতে পলি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, স্থানান্তর হইতে পলি অথবা খাল, বিল বা পুষ্করিণীর মাটি আনিয়া দিতে পারিলে তাহা উর্ব্বরা হইয়া থাকে। সকল প্রকার পলিই যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন করে তাহা নহে। কারণ, অনেক নদী, পলিরূপে বালুকা বহন করিয়া থাকে। ঈদৃশ নদীর জল যে ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পায়, তাহাতে বালুকাস্তর সঞ্চিত হয় কিন্তু উক্ত বালুকাস্তর স্থূল হইলে আবাদী বা আবাদযোগ্য ভূমি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ফলতঃ তাহাতে আর আবাদ করা চলে না। বালুকাবাহিনী স্রোতস্বিনীর জল যাহাতে ক্ষেতে না প্রবেশ করিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

দশম অধ্যায়

ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়। * —সাধারণ কৃষক মাটিকে আল্‌গা করা ভিন্ন মৃত্তিকা কর্ষণের অন্যান্য উদ্দেশ্য অবগত নহে। 'যো' বুঝিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে পারিলে ক্ষেতের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কঠিন মাটিকে ভাঙ্গিয়া আল্‌গা করা কর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহা ব্যতীত, কর্ষণদ্বারা আরও অনেক বিশেষ বিশেষ কার্য্য সমাহিত হয়। ক্ষেতের মাটি বিচলিত হইলে বায়ু, আলোক ও সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা ক্ষেতের উর্ব্বরতা শক্তি সজীব হইয়া উঠে, মৃত্তিকার অসাড়তা বিদূরিত হইয়া তাহা কোমল, স্থিতিস্থাপক ও ক্রিয়াশীল হয়। যে মাটি যত কঠিন তাহাতে সেই পরিমাণে বায়বীয় পদার্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভূগর্ভে প্রচুর সার থাকিতেও তন্মধ্যে যাবৎকাল বায়ু ও সূর্য্যোত্তাপের সমাবেশ না হয়, তাবৎকাল তাহা অসাড় ও নিষ্ক্রিয় থাকে। কোন উদ্ভিদের গোড়ার মাটি কঠিন হইয়া গেলে সে গাছ ক্রমশঃ নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, অবশেষে মরিয়া যায়, কিন্তু সেই নির্জ্জীব উদ্ভিদের গোড়ার মাটি খুরপী বা নিড়েন দ্বারা আল্‌গা ও চূর্ণ করিয়া দিলে পুনরায় সে গাছ সজীব হইয়া উঠে এবং জলসেচন না করিলেও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা হইতে

* 'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' নামক পুস্তকে এতৎ-সম্বন্ধে সমুদায় কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, উদ্ভিদের জীবনরক্ষা-হেতু এবং সুপুষ্টির জন্য মৃত্তিকাকে যত চূর্ণিতাবস্থায় রাখিতে পারা যায়, ততই, মাটি সজীব ও ক্রিয়াশীল থাকে।

মৃত্তিকা কোমল হইলে তন্মধ্যে বায়ু ও সূর্য্যোত্তাপ অবাধে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, তন্নিবন্ধন ভৌতিক ক্রিয়াবলে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এতদ্ব্যতীত, মৃত্তিকার কোমলতা হেতু উদ্ভিদগণ অনায়াসে মৃত্তিকাভ্যন্তরে মূল প্রবিষ্ট করতঃ তন্মধ্যস্থিত সারসম্বলিত রস আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। অতঃপর, ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে উপরিভাগের মৃত্তিকা নিম্নদেশে যায় এবং নিম্নভাগের মাটি উপরিভাগে আইসে। ফসল সংগৃহীত হইলে ফসলের সহিত মৃত্তিকার অনেক সার বা উদ্ভিদখাদ্য বহির্গত হইয়া যায় ফলতঃ, উপরিভাগের মাটি কতক পরিমাণে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। উক্ত আপাতনিঃস্ব মাটি ভিতর দিকে গিয়া পড়িলে তাহার মধ্যস্থিত অবিগলিত পদার্থসমূহ অচিরে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে এবং পরবর্ত্তী ফসল তাহা হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর, অন্য দিকে নিম্নাংশের উদ্ভিদখাদ্য বিগলিত হইয়া উপরিভাগে আসিয়াই উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সামগ্রীর সংস্থান করিয়া দেয় বলিয়া উহা একেবারে নিঃস্ব হইতে পায় না। অনন্তর ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে তদুপরিস্থিত তৃণ জঙ্গলাদি বিনষ্ট হয় এবং তৎসমুদয় পচিয়া গিয়া মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হয়, তন্নিবন্ধনও ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। কর্ষিত মৃত্তিকার কোমলতাহেতু উহা শিশির ও বৃষ্টির জল সমধিক পরিমাণে শোষণ করিতে সক্ষম হয়। স্থূল পদার্থসমূহকে বিগলিত করিয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী করিবার পক্ষে এতদুভয় জিনিসই বিশেষ ফলপ্রদ।

বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিলে মৃত্তিকার ক্রিয়াশক্তি কেন বৃদ্ধি পায় তাহা জানিয়া রাখা উচিত। মৃত্তিকা মধ্যে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে, বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে তাহা ক্রমশঃ বিমুক্ত হইয়া পড়ে অর্থাৎ এলাইয়া যায়, ফলতঃ মৃত্তিকার উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্যথা সে সকল পদার্থ কয়েদীর ন্যায় মৃত্তিকার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে। সারের অন্তর্গত সমুদায় পদার্থ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিলে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ক্রমে তাহাদিগের ঘনতা, তৎসঙ্গে জড়তা—ভাঙ্গিয়া যায়। মৃত্তিকা যতদিন বায়ুমণ্ডলের আয়ত্ত মধ্যে থাকিতে পায়, ততদিন তাহার ক্রিয়াশীলত থাকে, কিন্তু মাটি চাপিয়া গেলে বা কঠিন হইয়া গেলে সে ক্রিয়াশীলতা তিরোহিত হয়।

মৃত্তিকা কর্ষণে অবহেলা করিলে ফসল ভালরূপে জন্মে না—ইহা অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। ক্ষেত্র স্বভাবতঃ যতই উর্ব্বরা হউক, যতই তাহার উৎপাদন শক্তি থাকুক, সুচারুরূপে কর্ষিত না হইলে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না। যিনি যত উত্তমরূপে ও পুনঃ পুনঃ চাষ দিতে পারেন, তিনি তত অধিক কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে পারিলে সার প্রয়োগ করিবার তত প্রয়োজন হয় না। মাটি কোমল ও ধূলিবৎ থাকিলে উদ্ভিদের যত শীঘ্র ও সহজে বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। মাটির স্থূলতা যতই ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে, ততই তাহার অভ্যন্তরস্থিত অব্যবহৃত জৈব ও অজৈব পদার্থসমূহ বাততাপাদির সংস্পর্শে জীর্ণ হইয়া সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে, ফলতঃ প্রত্যেক দানার, প্রত্যেক পরমাণুর নিহিত শক্তি বাহির হইয়া পড়ে। এই সকল পদার্থ কার্য্যকরী হইলেই মৃত্তিকার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই জন্য, মৃত্তিকা যাহাতে উত্তমরূপে কর্ষিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা

উচিত। চাষীদিগের চাষ অপেক্ষা ইহাতে সামান্য অধিক খরচ পড়ে বটে, কিন্তু সুকর্ষিত ক্ষেত্রজাত ফসলের উৎকৃষ্টতা ও পরিমাণাধিক্যে তাহা ঢাকিয়া গিয়াও সমধিক লাভ থাকে।

যে-সে সময়ে ক্ষেত্রে হলচালনা করা বিধেয় নহে। মৃত্তিকা যে সময়ে বড় কঠিন অথবা সিক্ত থাকে, সে সময়ে হলচালনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কঠিন মাটিতে লাঙ্গলের হাল প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং তখন লাঙ্গল দিলে জমির উপরিভাগে আঁচড় পড়ে মাত্র, তদ্দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। সিক্ত জমিতে হলচালনা করিতে চেষ্টা করিলে লাঙ্গলবাহী পশুদিগের বিশেষ কষ্ট হয়। ভিজা মাটির চাপ শুকাইয়া গেলে প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায় সুতরাং মৃত্তিকার এই দুই অবস্থায় হলচালনা করা উচিত নহে। ক্ষেত্র যখন দো-রসা থাকে তখনই চাষ দিবার প্রকৃষ্ট সময়। ভাল 'যো' না পাইলে ক্ষেত্রে লাঙ্গল বা বিদ্ধক বা নিড়েন কিছুই প্রয়োগ করা উচিত নহে। *

মাটি ঢেলা বাঁধিয়া গেলে তাহাতে আবাদ ভাল হয় না। ঢেলাবিশিষ্ট ক্ষেত্রের উদ্ভিদ ভূগর্ভ মধ্যে অধিক দূর মূল প্রসারিত করিতে পারে না, মৃত্তিকারও জল বা বায়ব্য পদার্থ পরিশোষণ করিবার শক্তি হ্রাস হয়। নিতান্ত আবশ্যক হইলে যদি কঠিন জমিতে হলচালনা করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের প্রকৃতি বুঝিয়া ২।১ দিন পূর্ব্বে ক্ষেত্রে উত্তমরূপে জল সেচন করিবার পর তাহাতে লাঙ্গল দেওয়া চলিতে পারে। অল্পায়তন ক্ষেত্রের পক্ষে এ ব্যবস্থা সম্ভবপর কিন্তু বিস্তৃত ক্ষেত্রে অথবা জলশূন্য স্থানে এ ব্যবস্থা চলিতে পারে না। এরূপ স্থলে ক্ষেত্রকে কোদাল দ্বারা

* মাটিতে অধিক রস না থাকে কিম্বা উহা শুকাইয়া কঠিন হইয়া না যায়—এইরূপ মধ্যবিধ অবস্থাকে 'যো' বলে।

কোপাইয়া পরে হলচালনা করাই সুবিধাজনক কিন্তু ইহাতেও মাটিতে অনেক চাপ উৎপন্ন হয়। এই সকল চাপকে মুগ্‌রি, অর্থাৎ মুদ্গর সাহায্যে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করা উচিত, নতুবা বাতাস ও রৌদ্রে তাবৎ চাপ প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায়। ভিজা মাটিতে মুগ্‌রি করা চলে না। *

মাটি চাপ্‌ বাঁধিয়া গেলে ক্ষেত্রের পরিসর অনেক কমিয়া যায়, এবং বীজ বপন করিলে কোন স্থানে অধিক, কোন স্থানে অল্প বীজ পতিত হয়। যে সকল স্থানে চাপ্‌ থাকে, তথায় বীজ দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া চাপ্‌ পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গিয়া আশ্রয় লয়। এই জন্য ক্ষেত্রের অনেক স্থানে ঘনভাবে, অনেক স্থানে পাতলাভাবে বীজ পড়ে এবং তাহারই ফলে ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমভাবে গাছ জন্মে না। এইরূপ অনিয়মিতভাবে বীজ পতিত হওয়া উচিত নহে। যে স্থানে ঘনভাবে গাছ জন্মে, তথাকার গাছগুলি স্থানাভাববশতঃ পার্শ্বদেশে বর্দ্ধিত হইতে না পারিয়া উর্দ্ধভাগে লম্বিত হইয়া উঠে, উপরন্তু বায়ু ও আলোকের অভাবে শীর্ণকায় হয়। ঈদৃশ গাছে কখনও ভাল বা অধিক ফসল হইতে পারে না। অতঃপর গাছ সকলের ঘনতাবশতঃ তথায় নিড়ানী বা খুরপী করা চলে না, তন্নিবন্ধন গাছের গোড়ার মাটি কঠিন হইয়া যায় এবং গোড়ায় তৃণ ও আগাছা জন্মিয়া আবাদী উদ্ভিদের বৃদ্ধি হরণ করে। অন্য দিকে দেখা যায় যে, যে সকল স্থানে মাটির চাপ্‌ থাকে, সে সকল স্থান অনর্থক পড়্‌তি থাকে—ইহাও একটা ক্ষতির মধ্যে গণ্য। তাহা ব্যতীত, বপনকালে অনেক বীজ এমন ভাবে চাপের নিম্নে পড়িয়া যায় যে, তাহারা একেবারেই অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

* এক হাত দীর্ঘ ও ৩।৪ অঙ্গুলি স্থূল কাষ্ঠখণ্ড। ক্ষেতের ঢেলা মাটি ভাঙ্গিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় এবং ইহাকে মুদ্গার বা মুগ্‌রি কহে।

গভীর ও ভাসা চাষের তারতম্য।—মৃত্তিকার পরিগঠন (texlure) এবং ভাবী ফসলের প্রয়োজন বুঝিয়া ক্ষেত্রে গভীর (deep) বা ভাসা (shallow) চাষ দিতে হয়। দেশী হালে যে ভাবে কর্ষিত হয় তাহাতে ৩।৪ অঙ্গুলির অধিক নিম্নের মাটি বিচালিত হয় না এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বস্থান সমভাবে কর্ষিত হয় না, তাহা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহাকে ভাসা-চাষ ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

আবাদী-জমি মাত্রেরই কর্ষণীয় স্তরের একটী নির্দ্দিষ্ট গভীরতা আছে। যে ক্ষেত্রে যেরূপ হাল প্রতি আবাদে নিয়োজিত হয় সে ক্ষেতের কর্ষণীয় স্তর তদুপযোগী গভীর হইয়া থাকে। যে কৃষকের ফাল স্থূল ও ভোঁতা তাহার ক্ষেতের কর্ষণীয় স্তর ২।৩ বা ৩।৪ অঙ্গুলির অধিক গভীর হইতে পারে না। কিন্তু যে কৃষক 'শিবপুর' বা 'হিন্দুস্থান' ব্যবহার করে তাহার কর্ষণ-স্তর ৮-ইঞ্চ বা ১২-অঙ্গুলি পুরু হয়। উক্ত স্তর প্রতি কর্ষণেই বিচালিত হইয়া এমনই কোমল হইয়া থাকে যে, তন্মধ্যে সহজেই 'হিন্দুস্থান' বা 'শিবপুর' প্রবিষ্ট হইতে পারে কিন্তু সে ক্ষেতে ২।৩ আবাদে দেশী ভোঁতা হাল ব্যবহৃত হইলে তাহার স্তরের গভীরতা হ্রাস হইয়া ২।৩ বা ৩।৪ অঙ্গুলিতে পরিণত হইয়া থাকে। ঈদৃশ স্থলে গভীর চাষ ও ভাসা চাষের কোন বিশেষত্ব নাই।

অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, কোন্ ফসল কত গভীর মাটির প্রত্যাশী। যাহাদিগের শিকড় ধান্য গোধূমাদির ন্যায় গুচ্ছমূলক তাহারা ভাসা বা পাত্‌লা স্তরে আপনাদিগের অভাব মোচন করিতে পারে কিন্তু পাট, অড়হর, অধিক কি, মুগ, মটর, সর্ষপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমূল বলিয়া প্রথমোক্ত ফসলের ন্যায় ভাসা স্তরে

সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না, সুতরাং ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত গভীর স্তর দিতে হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

যে সকল ক্ষেত্রের গর্ভদেশ উত্তম মৃত্তিকাপূর্ণ ও গভীর, সে সকল জমি গভীররূপে কর্ষিত হইলে কোনই ক্ষতি হয় না, বরং ভাবী ফসলের বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে। যদি এমন হয় যে, ক্ষেত্রের পৃষ্ঠস্তরের মাটি একবারেই আবাদের অযোগ্য এবং নিম্নস্তরের মৃত্তিকা আবাদের উপযোগী, তাহা হইলে গভীর চাষে উপরের মাটি নিম্নে এবং নিম্নের মাটি উপরে আসিয়া পড়ে, ফলতঃ তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু যদি ঠিক ইহার বিপরীত হয় তাহা হইলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর আবাদী জমির মাটি আবাদের উপযোগীই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে গভীর চাষ দেওয়া ভাল। ক্ষেত্রের উপরিস্তরের মাটি বারম্বার ফসল উৎপাদনহেতু ক্রমশঃ অল্পাধিক শক্তিহীন হইয়া পড়ে কিন্তু গভীর চাষ দিলে অপেক্ষাকৃত নিম্নের মাটি বিচালিত হইয়া উপরিভাগের মাটির সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত হয়, তন্নিবন্ধন ক্ষেত আবার নবশক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

ভূমির পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা নিম্নস্তরের মাটি সচরাচর সারবান হয়, কারণ নিরন্তর চাষ-আবাদের ফলে তথাকার ভূমির পৃষ্ঠদেশের মাটির সার ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং কতক সার স্বতঃই ভূগর্ভ মধ্যে নামিয়া যায়। এই দুই কারণবশতঃ একদিকে পৃষ্ঠদেশের মাটির সার হ্রাস পায়, অন্যদিকে নিম্নের মাটি সারবান হইয়া উঠে।

যাঁহারা মনে করেন যে, গভীর কর্ষণে ক্ষেত অনতিকাল মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগের ধারণা অভ্রান্ত নহে। তবে ভিতরের মাটির অবস্থা অবগত না হইয়া গভীর চাষ দেওয়া উচিত নহে। দেশী হালে গভীর চাষ হয়ই না। বিলাতী 'হিন্দুস্থান' লাঙ্গলের দ্বারা ভূমি

লঘুভাবে কর্ষিত হইলেও ৫।৬ অঙ্গুলির অধিক নিম্নে ফালের মুখ পৌঁছে না, সুতরাং ইহাকেও গভীর চাষ বলা যায় না। কর্ষণ দ্বারা ভূমির ৮।১০ অঙ্গুলি মাটি বিচালিত হইলে উত্তম ভাসা-চাষ বলা যাইতে পারে।

গভীর চাষ দ্বারা আর একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গভীর চাষে উদ্ভিদগণের মূল ভূগর্ভের মধ্যে অধিক দূর পর্য্যন্ত সহজে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় এবং সেই সঙ্গে প্রধান মূল সমূহের গাত্র হইতে বহু সূত্র-মূল ও কৈশিক-মূল উদ্গত হয়। মূল দীর্ঘ এবং সংখ্যায় অধিক হইলে, উদ্ভিদগণ নানাদিক ও অধিক দূর হইতে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আপনার কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হয়। গভীর কর্ষণে এবং মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হইলে মাটি সর্ব্বদা কোমল ও সরস থাকে, তন্নিবন্ধন মাটি শুকাইতে পায় না। অতঃপর, যৌগিক আকর্ষণ-(Capillary attraction) ফলে দিবাভাগে নিম্নদেশ হইতে ক্রমাগত রস উপরিভাগে উঠিতে থাকে, ফলতঃ উদ্ভিদের রসাভাব হয় না। মৃত্তিকা সরস থাকিলে মৃত্তিকাস্থিত তাবৎ পদার্থ ক্রমাগত বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইতে থাকে, মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য গভীর চাষ এবং মৃত্তিকার চূর্ণতা নিতান্ত প্রয়োজন। এতদুভয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিলে ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে জলসেচন ও সারপ্রদানের কাজ হইয়া থাকে। সুচাষ দ্বারা মাটিকে সর্ব্বদা কোমল রাখিতে পারিলে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যৌগিক আকর্ষণে ভূগর্ভস্থ সারসম্বলিত রস উদ্ভিদের আয়ত্তাধীন হয়, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলস্থ বায়ব্য পদার্থ মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

যে ফসলের আবাদ করিতে হইবে, তাহার মূলের প্রকৃতি বুঝিয়া

ভূমি-কর্ষণের তারতম্য করা উচিত। যে সকল উদ্ভিদের প্রধান মূল বা মূল শিকড় (Tap root) মৃত্তিকার নিম্নদেশে অধিক দূর প্রবেশ করে তাহাদিগের জন্য গভীর-কর্ষণ নিতান্তই আবশ্যক। গাজর, মূলা, শাঁকআলু, শকরকন্দ, সিমূলকন্দ, সর্ষপ, অড়হর, তিসি, মসিনা প্রভৃতি দীর্ঘমূল উদ্ভিদের জন্য এক ফুটেরও অধিক গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে পারিলে ভাল হয়। অড়হরের মূল তিন হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে। ধান্য, যব, পেঁয়াজ প্রভৃতি গুচ্ছ-মূল উদ্ভিদের জন্য গভীর চাষের আবশ্যক হয় না। ছয়-ইঞ্চ হইতে নয়-ইঞ্চ গভীর হইলেই চলিতে পারে, কারণ ইহাদিগের মূল-শিকড় নাই, গাছের গোড়া হইতে সূত্রবৎ বহু শিকড় গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হইয়া পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হয়। ইহাদিগের জন্য লঘু বা ভাসা চাষই প্রশস্ত।

গভীর চাষের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, তদ্দ্বারা ভূমি অধিক পরিমাণে জল শোষণ করিতে পারে এবং সেই জল উদ্ভিদগণ বহুদিন পর্য্যন্ত ভূগর্ভ হইতে আহরণ করিয়া থাকে। এই কারণে গভীর কর্ষিত ক্ষেত্রজাত ফসলের শীঘ্র রসাভাব হয় না। ভাষা-চাষের জমিতে অধিক জল শোষিত হইতে পায় না, এইজন্য উহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প রস থাকে, ফলতঃ সহজেই উদ্ভিদগণ রসাভাবে শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

একাদশ অধ্যায়

চলিতমান যুগে কৃষিকার্য্যে কি গবেষণায়, কি মূলতত্ত্বানুসন্ধানে, কি ব্যবহারিক ব্যাপারে, সকল দিকেই, সকল বিভাগেই আমেরিকা যুক্তরাজ্য উন্নতি মার্গে যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে পৃথিবীর কোন দেশে তাহা দেখা যায় না। এইজন্য বর্ত্তমান যুগে কৃষি সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে, কৃষি সম্বন্ধে ব্যবহারিক কিছু শিখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই ঠাকুমার শ্রীমুখ নিসৃত পাতালের অধিবাসীদিগের কৃষিচর্চ্চার সন্ধান করিতে হয়। আমরা নদীমাতৃকা অপিচ বারিমাতৃকা দেশের অধিবাসী। আমরা মেঘ না চাহিতেই বৃষ্টি পাইয়া থাকি, কবে বৃষ্টি হইবে এই আশায় আমরা আকাশ পানে তাকাইয়া থাকি, প্রতিনিয়ত পঞ্জিকা দেখি যে কবে বৃষ্টি হইবে। এই জন্য বারিপাতের অল্পতা দেখিলে কিম্বা তাহার অভাব হইলে আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন করিয়া গবর্মেণ্টকে অন্নসত্র খুলিতে এবং তাগাবী ঋণ দানের জন্য ব্যস্ত করি কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা ভারতের কোন-না-কোন জেলায় প্রতি বৎসর সংঘটিত হইতেছে। ঈদৃশ দুর্ঘটনা বা দৈবদুর্ব্বিপাক কিসে অপসারিত হইতে পারে সে বিষয়ে আমরা কোনও যত্ন করি না। আমাদিগের স্বাভাবিক পরনির্ভরতাপ্রিয়তাহেতু আত্মচেষ্টা দ্বারা বিপদ্‌সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করি না। সে যাহাই হউক, বারিপাতের অভাবে বা অল্পতায় কি উপায়ে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা লইয়া আজকাল আমেরিক-যুক্ত-রাজ্যে খুব আলোচনা, গবেষণা এবং পরীক্ষা চলিতেছে। উক্ত বিষয়টী

ভারতবর্ষে অভিনব নহে, তবে আমাদিগের দেশে উল্লিখিত বিষয়ের মূলমন্ত্র লইয়া কাহাকেও চিন্তা করিতে দেখি না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই মূলতত্ত্বানুরূপ কার্য্য বহু যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই মুলতত্ত্বটি মনে সর্ব্বদা সজাগ থাকিলে এবং তাহা সর্ব্বজনবিদিত হইলে তদানুসঙ্গিক কার্য্য প্রণালীর বহু উন্নতি সাধিত হইত। যে তত্ত্বের কথা বলিতেছি তাহার মূল কথা,—

শুষ্ক ডাঙ্গায় আবাদ।—মেঠো বা ঔদ্যানিক, যে কোন ফসলের আবাদ করা যাউক, সকল ফসলই ভূমি হইতে রস আহরণ করিতে না পারিলে বৃদ্ধিশীল হয় না—ফলফুল বা মুলকন্দাদি ফসল প্রদান করিতে পারে না। বীজ যতই উৎকৃষ্ট হউক, মৃত্তিকা যতই সার-বান হউক, ভূগর্ভ রসপূর্ণ না থাকিলে কোন কাজই হয় না। অনেক দিন বৃষ্টি না হইলে জমি শুকাইয়া যায় ইহাই সকলে জানি কিন্তু দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতই কি ভূগর্ভ এতই শুষ্ক হইয়া যায় যে, তাবৎ মাটি ধুলিকণায় পরিণত হয়? ভূমির পৃষ্ঠদেশ বা surface দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য থাকিলে পৃষ্ঠস্তর অল্পাধিক নীরস হয় ইহা আমরা জানি কিন্তু সেই পৃষ্ঠ-দেশ হইতে ২।৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা অপসারিত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই,—মাটির জমাট আছে, মাটির ভিজে-ভিজে রঙ আছে, এবং স্পর্শ করিলে সে মাটিতে শৈত্যতা অনুভূত হয়। মাটি একবারে নীরস হইলে একগাছি তৃণ অথবা একটী আগাছাও উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কেবল মরুভূমি ব্যতীত সকল স্থানের মাটীতেই অল্পাধিক রস সর্ব্বদাই বিদ্যমান, কিন্তু ভূগর্ভের সে রস কি উপায়ে আমরা ফসলের ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে পারি তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

ভূমি কর্ষিত হইলেই ভূগর্ভস্থ পূর্ব্বসঞ্চিত রস পৃষ্ঠদেশে (surface)

আসিয়া থাকে—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের যে বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ আছে তাহারই ক্রিয়াশীলতার ফলে পৃথিবীর যাবতীয় রস—মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি হইতে ভূপতিত শিশিরকণা পর্য্যন্ত—বাষ্পাকারে নিরন্তর উর্দ্ধগামী হইতেছে। ইহা সূর্য্যের আকর্ষণ ফল।

পৃথিবীতে যে প্রতিবৎসর রাশি রাশি জল বৃষ্টিরূপে নিপতিত হইতেছে তাহা যায় কোথায়? বৃষ্টির তাবৎ জল সাগরে বা নদ নদীতে পতিত হয় না, ভূমিতেও পতিত হয়। আমরা ভূপতিত বৃষ্টির জলের বেশী খবর রাখি না এবং মনে করি যে, সেই জলরাশী নয়াঞ্জুলী বা পগার বাহিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল, কতক বা পাতালে প্রবিষ্ট হইল, অতঃপর তাহা যে পুনরায় আমরা ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে পারি তাহা ভাবিয়া দেখি না। এই জন্যই অল্লাধিককাল বৃষ্টি না হইলেই আমরা প্রমাদ গণিয়া থাকি।

ভূপতিত বারিরাশি নদনদী বা সাগরে গিয়া যতই পতিত হউক, ভূপৃষ্টের শোষণশক্তি অনুসারে কতক জল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়—ইহা স্থির,—ইহা নিশ্চিত। সেই জল অংশুমালীর কিরণসংযোগে বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হইয়া থাকে এবং সেই জন্য বাতাসে অল্লাধিক রস থাকে। ভূগর্ভের পাতাল প্রদেশ হইতে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে বিশাল ছিদ্রপথবিন্যাস জালবৎ প্রসারিত থাকিয়া মৃত্তিকার প্রত্যেক পরমাণুকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা রসে পূর্ণ। সূর্য্যের রশ্মিজাল দ্বারা ভূপৃষ্ঠের রস যত আকর্ষিত হইতে থাকে, পাতালের রস ততই উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে কিন্তু উক্ত রশ্মিজালের আকর্ষণ না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উপরিভাগের রস নিম্নদেশে নামিয়া যায় এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলে ভূমির পৃষ্ঠদেশের রস পাতাল প্রদেশের নিম্নতম স্তরে গিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

এরূপ ত অনেক বৎসর দেখা যায় যে, যখন একাদিক্রমে দুইচারি-

মাস কিম্বা ততোধিক কাল একবিন্দুও বারিপাত হয় না, অথবা যদিও কিছু হয় তাহা নগণ্য, তখন ভূমির উর্দ্ধতন ভাগের সরসতা এতই কমিয়া যায় যে, তদ্দারা উদ্ভিদের বিশেষ উপকার দর্শে না। ভূমির অবস্থা ঈদৃশ নীরস হওয়া কোনমতে স্পৃহনীয় নহে। ভূপৃষ্ঠের আবাদযোগ্য মৃত্তিকাস্তরের মধ্যে সর্ব্বদা, বিশেষতঃ অনাবৃষ্টিকালে, রস মজুত রাখিতে হয়।

ভূগর্ভ সরস রাখিবার উপায়।—ভূগর্ভ বারোমাস সরস রাখিতে হইলে প্রথমতঃ বৃষ্টির তাবৎ বারি ক্ষেত্রমধ্যেই আবদ্ধ রাখা উচিত। যে সকল নিম্নতলপ্রদেশে, কিম্বা যে সকল দেশের বারিপাত সমধিক, তথায় বৃষ্টির জল ভূমিতে পরিশোষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ঈদৃশ দেশ সকল স্বভাবতঃই বহু বারিসেবিত সুতরাং তথায় জল অবরুদ্ধ থাকিলে ভূগর্ভ এতই রসপূর্ণ হয় যে, সেখানে সহজে মৃত্তিকার 'যো' হয় না, ভূগর্ভে তাদৃশ উত্তাপের সঞ্চার হয় না, ছিদ্রপথ সমূহে বায়ু প্রবিষ্ট হইবার উপায় থাকে না, ফলতঃ তাদৃশ ভূমি উৎপাদিকা শক্তির প্রভাব প্রদর্শনে সক্ষম হয় না। কিন্তু, অল্প বারিপাতপ্রদেশে এবং সমুচ্চ স্থানের জমিতে বৃষ্টির জল যত অধিক আবদ্ধ করিয়া ভূগর্ভে পরিশোষিত হইতে দেওয়া যায়, মাটি তত সরস থাকে। এই জন্য দেশের স্বাভাবিক উচ্চতা এবং জমির স্বাভাবিক অবস্থানতার কথা মনে রাখিয়া কোথাও জল বাঁধিতে হয়, আবার কোথাও জল নিকাশ করিয়া দিতে হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে আসাম প্রদেশে যত অধিক বারিপাত হয়, ভারতের কুত্রাপি তেমন হয় না। তথায় বারিপাতের এত প্রাদুর্ভাব বলিয়াই সে প্রদেশে চা আবাদেরও প্রাদুর্ভাব। বহুবারিপাতপ্রদেশে সুচারুরূপে চা'র আবাদ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ

মনে করা উচিত নহে যে বৃষ্টির তাবৎ বারিই চা-ক্ষেত্রে ধৃত করিয়া রাখা হয়। বৃষ্টির তাবৎ বারিই ক্ষেত্র যাহাতে পরিশোষণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কোন সময় 'ডবল-কোড়', কোন সময়ে 'সিঙ্গেল কোড়' প্রণালীতে সমগ্র বাগিচা কুদ্দালিত হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠ এই-রূপে কুদ্দালিত হইলে ভূমির দুইটী উপকার হয়, এবং সে দুইটী উপকারই ভূমিকে অবশ্যই দেয়। ভূমি কুদ্দালিত হইলে নিম্নস্তরের অসাড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, নিম্নস্তরের সহিত সূর্য্যের রশ্মির এবং বায়ুমণ্ডলের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হয়। ভূপৃষ্ঠ কুদ্দালিত হইলে নিম্নস্তরে বাতাস প্রবেশের পথ প্রশস্ত ও অবাধ হয় এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে নিম্নস্তরের মাটিতে বায়ুমাণ্ডলিক নাইট্রোজন নামক বাষ্পীয় পদার্থ প্রবেশলাভ করিতে পারে। সে স্তরে যে সকল জৈব ও অজৈব উদ্ভিদের খাদ্যরাশি এতদিন উদ্ভিদের আহরণের অযোগ্যরূপে অবস্থান করিতেছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে বিগলিত হইতে থাকে এবং দিন দিন উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া উঠে। অতঃপর—

কুদ্দালিত বা কর্ষিতক্ষেত্রে সূর্য্যের কিরণসম্পাত হইলে ভূগর্ভের নিম্নতম দেশের সঞ্চিত রসরাশি ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বাষ্পাকার ধারণ-পূর্ব্বক আকাশে গিয়া মিলিত হয়। এতদ্দ্বারা নিকটস্থ সমগ্র ভূগর্ভে একটা সাড়া পড়িয়া যায়, ভূগর্ভের রসের পরিক্রমণ-ক্রিয়া প্রবল হয়, ভূগর্ভের অনেক রস শুকাইয়া যায়, কিন্তু মাটী নীরস হয় না বরং যতই রসের উৎক্ষেপ অধিক হয় উপরিভাগের মাটী ততই সরস ও ঝুরা হয়।

কুদ্দালনফলে ভূমির যে উপকার হয় তাহা অতি সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইল কিন্তু আসাম প্রদেশের ন্যায় অত্যধিক বারিপাত-প্রদেশে উক্ত উপায় দ্বারাই ভূগর্ভের রস হ্রাস হয় না সুতরাং তথায় ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে গভীর নয়াঞ্জুলী খনন করিয়া ভূগর্ভের রসের বাহুল্যাংশ বহিষ্কৃত

করিয়া দিতে হয়। এতদর্থে যে সকল নয়াঞ্জুলী খোদিত হয় তৎসমুদায় তাদৃশ প্রশস্ত নহে—অধিক কি, ২।৩ ফুটের অধিক নহে কিন্তু তাহাদিগের গভীরতা—জমি বিশেষে ও মৃত্তিকা বিশেষে—২।৩ ফুট হইতে ১০।১৫ ফুট পর্য্যন্ত নাবাল হইয়া থাকে। এইরূপ পগার থাকিলে উহার পার্শ্বদেশ হইতে মাটি চুয়াইয়া বা prcolation দ্বারা নয়াঞ্জুলীর তলাচি (bottom level) সমতুল্য তাবৎ ভূমিখণ্ডের রস সেই পগারে আসিয়া পড়ে। ঈদৃশ উপায় অবলম্বন না করিলে ক্ষেত্রের রস নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় না। এতদুপায়ে যে কেবল বর্ষার জল ভূগর্ভ হইতে নিকাশ করিয়া দেওয়া হয় তাহা নহে, ভূগর্ভের পূর্ব্বসঞ্চিত রসকেও নিকাশ করিয়া দেওয়া হয়। বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার ২।৪ মাস পরেও অর্থাৎ শীতকালে, অধিক কি গ্রীষ্মকালেও দেখিয়াছি—নয়াঞ্জুলীর পার্শ্বদেশ হইতে ভূমির রস চুয়াইয়া পড়িতেছে।

বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলেও এত জল কোথা হইতে আসিয়া নয়াঞ্জুলীতে দেখা দেয় ইহা আপাততঃ বিস্ময়কর মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখা যায়, লঘুগুরুনির্ব্বিশেষে সকল জিনিসই মাধ্যাকর্ষণের অধীন। মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) সকল জিনিসকেই স্বীয় কেন্দ্রে আনিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সে কেন্দ্রবিন্দু যে কোথায় তাহা আমরা জানি না, হয়ত—ভবিষ্যতের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক তাহা আবিষ্কৃত হইবে। সে যাহা হউক, ইহা আমরা অবগত আছি যে, সজীব ও নির্জীব—সকল পদার্থই পৃথ্বীতলের দিকে নিরন্তর আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য বৃষ্টির জল ঊর্দ্ধদিকে উড্ডীন না হইয়া পৃথ্বীতলে আসিয়া স্থান পায় এবং ক্রমে ভূগর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর সূর্য্যের আকর্ষণে বাষ্পাকার ধারণ করতঃ বায়ুমণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সে আশ্রয় গ্রহণ

ক্ষণিক বা অস্থায়ী কারণ, সেই বাষ্পরাশি পুনরায় শিশির ও বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে আসিয়া স্থান পায়। এইরূপে প্রতিক্ষণ বায়ুমণ্ডলও ভূগর্ভের পরস্পর আদানপ্রদান চলিতেছে।

এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বৃষ্টির জল ভূগর্ভ মধ্যে রক্ষা করিতে পারিলে প্রয়োজনকালে সেই জল পুনরায় ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে পারা যায়। অতএব বৃষ্টির জল ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইতে না পারিলে ক্ষেত্রেই তাহা সঞ্চিত থাকে এবং ভূপৃষ্ঠের শোষকতা থাকিলে তাবৎ জলই ভূগর্ভমধ্যে শোষিত হইতে পারে কিন্তু ভূপৃষ্ঠের অবস্থা—স্বভাবতঃ হউক কিম্বা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হউক—যদি উত্তম পরিশোষক বা porous হয় তাহা হইলে ভূপতিত তাবৎ জলই ভূগর্ভ মধ্যে প্রবেশলাভ করিবে অন্যথা ক্ষেত্রান্তরে বা স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে। ভূপতিত বারি ক্ষেত্র হইতে নির্গত হইবার পথ না পাইলে কিম্বা ক্ষেত্রমধ্যে শীঘ্র পরিশোষিত হইতে না পারিলে যথাস্থানে সঞ্চিত থাকিয়া সূর্য্যের আকর্ষণে বায়ুমণ্ডলে গিয়া আশ্রয় লাভ করিবে। ভূগর্ভস্থ যে জলরাশি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে গিয়া স্থান পায়, তাহার উপর ক্ষেত্রস্বামীর কোন অধিকার থাকে না, কারণ সে বাষ্প বায়ুপ্রবাহে কোন গ্রাম-গ্রামান্তরে বা কোন্ দেশ-দেশান্তরে গিয়া পড়িবে তাহা কে জানে? কিন্তু,—

ভূগর্ভ মধ্যে যে বারি প্রবিষ্ট হইতে পায় তাহার উপর ক্ষেত্রস্বামীর পূর্ণ অধিকার থাকে। প্রকৃতিদত্ত উক্ত মহাভাণ্ডার হইতে অপর কেহ এক বিন্দুও রস চুরি করিতে সক্ষম হয় না, তথাপি আমরা সে বারিরাশির ব্যবহার করিতে জানি না। ২।৪ মাসকাল অনাবৃষ্টি হইলেই আমরা প্রমাদ গণিয়া থাকি এবং সে প্রমাদের পরিমাণ এত অধিক মনে করি যে, ফসল রক্ষা করিবার, কিম্বা বীজ বপন করিবার

অথবা ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া পরবর্ত্তী ফসলের জন্য জমি তৈয়ার করিবার যেন কোন উপায় নাই। উদ্যমহীন ও অলস ব্যক্তিগণই বিপৎপাতের আশঙ্কায় হাল ছাড়িয়া দিয়া হা-হুতাশ করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না বরং কল্পিত বা দমনীয় বিপদকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে বিহ্বল না হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার ফলে হয় ত বিপদ একবারেই কাটিয়া যাইবে কিম্বা আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি না হইলেও চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হইবে না ইহা স্থির।

ভূমি সুকর্ষিত থাকিলে বৃষ্টির তাবৎ জলই ধরিত্রীপৃষ্ঠ শোষণ করিয়া লয় এবং সুকর্ষণ দ্বারাই ভূগর্ভের রস ভূমির পৃষ্ঠদেশে উঠিবার সুযোগ পায়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠ বারম্বার কর্ষণ ফলে বারমাস সরস থাকে। কিন্তু যে মাটী উদ্ভিজ্জ পদার্থের অভাব বা ন্যূনতা দেখা যায় তাহার মাটী সুকর্ষিত হইলেও, রস বিক্ষেপনে তাদৃশ তৎপর হইতে পারে না। মাটীতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ না থাকিলে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে মাটী নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত পদার্থ অজৈব বা inorganic দানা পরস্পরের মধ্যে থাকিতে পাইলে মৃত্তিকার capillay system বা ছিদ্রপথবিন্যাস অপেক্ষাকৃত অধিক ক্রিয়াশীল থাকে, জৈব দানা সকল উন্মার্গগামী রসকে অল্পাধিক-কাল দেহ মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ কর্ষিত ও কোমল থাকিলে আবাদযোগ্য মৃত্তিকাস্তর সরস থাকে, এবং জৈব পদাথ (organic matters) সম্বলিত থাকিলে মৃত্তিকার সেই সরসতা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে।

অনাবৃষ্টিকালে আবাদ করিতে হইলে ভূমির পৃষ্ঠস্তর সরস রাখিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে বৃষ্টির তাবৎ বারি যাহাতে ভূগর্ভে পরিশোষিত

হইতে পারে, সে জন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে আল দিতে হইবে এবং ভূপৃষ্ঠকে সমতল ও সুকর্ষিত রাখিতে হইবে।

ভূমিকে উল্লিখিত উপায়ে নিরন্তর সরস রাখিতে পারিলে বিনা জলে বা বিনা বারিপাতে আবাদ করা চলিতে পারে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এ উপায়ে এদেশে আবাদ হয় কি না ?

মাটী সর্ব্বদা নিরতিশয় রসাল থাকিলে তদুৎপন্ন ফসলের মূলসকল ভূগর্ভ মধ্যে অধিক নিম্নে প্রবিষ্ট না হইয়া পার্শ্বদেশেই অল্পাধিক বিস্তৃত হয়। কিন্তু মাটীর উপরিস্তর অপেক্ষাকৃত নীরস হইলে উদ্ভিদের মূল ভূগর্ভ মধ্যে অধিকদূর প্রবেশ করিবার প্রয়াস পায়। ইহার ফলে দুইটী কাজ হয়, প্রথমতঃ মূলের সংখ্যা ও বিস্তার অধিক হয়, তাহার ফলে তাহারা সমধিক খাদ্য আহরণ করিতে সমর্থ হয় ; দ্বিতীয়তঃ পৃষ্ঠস্তর অপেক্ষা নিম্নস্তর হইতে মূলগণ অধিক রস শোষণ করিবার সুযোগ পায়। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, উদ্ভিদের শিকড় যত অধিক হয় এবং যত অধিকদূর ধাবিত হয় মাটীর অভ্যন্তর দেশ তত সুড়ঙ্গময় হয়,—তন্মধ্যে তত বায়ুপ্রবেশ করিতে পারে, সেই সঙ্গে আকাশমণ্ডলের বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থনিচয়, যথা—নাইট্রোজেন, কার্ব্বন প্রভৃতি ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ পায়।

আমাদের রবি বা চৈতালী ফসল,—সর্ষপ, গোধূম, ডাল-কড়াই, ষাঠি ধান, নানাবিধ তরিতরকারি—পটোল, ফুটী তরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি বহু ফসল বৎসরের বারিহীন কালে বা ঋতুতে আবাদিত হইয়া থাকে।

শুষ্ক মাটীতে বীজের উপ্তি।—শুষ্ক মাটীতেও বীজ উপ্ত হইতে পারে যে, তাহার দুইটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ দেখা যায় মাটী যতই শুষ্ক, যতই নীরস হউক, ভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিলে তন্নিম্নস্থ

ভূমির রসোদ্গার-(evaporation) কালে ভূমির রস উপস্থিত শুষ্ক মাটী ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে, ফলতঃ উপরের শুষ্ক মাটীতে স্বতঃই রসের সঞ্চার হয়। ইহা ভূগর্ভস্থ রসের বিক্ষেপ বা উদ্গার (evaporation) অনন্তর ইহাও দেখা যায় যে, নির্জ্জলা শানের-মেজেয় কিম্বা কোন শুষ্ক প্রস্তর খণ্ডে অথবা কোন ধাতু পাত্রে অল্প পরিমাণ মাটী রাখিয়া দিলে ক্ষণকাল মধ্যে তাহার মধ্যে রসের সঞ্চার হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে, এরূপ অবস্থায় ধাতুপাত্রস্থিত মাটীতে কিরূপে রসের সঞ্চার হয়। মরুভূমি ব্যতীত অপর সকল স্থানের বায়ুমণ্ডল নিয়ত অল্পাধিক সরস দেখিতে পাওয়া যায়। ঋতুবিশেষে বায়ুমণ্ডলের রস কম বা বেশী হইয়া থাকে এবং সেইজন্য গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়, আবার শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালের বায়ুমণ্ডল আরও সিক্ত থাকে। অতঃপর ইহাও নিত্য দেখা যায় যে, দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে বায়ুমণ্ডলে রস অধিক থাকে। এই সকল ঘটনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই অল্পাধিক রস থাকে।

বায়ুমণ্ডলস্থ রসের মূল কি বা কোথায়?— বায়ুমণ্ডলস্থ রসের মৌলিক পদার্থ বা উপাদান বারিকণারাশি মাত্র। উহারা ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্রাংশরূপে এবং অবিভাজ্যাকারে বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়। দিবাভাগে সূর্য্যের কিরণসম্পাতফলে ধরিত্রীপৃষ্ঠ হইতে যাবতীয় রসযুক্ত জীবোদ্ভিদ ভূমিজলাশয়াদি হইতে বাষ্পাকারে রাশি রাশি রস আকাশে গিয়া স্থান পাইতেছে। সেই বাষ্পাকারধারী জলকণারাশি শিশির, রস বা বারিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। ধরিত্রী সেই রস শোষণ করিয়া লয়। যে দেশে বাষ্পোদ্গার নাই তথায় শিশির নাই, বৃষ্টি নাই এবং তাহাই মরুভূমি। এতৎসম্পর্কে আর একটী কথা মনে হইতেছে তাহা—

মৃত্তিকার বায়ুমাণ্ডলিক রসাকর্ষণ শক্তি।—উক্ত শক্তি ইংরাজীতে hygroscopicity নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত শক্তি,—যদি তাহা মৃত্তিকার একটা শক্তি হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত শক্তি মৃত্তিকার নিজস্বঃ কি না? আমাদের নানাবিধ গৃহস্থালী দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে কতকগুলি সামগ্রী ঠাণ্ডা বাতাস সংস্পর্শিত হইলে রসিয়া যায়। শর্করা, লবণ, সোরা প্রভৃতি কয়টী সামগ্রী বায়ুমণ্ডলের রসাকর্ষণে বড়ই তৎপর। এই কারণে উল্লিখিত পদার্থত্রয়কে সর্ব্বদা - বিশেষতঃ বর্ষার দিনে—অতি সাবধানে আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। ব্লটিং কাগজ বর্ষাকালে স্বতঃই অল্পাধিক রস-সংযুক্ত হইয়া যায়। মৃত্তিকাও উক্ত নিয়মের অধীন। যে মাটীতে উদ্ভিজ্জ বা জৈবীক পদার্থ (organic matters) অনবস্থিত তাহার রস-পরিশোষণ-শক্তি থাকে না। যাহাকে প্রকৃত মৃত্তিকা বলা যায় তাহাতে জৈব পদার্থ অবশ্যই থাকিবে এবং তাহার অভাবে মাটীকে মাটী নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। কৃষির হিসাবে যাহাতে জৈব পদার্থের অভাব, তাহাকে মৃত্তিকা বলিতে পারি না। কৃষিকার্য্যোপযোগী মাটীতে উদ্ভিদখাদ্য বর্ত্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত পদার্থই মৃত্তিকার 'জান্' বা heart, কারণ মৃত্তিকায় উহা বর্ত্তমান না থাকিলে মৃত্তিকার কোনই কার্য্যক্ষম শক্তি থাকে না। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ থাকে বলিয়া উহাতে বায়বীয় পদার্থের সঞ্চার হয়, বায়ুমণ্ডলের রস মাটীতে সঞ্চিত হয়, ভূগর্ভে জীবাণুর উদ্ভব হয়। সেই জীবাণুগণ মৃত্তিকার উপাদান সমূহকে বিগলিত হইতে সমর্থ করে, বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যের সংস্থান বিষয়ে সহায়তা করে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, মাটী যতই শুষ্ক হউক, উহাতে অবশ্যই রস সঞ্চিত হয়। কিয়ৎ পরিমাণ মৃত্তিকা উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক

করতঃ একস্থানে স্তূপীকৃতভাবে রাখিয়া দাও, দেখিবে ক্ষণকাল পরে তাহাতে রসের সঞ্চার হইয়াছে। সে রস যৎসামান্য হইলেও তাহাতে যে বীজ বপন করা যায় তাহা স্ফীত হয়, অঙ্কুরিত হয়। তাহা ব্যতীত, সকল বীজের মধ্যেই রস থাকে এবং বপিত বীজের পক্ষে সেই রস আপাততঃ যথেষ্ট। শুষ্ক মাটীতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার ইহাই কারণ। ঈদৃশ অবস্থায় মাটীতে অতি অল্প রস থাকে বলিয়া বপনের পূর্ব্বে মৃত্তিকা বিশেষে অল্লাধিক জলসেচন করিলে বীজ অঙ্কুরণের পক্ষে সুবিধা হয়, অঙ্কুরিত বীজ শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পোয়ালি বা চারা সকল পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিশীল হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

আবাদ পর্য্যায়।—ভূমিকর্ষণ, ক্ষেত্রে সারপ্রদান, উৎকৃষ্ট বীজের সংস্থান প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের প্রতি কৃষিকর্ম্মনিরত ব্যক্তির যেরূপ বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত, ফসলের পর্য্যায় (Rotation) বিষয়েও সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন। কোন্ ফসলের পরে সেই ক্ষেত্রে কোন্ ফসলের আবাদ করিলে সফলকাম হওয়া যায় অথচ ক্ষেত্রেরও

কোন ক্ষতি না হয়, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। একই ক্ষেত্রে ফসলের পর ফসল উৎপন্ন করিবার নাম—পর্য্যায়।

একই ক্ষেত্রে একই ফসলের কিম্বা তৎপ্রকৃতিগত ফসলের পুনঃ পুনঃ আবাদ হইলে, ভূমি ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়, সুতরাং ফসলের পরিমাণ ও পুষ্টি হ্রাস হইয়া আসে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সেই ফসলের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির উপযোগী পদার্থসমূহ মৃত্তিকায় হ্রাস পাইতেছে। ইহা যে নূতন কথা তাহা নহে। যখন জমির খাজনার হার অল্প ছিল কিম্বা প্রচুর জমি পাওয়া যাইত, তখন কৃষক ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে 'পতিত' জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, কৃষকের সুবিধামত নিকটবর্ত্তী স্থানেও জমি পাওয়া দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ফলতঃ এক ক্ষেত্রেই বারম্বার আবাদ করিতে কৃষক বাধ্য হয়। গারো, নাগা, মিসৃমি প্রভৃতি পাহাড়ীগণ এখনও প্রায় প্রতি বৎসর ক্ষেত্রান্তরে আবাদ করিয়া থাকে। তথায় অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, পতিত জমিও বিস্তর, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে প্রতি বৎসর নূতন জমিতে আবাদ করা সহজ কথা, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, অগত্যা আমাদিগকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র-মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় এবং সেই সকল ক্ষেত্রের শক্তি বজায় রাখিয়া কাজ করিতে হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, মৃত্তিকার উৎপাদন শক্তির হ্রাস হয় কেন? যে কোন ফসলের আবাদ করা যাউক, তাহার বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও ফলনে ভূমি হইতে কতকগুলি সামগ্রী যে বহির্গত হইয়া যায়, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। উপরন্তু ইহাও কেহ মনে করিতে পারেন যে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের অভাব ও প্রয়োজন, একই, কিন্তু তাহা নহে। কোন জাতীয় উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান,

কোন জাতীয় উদ্ভিদ ফস্‌ফরিক্‌-এসিড, কোন জাতীয় উদ্ভিদ পোটাসিয়ম, কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ চুণ, সমধিক পরিমাণে আহরণ করিয়া থাকে। যে ফসল ফস্‌ফরিক-এসিড অধিক আহরণ করে তাহার সহিত উক্ত পদার্থ ক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। এই প্রকারে যে ফসলে যে পদার্থের প্রাধান্য থাকে, তাহার সহিত সেই পদার্থ সমধিক পরিমাণে চলিয়া গেলে, ক্ষেত্র সেই পদার্থের পরিমাণ হ্রাস হয়। তৎপরবর্ত্তী ফসলও যদি তদনুরূপ ফস্‌ফরিক-এসিডগ্রাহী হয়, তাহা হইলে সে ফসল পূর্ব্ববর্ত্তী ফসলের ন্যায় সমপরিমাণে সেই পদার্থ আহরণ করিতে পায় না, ফলতঃ তাহার পরিবৃদ্ধি, পরিপুষ্টি বা ফলন-ফুলন আশানুরূপ হয় না। আর একটী কথা আছে। সম্মিলিত পদার্থের সমষ্টি হইতে কোন একটী পদার্থ বিভিন্ন হইয়া গেল অপরাপর পদার্থ দ্বারা তাহার স্থান পরিপুরিত হইয়া থাকে এবং সেই হেতু ফস্‌ফরিক-এসিড সমুদায় বা কিয়দংশও চলিয়া গেলে অপরাপর পদার্থের প্রাধান্য হইবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, ফলতঃ তজ্জাত উদ্ভিদের সকল অভাব পূর্ণ হইবে না, অধিকন্তু অপরাপর পদার্থের প্রাধান্যহেতু হয়ত তাহার বৃদ্ধি অধিক হইবে, ফলন অধিক হইবে না, ইত্যাদি নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এ স্থলে কেবল ফস্‌ফরিক-য়্যাসিডের নামোল্লেখ করিলাম। অপরাপর উপাদান সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। সুতরাং প্রতিবার একই ক্ষেত্রে একই ফসলের আবাদ করিলে প্রতিবার তাহাতে যে প্রকারের ও যে পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইবে, তৎপরবর্ত্তী আবাদে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অল্প ফসল জন্মিবে। তৃতীয়বার তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অল্প ফসল উৎপন্ন হইবে এবং চতুর্থ বা পঞ্চমবারে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইবে কিম্বা ফসল উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু, সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন-

প্রকৃতি ফসলের আবাদ করিলে, তাহার ফসলের পরিণাম বা গুণের লাঘব না হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইক্ষুক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৎসর ইক্ষুর আবাদ করিলে ফসল ভাল হয় না এবং ইক্ষুরসে শর্করার ভাগ কমিয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর উক্ত ক্ষেতে অড়হর, মটর, বাকৃলা, নীল, বুট, ধঞ্চে বা অপর কোন সিম্বীক উদ্ভিদের আবাদ করিলে সে জমীর কোন ক্ষতি হয় না। বরং ইহাদিগের আবাদ হইবার সময় ভূগর্ভমধ্যে সমধিক পরিমাণে যবক্ষারজানের সমাবেশ হয়, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভস্থ আপাত-অজীর্ণ ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড, পোটাসিয়াম প্রভৃতি বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার সে অভাব দূর করে। অনন্তর, ভিন্ন ফসলের দীর্ঘকাল অবস্থান হেতু সেই ক্ষেত্রস্থিত ইক্ষুর উপযোগী বিশেষ বিশেষ পদার্থ সমূহ অবসর পাইয়া ভৌতিক ক্রিয়াযোগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা পুনরায় ইক্ষু বা তৎপ্রকৃতি-বিশিষ্ঠ জুয়ার, ভুট্টা, প্রভৃতি ফসলের উপযোগী হয়। ক্ষেত্রকে দুই-চারি বৎসর অন্তর বিশ্রাম বা জীরেন দিবার অর্থাৎ 'পতিত' রাখিবার প্রথা আছে, কিন্তু অধুনা কৃষকগণ তাহা আর পারে না, এই জন্য অপর ফসলের আবাদ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যোদ্ধার করিয়া লয়, তাহাতে ক্ষেতের কোন উপকার হয় না। যে উদ্দেশ্যে ফসল পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে, ক্ষেতকে অনাবাদ রাখিবার উদ্দেশ্যও তাহাই।

ফসল সংগৃহীত হইলে ফসলের অন্তর্গত পদার্থরাশি পুনরায় ক্ষেত্রে আসিয়া সঞ্চিত হইতে পায় না, বরং নানা দেশদেশান্তরে যায়, কিন্তু সেই ফসল সংগৃহীত না হইয়া যদি যথাস্থানে থাকিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইতে পায়, তাহা হইলে সেই সকল ফসল ভোজনকারী জীব-দিগের শোণিত, শিরা, অস্থি, মাংস, কেশ, লোম, নখ, পক্ষ ও পুরীষাদি ক্ষেত্রে আসিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা হইলেও মৃত্তিকাস্থিত সামগ্রী রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসে কিন্তু সে সম্ভাবনা না থাকায় লোকে ক্ষেত্রে সার

প্রদান করিয়া অপসৃত অংশ পুনরায় পূরণ করিয়া দেয়, কিম্বা ক্ষেত্রকে বিশ্রাম দিয়া ধরিত্রী গর্ভস্থিত অটুট পদার্থ সমূহকে (solid matters) উদ্ভিদের আহরণোপযোগী করিয়া লয়। ধরিত্রী মাতা অতি বড়লোকের মেয়ে, তাঁহার ধনরত্নপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডার কখনও নিঃস্ব হয় না। ফসল বিশেষের জন্য কোন কোন পদার্থের বিতরণ কিছুদিন বন্ধ থাকে মাত্র।

এক ফসলের পরে অন্য প্রকার ফসলের আবাদ করিলে শেষোক্ত ফসলের তত অভাব হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল বর্গীয় উদ্ভিদের প্রয়োজন একই রকমের নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ফসল মৃত্তিকা হইতে যে যে পদার্থ বহু পরিমাণে আহরণ করিয়াছে, পরবর্ত্তী ভিন্ন বর্গীয় ফসলের সে সমুদয় সামগ্রীর তত প্রয়োজন না থাকায় শেষোক্ত ফসল পূর্ব্বনিঃশেষিত বিশেষ বিশেষ পদার্থের অভাব অনুভব করে না। অতঃপর আর একটী কথা আছে। ধান্য গোধূমাদি গুচ্ছমূল (Fibrous roots) জাতীয় উদ্ভিদের মূলগণ ভূগর্ভমধ্যে অধিক নিম্নে যাইতে পারে না—উপরিভাগের মৃত্তিকা হইতে আপনাপন আহরণীয় পদার্থ পরিশোষণ করিয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু শন, পাট, অড়হর প্রভৃতি দীর্ঘমূল উদ্ভিদের মূলগণ ভূগর্ভ মধ্যে অনেক নিম্নে প্রবেশ করে, ফলতঃ তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্ন হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, উপরিভাগের মৃত্তিকার উপর তাহাদিগের তত পীড়ন নাই। এই জন্য তন্তু-মূল উদ্ভিদের পরবর্ত্তী ফসল বিভাগমূলক * উদ্ভিদ হওয়া উচিত। সংক্ষেপে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে,

* উদ্ভিদের যে সকল শিকড় ভূগর্ভ মধ্যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে তাহাই বিভাগমূলক। এইরূপ শিকড়যুক্ত উদ্ভিদকে দ্বৈদালীকও বলা যায়।

একবীজদল (Monocotyledenous) উদ্ভিদের মূল,—তন্তুগুচ্ছবৎ এবং দ্বিদল (Dicotyledenous) উদ্ভিদের মূল—দ্বৈভাগিক বা শাখামূলক হয়।

নাবাল ও ডোবা জমিতে পর্য্যায় প্রণালীর কোন আবশ্যক দেখা যায় না, কারণ সে সকল জমি বর্ষাকালে প্রায় ডুবিয়া যায়, প্রায় বন্যাতে প্লাবিত হয়। এতন্নিবন্ধন ঈদৃশ ক্ষেত্র বারোমাস স্বতঃই উর্ব্বরা থাকে। এই সকল কারণে প্রতি বৎসর একই ক্ষেত্রে ধান্য, পাট প্রভৃতি অর্দ্ধ-জলজ ফসলের আবাদ হইয়া থাকে। ইহাদিগের জন্য ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না। বন্যা বা বর্ষার আতিশয্যবশতঃ ক্ষেত-পাথার ভাসিয়া গেলে তাহাতে পলি পড়ে, সুতরাং তদ্দ্বারা ক্লান্ত ভূমির সমূহ উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয়। উপরন্তু, রসাধিক্যবশতঃ মৃত্তিকার স্থূল পদার্থ সমূহ নিরন্তর বিগলিত হইতে থাকে, সুতরাং তজ্জাত উদ্ভিদের কোন আহার্য্যের অভাব হয় না।

উত্তমাধম বারিপাত অনুসারে দেশবিশেষের ক্ষেত সমূহের উর্ব্বরতা অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। উত্তম ক্ষেতে সম্বৎসর মধ্যে তিনটা ফসল, মধ্যম প্রকার জমিতে দুইটী এবং নিকৃষ্ট জমিতে একটীর অধিক ফসল ভালরূপে উৎপন্ন হয় না। ইহার মধ্যে আবার একটু বিশেষত্ব আছে। আসাম অঞ্চলে এমন কোন কোন জেলা আছে যথায় বর্ষাকালে এত অধিক বারিপাত হয় যে, ক্ষেত প্রায় ৮।৯ মাস কাল জলে ডুবিয়া থাকে এবং তাহাতে কেবল মাত্র ধান্য জন্মিয়া থাকে। জলের আধিক্য হেতু সে সকল ক্ষেত হইতে গোড়া ঘেঁসিয়া ধান কাটা চলে না—তথাকার ধান্যের কেবল শীষগুলি কাটিয়া আনা হয়। তাদৃশ ক্ষেতের খড় জলের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিয়া ও পচিয়া প্রতি বৎসরই ক্ষেতের উর্ব্বরতা রক্ষা করে এবং সে সকল জমিতে প্রচুর ফসল

উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ জমিতে পর্য্যায় পদ্ধতিতে আবাদ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। পার্ব্বত্য জঙ্গলময় প্রদেশে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে সমধিক বারিপাত হয় কিন্তু সে সকল স্থান গড়েন বলিয়া জল সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে না, পরন্তু বারিপাতের আধিক্যহেতু মাটীতে রসের অভাব হয় না। ত্রিপুরা অঞ্চলে এ প্রকারের প্রভূত জমি আছে এবং তাহাতে বৎসরে তিনটী ফসল সুচারুরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল বেলে বা কঙ্করময় ও উচ্চ জমিতে রসাভাব-বশতঃ মাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সময়ে কোন ফসলের আবাদ হয় না তাহাদিগকেই আমরা নিকৃষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

আবাদের পর্য্যায় সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। কোন্ জেলায় কি কি ফসল উৎপন্ন হয় কিম্বা ক্ষেত্রস্বামী কোন্ ফসলের আবাদ করিবেন, কোন্ ফসল কোন্ ক্ষেতে কিরূপ ফল প্রদান করিবে, এ সকল নির্দ্দেশ না করিয়া বাঁধা-ধরা ও মন-গড়া একটা তালিকা করিয়া দিলে অনেক স্থলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, গুচ্ছমূলক উদ্ভিদের পরে দৈদালিক বা দ্বিভাগমূল, কন্দমূলের পরে ভাসা-মূল ফসল দেওয়া যাইতে পারে। ইক্ষু ও তামাকের পরে অড়হর; আউশ বা ভাদুই ফসলের পরে, আলু, গোধূম, সর্ষপ, বুট, তিসি প্রভৃতি দিতে পারা যায়। প্রত্যেক জেলাতেই পর্য্যায়ের একটা পদ্ধতি আছে, তাহা স্থানীয় কৃষকগণের পুরুষপরম্পরাগত অভিজ্ঞতা জনিত। ইহাদিগের প্রণালী বিচারসাপেক্ষ ভাবে অবশ্য অবলম্বনীয়।

অনেক স্থলে মিশেল ফসলের (mixed crops) আবাদ হইয়া থাকে এবং তাহাতে পর্য্যায়-আবাদের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সংরক্ষিত

হয়। রবি ও ভাদুই,—দুই ফসলের সময়েই ক্ষেত্রবিশেষে ৩।৪ প্রকার বিভিন্ন ফসলের বীজ একত্র বপিত হইয়া থাকে। চিনিয়া বা চিনে শ্যামা, কাঙ্নি বা শিয়ালল্যাজা, মাড়ূয়া, বুট প্রভৃতির যে কোন দুইটীর সহিত অড়হর, এরণ্ড বা কাপাস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত যে কয়টি ফসলের নাম করিলাম, তাহারা অল্পকালস্থায়ী,—শ্রাবণ হইতে ভাদ্র মাসের প্রথমভাগেই তাহাদিগকে গৃহজাত করিতে হয়। অনন্তর অড়হর, এরণ্ড, কাপাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে থাকিয়া যথাসময়ে ফসল প্রদান করে। রবি শস্যের মধ্যে গোধুমের সহিত তিসি, সর্ষপ, বুট প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া হয়। মিশ্র-আবাদে একটি লাভ দেখা যায় যে, ৩।৪ প্রকার ফসলের আবাদ করিবার জন্য আর স্বতন্ত্রভাবে ক্ষেত তৈয়ার করিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত দৈববশে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে ক্ষেত হইতে ২।৩টী ফসলের মধ্যে একটীরও ফসল নিশ্চিত পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। এতদ্দ্বারা পর্য্যায়ের কি সুবিধা হয়, তাহা দেখিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন আহারীয় দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনটী তিন রকমের উদ্ভিদ মৃত্তিকার ভিতর হইতে আহারীয় তুলিয়া উপরে আনিতেছে এবং তিন জনে নিজ নিজ প্রয়োজনমত জিনিষ আহরণ করিয়া লইতেছে অথচ কাহারও কোন অভাব না হইয়া বরং পরস্পরের সাহায্য হইতেছে। মিশেন আবাদকে উদ্ভিদের যৌথ-কারবার বলিতে পারা যায়।

পর্য্যায়-পদ্ধতির স্থূল নিয়ম বা সূত্র কয়টীমাত্র উল্লিখিত হইল। স্থানীয় রীতি অনুসারে ক্ষেত্রস্বামী নিজে বিবেচনা করিয়া পর্য্যায় প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ইহাই সুপরামর্শ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বীজ-নির্ব্বাচন।—চাষবাসের সহস্র সুবিধা থাকিলেও এবং অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম করিলেও, বীজের দোষে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বীজ ভাল হইলে ফসল ভাল হয়,—ফলন অধিক হয়। অপরিপুষ্ট, অপরিপক্ক ও কীটদষ্ট বা নির্জ্জীব গাছের বীজ বপন করিলে অনেক বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং যে সকল বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহাদিগের চারা শীর্ণ হয়, অচিরে মরিয়া যায়। রুগ্ন ও শীর্ণ গাছে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা সুপুষ্ট হয় না এবং পরিমাণেও আশানুরূপ হয় না এইজন্য নির্ব্বাচিত বীজ বপন করা উচিত। ফসল সংগৃহীত হইলে তাহার ভিতর হইতে পূর্ণাবয়ব, সুপুষ্ট সুপক্ক ও নীরোগ দানাগুলিকে আবাদের জন্য বাছাই করিয়া সাবধানে রাখিতে হয়। বীজনির্ব্বাচনে অবহেলা করিলে ফসলের দিন দিন অবনতি ঘটিয়া থাকে—ইহা সর্ব্বদা মনেঁ রাখা উচিত।

এক ক্ষেত্রের বীজ নিকৃষ্ট হইলে সমুদায় গ্রামের, তৎপরে জেলার, পরিশেষে সমগ্র দেশের ফসলের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা কারণ, এক ক্ষেতের দূষিত বা নিকৃষ্ট বীজ সন্নিহিত স্থানের কোন ব্যক্তি লইয়া গিয়া স্বীয় ক্ষেত্রে আবাদ করিতে পারে, ক্রমে তদুৎপন্ন বীজ আবার অপরাপর ব্যক্তি লইয়া আবাদ করিতে পারে। এইরূপে উক্ত বীজ-বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে সমগ্র দেশের মহা ক্ষতি হইবার বিশেষ আশঙ্কা। ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ ক্ষেত্রস্বামী যদি আর কাহাকেও না দেন এবং যদি স্বীয় ক্ষেত্রের জন্যই ব্যবহার করেন তাহা হইলেও তিনি

নিজে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই, সুতরাং নিকৃষ্ট বীজ পরিত্যাগ করিয়া সুবীজ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর স্থানীয় জলবায়ু এবং মৃত্তিকার বিভিন্নতাবশতঃ অনেক সময় বিদেশীয় বীজোৎপন্ন উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্থানীয় বা আবহাওয়াসহ বীজোৎপন্ন গাছে প্রায় সেরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। এইজন্য ভিন্ন বীজ কিম্বা দূরদেশ হইতে আনীত বীজের পুনঃ পুনঃ আবাদ করিতে করিতে যদি দেখা যায় যে, তজ্জাত ফসল ক্রমশঃ নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা হইলে পুনরায় নূতন বীজের প্রবর্ত্তন করা উচিত কিন্তু, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করিয়া প্রত্যেক ফসলের উৎকৃষ্ট বীজ নিজের জন্য রাখিলে বীজের অবনতি না হইতে পারে, পরন্তু তাহার উন্নতিসাধন করিতেও পারা যায়। উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে গোধূমের, নাইনিতাল হইতে আলুর কিম্বা অপর কোন দূর দেশ হইতে অন্য কোন ফসলের বীজ আনাইয়া অনেক সময় আবাদ করিতে হয় এবং পরে সেই আবাদের ফসল হইতে ভাবী আবাদের জন্য বীজ রক্ষা করিতে হয়। প্রতি বৎসর বীজের বীজ রক্ষা করিলে কোন অজ্ঞাত কারণেও যদি ফসল ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে আবার নূতন বীজ আমদানী করা বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোনও মতে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

বীজ-নির্ব্বাচনে অবহেলা বা অমনোযোগীতা হেতু সমগ্র বাঙলা দেশে ইক্ষুর পরিণাম নিতান্ত শোচনীয় হইয়া আসিয়াছে—ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কেবল ইক্ষু নহে, এইরূপে অনেক জিনিষের অবনতি হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গায় আবাদের জন্ত কলিকাতা হইতে শ্যামসাড়া ও বোম্বাই ইক্ষু বীজের জন্য আনাইয়াছিলাম। উক্ত ইক্ষুদণ্ডগুলি বড়ই শীর্ণ ও ঘনগ্রন্থি ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে ৪।৫

বৎসরকাল প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করায় উক্ত দুই জাতির ইক্ষু এতই পরিবর্ত্তিত হয় যে, তাহাগিগকে স্বতন্ত্র জাতীয় ইক্ষু বলিয়া মনে হইত। উন্নত প্রণালীতে আবাদের ফলে, সেই সকল ইক্ষু একদিকে যেমন সুদীর্ঘ ও স্থূল হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি রসাল, কোমল ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের আবরণ বা ছাল পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পাতলা হয় এবং গ্রন্থির সংখ্যা হ্রাস পায়।

ফসলের স্থায়ী উন্নতিবিধান এবং তাহার উপায়।—ইয়ুরোপের উন্নতিশীল দেশসমূহ এবং অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিক-যুক্তরাজ্য ও অপরাপর উন্নত ও উন্নতিকামী দেশমাত্রেই তাবৎ ফসলের,—কি তরি-তরকারির, কি ফল-পাকুড়ের, কি অপর বৃক্ষলতার,—দিন দিন উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এ দেশে যে তাহা হয় না ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষি বিষয়ক তাবৎ কার্য্যই এ দেশে অর্থহীন ও নিরক্ষর চাষীগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কি উপায়ে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, কি উপায়ে অধিক অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, এ সকল বিষয় ভাবিবার শক্তি তাহাদিগের নাই। সামান্য অজন্মা হইলেই যাহাদিগের উদরান্নের জন্য হাল-বলদ ও তৈজসপত্রাদি বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান বা ঋণ পরিশোধের উপায় করিতে হয়, তাহাদিগের দ্বারা কোন সংস্কার হওয়া সম্ভবপর নহে।

ক্ষেত হইতে ফসল সংগৃহীত হইবার পর সেই সকল ফসলের তারতম্যানুসারে বীজ নির্ব্বাচনের উদ্দেশে বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। ঈষৎ চেষ্টা করিয়া বীজের জন্য ফসলের উৎকৃষ্টাংশ বাছাই করতঃ স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে সমূহ উপকার হইয়া থাকে। যে ফসলের যে যে গুণ থাকিলে তাহাকে

উৎকৃষ্ট ফসল বলা যায়, এমন ফল, মূল, কন্দ, বা শস্যকেই বীজের জন্য রাখিতে হয়। কি প্রণালীতে উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিতে হয় সঙ্ক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি। একটী পেয়ারার বীজ রাখিতে হইলে প্রথমতঃ বাগানের মধ্যে কোন্ কোন্ গাছের ফলের আকার বড়, সুডৌল এবং ফলে বীজের পরিমাণ অল্প, শস্যের পরিমাণ অধিক ইত্যাদি দেখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও দেখিতে হইবে—কোন্‌টীর ছাল পাতলা, সৌরভ মধুর ও স্বাদ সুমিষ্ট। এই কয়টী বিষয় বিচার করিয়া যে যে ফলের বীজ অল্প, শস্য অধিক, যে ফলের ছাল পাতলা আঘ্রাণ মধুর এবং স্বাদ রসনাতৃপ্তিকর তাহাদিগকেই বীজফলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগেরই বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে। এই সকল চারা হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে তাহাদিগের ভিতর হইতেও উল্লিখিত নিয়মে বীজ নির্ব্বাচন করিলে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের বংশের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের কোন্ কোন্ গাছের অধিক ও সুপুষ্ট শস্য জন্মিয়াছে, শস্য অপেক্ষাকৃত বড় বড় হইয়াছে এবং দানার খোসা পাতলা ও দানা বড় হইয়াছে—এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বীজ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এই প্রণালীতে বীজসমূহ বংশপরম্পরায় পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাচিত হইলে তাহাদিগের ৩।৪ পর্য্যায় পরে যে ফসল উৎপন্ন হইবে তাহাদিগের সহিত প্রথমবারের বীজের বা ফসলের তুলনা করিলে পরবর্ত্তী বীজজাত ফসলের উৎকর্ষতা উপলব্ধি হইবে। ফসলের উন্নতিসাধন করা মনুষ্যচেষ্টার সম্পূর্ণ অধীন। মানুষ যে রকম জিনিষ উৎপন্ন করিতে চাহে, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকিলে তাহা অনায়াসেই করিতে পারে, তবে যে ইহা সময়সাপেক্ষ তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, তাহা হইলেও কোন দৈব দুর্ঘটনা না হইলে প্রতিবারেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ফসলের অপেক্ষা

যে ভাল ফসল পাওয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, একদিকে যেমন সুবীজের আবশ্যক, অন্যদিকে আবাদ প্রণালীও প্রকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

নিকৃষ্ট বীজের যেমন দিন দিন উন্নতি হইতে পারে আবার উৎকৃষ্ট বীজও অযত্নে আবাদিত হইলে ক্রমে তাহার বংশ নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধান্য-ক্ষেত্র হইতে প্রতি বৎসর সুপুষ্ট ধান্যকে 'বীজ' রাখিয়া ২।৪ বার আবাদ করতঃ যদি প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপন্ন করিতে পারা যায় তাহাতে কি অল্প লাভ! কোন গাছের শীর্ষে অধিক, কোন গাছের শীর্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প, শস্য জন্মে। এস্থলে সেই প্রথমোক্ত বিশিষ্ট গাছের শীর্ষ সংগ্রহকালে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে একটী নূতন জিনিষ লাভ হয়। প্রথম দুই এক বৎসর তজ্জাত ফসলের শস্য বিক্রয় বা খরচ না করিয়া যাহাতে তাহার পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঈদৃশ উপায়ে, যে এক বিঘা ক্ষেত্রে পাঁচ মণ ধান্য বা গোধূম জন্মে, তাহাতে যে পরে দশ মণ বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনির্ব্বাচিত বীজের সহিত ভাল ও মন্দ—উভয় প্রকারের বীজই থাকে, কিন্তু নির্ব্বাচনের দোষে বা অভাবে কোন তারতম্য থাকে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বীজ সংরক্ষণ।—ভবিষ্যতে আবাদ করিবার জন্য যে বীজ রাখিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। ধান্য, গোধূম, তিসি, সর্ষপ প্রভৃতি শস্য কর্ত্তিত হইবার পরেও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চটের থলের মধ্যে কিম্বা মরাই মধ্যে রাখিতে হয়। আলু, আর্দ্রক, হরিদ্রা, আরোরূট, প্রভৃতি কন্দজাতিয় ফসলের বীজের জন্য মূল বা কন্দই রাখিতে হয়। সেই সকল কন্দমূল কিছুদিনের পুরাতন হইলে বীজরূপে ব্যবহৃত হয়,—এবং এই জন্য তাহাদিগকে বীজ-আলু, বীজ-আদা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায়। উক্ত বীজ সকলকে গৃহমধ্যে মাচানের উপর প্রসারিত করিয়া রাখা উচিত। বীজ অধিক হইলেএবং স্থানের অসঙ্কুলান হইলে সেই সকল বীজকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। স্তরে স্তরে সাজাইতে হইলে প্রতি স্তরের উপরে দুই অঙ্গুলি স্থূল করিয়া শুষ্ক বালুকা প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। সংগৃহীত বীজ হইতে কাঠি কুটী, কাঁকর, মাটি ও ফোক্‌লা বা অকর্ম্মণ্য দানা চালনী দ্বারা চালিয়া লইলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ভূট্টার মোচাকে খোসা বা আবরণ সমেত একত্রে বাঁধিয়া বায়ু সঞ্চালিত গৃহমধ্যে টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহাতে সহজে পোকা ধরে না এবং বীজও ভাল থাকে। আর্দ্রক, হরিদ্রা প্রভৃতির মূল মাটির ভিতরে পুতিয়া রাখিলে বর্ষা সমাগত হইবার প্রাকাল পর্য্যন্ত বেশ থাকে, পরে বপন করিবার সময় মাটির ভিতর হইতে উঠাইয়া লইলেই

চলে। আমরা নানা উপায়ে আলু, আদা প্রভৃতির মূল রক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু কোন্ উপায়টী যে অব্যর্থ তাহা আজও স্থির করিতে পারি নাই। বালুকা স্তরমধ্যে, খণ্ড-বিচালীর মধ্যে, পাটাতনে বা মাচানে প্রসারিত করিয়াও রাখিয়াছি, বায়ুরুদ্ধ সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়াছি, অল্লাধিক বায়ু ও আলোক সম্পর্কিত স্থানেও রাখিয়াছি কিন্তু সাধারণ কৃষিকর্ম্মীর পক্ষে কোন্ প্রণালী অবলম্বনীয় তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে ইহা বলিতে পারি যে, সংরক্ষিত বীজসমূহকে ঘন ঘন পরিদর্শন করিলে অধিক বীজ নষ্ট হইতে পায় না। সংরক্ষিত বীজ-মূলদিগকে মধ্যে মধ্যে দেখিলে, উলট্-পালট্ করিয়া দিলে এবং দাগী, পচা, ধসা, কীটদষ্ট মূল স্বতন্ত্র করিয়া লইলে অনেক পরিমাণে সফলকাম হইতে পারা যায়। দীর্ঘকাল শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দিলে অনেক মূল এত শুকাইয়া যায় যে, যে সকল মূল হইতে আর অঙ্কুর উদ্গত হয় না। আবার ইহাও দেখিয়াছি, দীর্ঘকাল অস্পর্শিতা-বস্থায় রাখিয়া দিলে মূলের উপরিভাগের রস নিম্নভাগে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এবং তাহার ফলে নিম্নাংশে পচ্ ধরে। পচ্ধরা রোগ সাংক্রামিক। ঘা পাঁচড়াগ্রস্ত কোন ব্যক্তির ঘা-পাঁচড়ার রস কোনও ক্রমে,অপর ব্যক্তির গাত্রে স্পর্শিত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি যেরূপ ঘা-পাঁচড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে, দাগী ও পচা মূলের রস, রাশিমধ্যস্থিত নীরোগ মূলদিগকে সেইরূপ আক্রমণ করে এবং ক্রমে সেই রোগ তাবৎ মূলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ছোঁয়াচে-রোগ প্রায় সর্ব্বস্থলেই ছোঁয়াচে,—ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

বীজাগার।—যে ঘরে বীজ রাখিতে হইবে তাহা যেন স্যাঁতসেঁতে না হয় এবং ঘরের মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবাহিত হইবার জন্য যেন যথেষ্ট বাতায়ন থাকে, অন্যথা বীজে ছাতা ধরে, বীজ পচিয়া

যায়। ঘরের মেজে যতই পাকা মসলায় নির্ম্মিত হউক, ভূমির স্বকীয় উত্তাপ সেই মেজে ভেদ করিয়া অহর্নিশি উত্থিত হইতেছে। ভূগর্ভ অনন্তরসে পূর্ণ—ইহা আমরা জানি, কিন্তু উক্ত রস আমাদিগের দৃষ্টির গোচরীভূত নহে বলিয়া আমরা তাহা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই না বলিয়া তাহার অস্তিত্ব বা তাহার ক্রিয়া আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ক্ষণকালের জন্য এক টুকরা বস্ত্র মেজের উপর রাখিয়া দিলে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যায় কেন? ভূগর্ভের রসোত্থানই তাহার বিশিষ্ট কারণ। ভূমিসংলগ্ন সকল মেজেই উক্ত প্রাকৃতিক বিধানের বিষয়ীভূত। এই কারণে ভূমিসংলগ্ন মেজে বীজ রক্ষার পক্ষে তাদৃশ সুবিধাজনক বা নিরাপদ নহে। দ্বিতল-ত্রিতল গৃহ সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নহে কারণ, সে সকল গৃহ ভূমির সহিত সাক্ষাৎভাবে সংলগ্ন নহে। তাহা ব্যতীত, শস্যাদি একতল গৃহেই রক্ষিত হইয়া থাকে —ইহাই সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহার। এইজন্য বীজাগারের মেজের সহিত ভূমির সাক্ষাৎ সম্বন্ধবিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে গৃহমধ্যে মাচান নির্ম্মাণ করা উচিত। মাচানের সহিত ভূমির সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া মাচান শুষ্ক থাকে। মেজের তলদেশে বায়ুপ্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা থাকিলে ঘর শুষ্ক হয়।

গৃহমধ্যে আরশুলা, গন্ধমুষিক বা ইন্দুরের উপদ্রব হইতে না পারে—সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এজন্য বীজঘরে প্রতিনিয়ত দুই একটী মুষ্‌কারি বা ইন্দুর-কল রাখিতে পারিলে ভাল হয়। আরশুলা নিবারণের জন্য কাঁচপোকা পুষিবে। আরশুলার যম,—কাঁচপোকা। বীজ-ঘরে সর্পের, সমাগম হইয়া থাকে। মুষিকের সহিত সর্পের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। মুষিক ধরিবার জন্যই সর্পের আবির্ভাব হয় কিন্তু সর্পকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে বলিয়া ২।১ নেউল পুষিতে পারিলে মন্দ হয় না কারণ—ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, নেউল সর্পের সংহারক।

বীজ ভিজা থাকিলে কিম্বা তাহাতে কোন রকমে জল লাগিলে বা রস সঞ্চিত হইলে বীজের মধ্যে উত্তাপ জন্মে, অনন্তর উহা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু চারারূপে উদ্গত হইতে না পারিয়া ভিতরেই পচিতে থাকে। সামান্য আর্দ্রতা থাকিলে অতি অল্পকাল মধ্যে বীজসমূহ এত উষ্ণ হইয়া উঠে যে, তন্মধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করান অসম্ভব হয়। এই কারণে বীজ, কন্দ ও দানা নির্ব্বিশেষে শুষ্ক রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

মূল বা কন্দ সমূহকে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। রাশির মধ্যে কোনটা দাগী বা কীটাক্রান্ত হইয়া থাকিলে অবিলম্বে বাছিয়া ফেলা উচিত। এই সকল বীজ রক্ষা করিবার জন্য শুষ্ক ছাই ও বালুকা বিশেষ ফলদায়ক।

সর্ষপ, গোধূম, প্রভৃতি কলসী বা জালার মধ্যে রাখিয়া তন্মধ্যে কর্পূর অথবা অর্দ্ধোন্মুক্ত শিশির মধ্যে বাইসলফাইড অব্-কার্ব্বন (Bisulphide of carbon), ন্যাপথলীন (Napthaline) রাখিয়া দিলে বীজে কোন কীট ধরিতে পারে না।

বীজের পরিমাণানুসারে ক্ষুদ্রভাঁড়, কলসী কিম্বা জালার মধ্যে বীজ পুরিয়া পাত্র সকলকে খুরী সরা বা সান্‌কী দ্বারা ঢাকিয়া ঢাকনীর চতুষ্পার্শ্বে এঁটেল মাটির প্রলেপ দিতে হয়। এইরূপে প্রলেপ দিলে আধারের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারে না। উষ্ণ বাতাস অপেক্ষা ঠাণ্ডা বাতাস বিশেষ ক্ষতিকর।

ঔদ্যানিক ফসলের বীজের জন্য শিশি বা বোতল স্পৃহণীয়। ঔদ্যানিক কৃষির অর্থাৎ তরিতরকারি কিম্বা ফুলের বীজ সচরাচর অল্প পরিমাণেই রক্ষিত হয় এইজন্য ইহাদিগের রক্ষার্থ কলসী বা জালা, কিম্বা হাঁড়ি বা ভাঁড় ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে ক্ষেত্রস্বামীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।

যে কোনও প্রকার পাত্রেই বীজ রক্ষিত হউক, বীজপূর্ণ সকল পাত্র-কেই মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং ক্ষণকালের জন্য রৌদ্রে বা বাতাসে প্রসারিত করণান্তর পুনরায় পাত্রমধ্যে আবদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ রাখিতে হইবে। যে সকল বীজ রৌদ্রে প্রসারিত করা যায় তাহাদিগকে আধার মধ্যে পুনরাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। উত্তপ্ত বীজ পাত্রমধ্যে আবদ্ধ করিলে বীজ হইতে যে উত্তাপ নির্গত হয় তাহা বহির্গত হইয়া যাইতে না পারিয়া জল হইয়া যায় এবং সে জল বা রসের দ্বারা বীজ সমুদায় আর্দ্র হয়, অবশেষে বীজসমূহে ছাতা ধরে, বীজে একটা দুর্গন্ধ জন্মে। বীজে এইরূপ দুর্গন্ধ জন্মিলে জানিতে হইবে যে, সে সকল বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহাদিগের ভ্রূণ বা ফল মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু—

ছাতা কি ?—ছাতা উপেক্ষণীয় নহে। উহারা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহারা বীজের গাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া বীজ হইতে রস ও আহার্য্য গ্রহণকরতঃ জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। ইহাদিগের বংশধারা বৃদ্ধির গতি এত দ্রুত, এত ক্ষিপ্র যে, শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র বিষয়ীভূত বলিয়া এস্থলে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে বিরত হইলাম।

বীজরাশির মধ্যে ২।১টী কীটগ্রস্ত থাকিলে সমগ্র বীজের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইজন্য রক্ষিত বা রক্ষণীয় বীজের মধ্যে কীটদষ্ট বীজ সাধ্যমত বাছিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই, কারণ বীজের কোনও অংশে কীটের একটী মাত্র ডিম্ব থাকিলেও সেই একটী মাত্র ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া রাশি রাশি কীট প্রসব করে। সাবধানতার মার নাই—এইরূপ একটী প্রবাদ আছে। এইজন্য আধারের মধ্যে রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বীজ সমূহকে তীব্র সাবানের কিম্বা ফেনাইলের জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলে ভাল হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বীজ বপন।—বীজ বপনের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। গোধূম, তিসি, সর্ষপ প্রভৃতির শস্যকে ছিটাইয়া বুনিতে হয়, আবার আলু, ইক্ষু, আর্দ্রক, আরোরুট প্রভৃতির বীজ সারি সারি নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যবধানে পুঁতিতে হয়। তামাক, লঙ্কা, মৌরি প্রভৃতির বীজ হাপোরে পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়, পরে চারাগুলি ৫।৬টী পাতাযুক্ত হইলে ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। ধান্যের আবাদে বপন ও রোপণ— দুই প্রণালীই প্রচলিত আছে, তবে আমন ধান্যের চারা উৎপন্ন করিয়া পরে রোপন করাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম।

বীজ বপন করিবার অথবা চারা রোপণ করিবার দুই এক দিন পূর্ব্বে ক্ষেতের মাটি উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া রাখা উচিত নতুবা সময় আগত হইলে তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় মাটি ভাল তৈয়ার হইয়া উঠে না। আবার এমনও হইতে পারে যে, সে সময়ে বৃষ্টিতে মাটি ভিজিয়া গেল, ক্ষেতের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইল, ফলতঃ সেই জল শুষ্ক হইবার পর যে পর্য্যন্ত মাটিতে 'যো' না হয়, তত দিন অপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপে বারিপাতহেতু কয়েক দিন সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। অতঃপর, ক্ষেত্রের কর্ষণাদি কার্য্যেও কয়েক দিন কাটিয়া যায়। এই দুই কারণে মাটি তৈয়ার হইয়া উঠিতে যেমন এক-দিকে বিলম্ব হইয়া যায়, অন্যদিকে আবার যদি সে সময় দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিবশতঃ মাটি কঠিন হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেও আপাততঃ

হলচালনাদি ক্রিয়ায় হস্তক্ষেপন করিতে পারা যায় না, সুতরাং বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, বৃষ্টির পরেও মাটিতে ‘যো’ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অনর্থক সময় নষ্ট করিলে নানা-দিকে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। ক্ষেত হইতে ফসল উঠিয়া গেলেই কর্ষণাদি শেষ করিয়া রাখিলে ঠিক সময়ে আবাদ আরম্ভ করা যাইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, ফসল উঠিয়া যাইবার পর জমি কঠিন হইয়া গিয়াছে এবং ফাটিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকিলে বৃষ্টিতে মাটি নরম হইবার আশায় আকাশ পানে তাকাইয়া না থাকিয়া কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া দেওয়া উচিত। কোপাইয়া দিবার পর এক দিন বা এক বেলা বাতাস ও রৌদ্র লাগিলে মাটি সহজেই ভগ্নশীল হয়। তখন সেই কোদলান চাপ্ সমূহকে কোদালের শিরোভাগ-দ্বারা ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং শেষে একবার চৌকী বা মদিকার সাহায্যে জমি চৌরস করিয়া দেওয়া উচিত। অতঃপর, প্রথম বৃষ্টির পরেই পুনরায় ক্ষেত যথানিয়মে কর্ষণাদি করিতে পারিলে জমি তৈয়ার করিতে আর বিলম্ব হইবে না।

এইরূপে ভাঙ্গিয়া দিবার পরে ক্ষেত যদি কিছুদিন অনাবাদী অবস্থায় পতিত থাকিতে পায়, তাহা হইলে বায়ু, আলোক, রৌদ্র ও শিশিরের প্রভাবে মাটি আপনা হইতেই অনেকটা শিথিল হইয়া আইসে। ভৌতিক ক্রিয়াবশে বিনষ্ট শক্তিও কতক পরিমাণে পুনরাগত হয় এবং তাহাতে যে তৃণ গুল্মাদি থাকে তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়া ক্ষেত্রকে আগাছাহীন করে। তাহা ব্যতীত, সেই সকল তৃণগুল্মাদি ক্রমে বিগলিত হইয়া মৃত্তিকায় সারের কার্য্য করে। তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিলে এ সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বীজ বুনিবার, বা চারা রোপণের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে

একবার হাল-চৌকী দেওয়া উচিত। যে সকল বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, তাহাদিগের জন্য ক্ষেত্রকে একবার কর্ষণ করতঃ বীজ বুনিয়া পরে মই বা চৌকি দিতে হয়। বীজ বুনিবার পরে চৌকী বা মই দিবার প্রথা আছে, কারণ তদ্দ্বারা বীজ সমূহ মাটিতে ঢাকিয়া যায় এবং মই বা চৌকির ভারে সেই সকল বীজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়রূপে মৃত্তিকার সহিত ঘনভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়, ফলতঃ অঙ্কুরোদ্গম হইতে বিলম্ব হয় না। মাটি আলগা থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, কারণ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বায়ু, আলোক ও সূর্য্যোত্তাপ বীজের সন্নিকট হয়, তাহা অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে শুভজনক নহে। অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে রস ও উত্তাপের সমভাব (Equilibrium) বিশেষ প্রয়োজনীয়। মাটি আলগা থাকিলে তাহা হয় না, কারণ দিবাভাগে উত্তাপের এবং রাত্রিকালে শৈত্যের আধিক্য হয়, সুতরাং মৃত্তিকামধ্যস্থিত বীজ সকল দিবাভাগে ফুলিয়া উঠে এবং রাত্রিতে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু মাটি দৃঢ় থাকিলে রস ও উত্তাপ সমভাবাবস্থায় থাকে এবং বাতাস বা আলোক বীজের সংস্পর্শে আসিতে পায় না, ফলতঃ শীঘ্রই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। বিশেষ কথা এই যে, মূল ও কন্দ সমূহের মুকুলিত হইবারও পক্ষে এই নিয়ম।

নিস্তৃণী বা নিড়ানী।—বৃষ্টির জলে হউক বা সেচিত জলে হউক, ক্ষেত সিক্ত হইলে মাটি বসিয়া যায়, মাটির উপরে সর পড়ে ফলতঃ ছিদ্রপথ সমূহের মুখ ঢাকিয়া যায়, মাটি ফাটিয়া যায়! মাটি বসিয়া গেলে কিম্বা তাহার উপরে সর পড়িলে, অথবা উহা ফাটিয়া গেলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি স্থগিত হয় কিন্তু আবার মাটিকে খুরপি বা নিড়েন দ্বারা উস্কাইয়া দিলে উদ্ভিদ সজীব হইয়া উঠে। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন মাটিকে বিচলিত করিয়া দেওয়াকে নিড়ানী করা বা 'পাপড়ী ভাঙ্গা' কহে

পাপড়ী ভাঙ্গিবার জন্য বঙ্গ দেশের প্রায় সকল স্থানেই নিড়নের ব্যবহার আছে কিন্তু বেহার অঞ্চলে খুরপিই অধিক প্রচলিত। নিড়ান অপেক্ষা খুরপি দ্বারা অধিক, শীঘ্র ও ভাল কাজ হইয়া থাকে। খুরপির মুখাগ্রভাগ প্রশস্ত, এজন্য উহা দ্বারা যত অধিক এবং শীঘ্র ও ভাল কাজ হয়, সূক্ষ্ম ফালবিশিষ্ট নিড়েন দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

নিস্তৃণীফলে ক্ষেত্রের তৃণ ও আগাছা সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং মাটি আল্‌গা হয়। ভিতরের মাটি যতই আল্‌গা, সারবান ও সরস হউক ভূপৃষ্ঠের মাটি কঠিন হইয়া গেলে সার বা রস কোন ফলদায়ক হয় না। উপরের মাটি আল্‌গা ও চূর্ণিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের কিরন সম্পাতে ও বায়ুর প্রভাবে যে যৌগিকাকর্ষণের উদ্ভব হয়, তাহার ফলে মৃত্তিকা সরস থাকে—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মৃত্তিকা সরস ও কোমল থাকিলে উদ্ভিদগণ দূর হইতে স্ব স্ব পোষণোপযোগী পদার্থসমূহ সহজে আহরণ করিতে সমর্থ হয়। নিড়ানি-কার্য্যে অবহেলা করিলে কেবল যে মাটি কঠিন হইয়া যায় এমন নহে, পরন্তু তৃণাদি জন্মিয়া মাটিতে উত্তাপ ও বাষ্পীয় পদার্থ সমূহের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, উপরন্তু মৃত্তিকান্তর্গত সার পদার্থ অপহরণ করে, আবাদী ফসল ঢাকিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে উদ্ভিদগণ প্রথমতঃ বিবর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে অবশেষে মরিয়া যায়।

মাটি সিক্ত থাকিলে নিড়েন করা বিধি নহে। অধিক কি সে সময়ে ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত নহে। মৃত্তিকার সিক্তাবস্থায় মানুষ কিম্বা গোরু-বাছুর ক্ষেত্রে যাতায়াত করিলে পদভারে মাটি দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়, ভূমি অসমতল হইয়া পড়ে। অতঃপর, রৌদ্রে মাটি শুকাইয়া গেলে জমি বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, তন্নিবন্ধন ভূগর্ভ মধ্যে রৌদ্রোত্তাপ বা বায়বীয় পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে না। যাহা হউক, 'যো' পাইলে নিড়েন

করিতে হয়। মাটির দো-রসা অবস্থাই নিড়েন করিবার উপযুক্ত সময়। ভিজে মাটিতে নিড়েন করিলে ভিজে ঢেলা উৎপন্ন হয় এবং তাহা শুকাইয়া গেলে কঠিন হইয়া যায়, ফলে নিড়াইলে কোন উপকার না হইয়া সমূহ ক্ষতি হয়। শুষ্ক মাটির পাপ্‌ড়ি ভাঙ্গিতে হইলে এরূপ সাবধানে তাহা করা উচিত যেন উদ্ভিদের বেশী মূল না ছিঁড়িয়া যায়। মধ্যে মধ্যে জল সেচিতে হয়—এরূপ ফসল-যুক্ত ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া কঠিন হইলে তাহাতে একবার অল্প পরিমাণে জলসেচন করতঃ নিড়েন করিলে ভাল হয়, কারণ ইহাতে মাটির কাঠিন্য বিদূরিত হয়, তন্নিবন্ধন নিড়ানির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। নিড়েন দিয়া মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নিড়েন করিয়া মাটি না চূর্ণ করিলে নিম্নস্থিত মাটিও শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদের সমূহ ক্ষতি হয়।

চারাগুলি যতদিন ছোট থাকে ততদিন ক্ষেত বিশেষরূপে পরিষ্কার রাখা উচিত। চারা সকল বড় হইয়া উঠিলে সামান্য তৃণাদিতে তাহাদের আর বড় অনিষ্ট করিতে পারে না। গাছ যত বড় হইয়া উঠে, ক্ষেত তত ঢাকিয়া যায়, ফলতঃ আওতায় আর আগাছা জন্মিতে পারে না। ধান্য, পাট, শণ প্রভৃতি বর্ষাকালের ফসলে নিড়ানী সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিৎ। এই সময়ে ক্ষেতে বহু তৃণাদি জন্মে এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাধারণতঃ রবি ফসল অপেক্ষা ভাদুই ফসলে অধিকবার নিড়ানির আবশ্যক হয় এবং সচরাচর ইহাদিগের জন্য চারিটী নিড়েন করিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ।—মৃত্তিকা ও ঋতুর অবস্থাভেদে এবং ফসল বুনিবার অগ্রপশ্চাৎ হেতু কোন ক্ষেত্রের ফসল অগ্রে, কোন ক্ষেত্রের ফসল বিলম্বে সংগৃহীত হইবার উপযোগী হইয়া উঠে। যে কোন ফসল হউক, সম্পূর্ণরূপে তৈয়ার হইয়াছে বুঝিতে

পারিলে, কালবিলম্ব না করিয়া সংগ্রহ করা উচিত। ঠিক সময়ের অতি পূর্ব্বে বা পরে সংগ্রহ করিলে ফসলের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ধান্যাদি শস্যকে অধিক পূর্ব্বে কর্ত্তন করিয়া আনিলে অনেক শস্য পরিপুষ্ট হইবার সময় পায় না; ইক্ষুতে রস অধিক থাকে, সুতরাং তাহার স্বাদ পান্‌সে বা জলীয় হয়। আবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অনেক ফসলের শস্য খসিয়া পড়িয়া যায়, কন্দে রসালতা থাকে না, কোন কোন ফসলে শ্বেতসারের অংশ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ছিব্‌ড়া অধিক হয় ইত্যাদি। ইক্ষু সংগৃহীত হইতে বিলম্ব ঘটিলে দণ্ড সকল কঠিন হইয়া যায়, রসের পরিমাণ ও মিষ্টতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ছিব্‌ড়ার পরিমাণ অধিক হয়। এ সকল ছাড়াও, যদি দৈবক্রমে ঝড় বৃষ্টি হয় তাহা হইলে 'পাকা ধানে মই' হয় অর্থাৎ তৈয়ারি জিনিষ বিনষ্ট হয়।

বৃষ্টি-বাদলের দিন কিম্বা বৃষ্টির পরে ফসল আর্দ্র থাকিলে কোন ফসল সংগ্রহ করা উচিত নহে। ইহাতে জনমজুরদিগের কাজ করিতে অসুবিধা ত হয়ই, তাহা ব্যতীত আর্দ্র ফসল খামারে স্তূপিকৃত হইলে তাহাতে অল্পক্ষণ মধ্যে উত্তাপ জন্মে, তন্নিবন্ধন ফসল পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। একেবারে পচিয়া অব্যবহার্য্য না হইলেও উহার শাঁস বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া যায়—ইহা অবধারিত।

যব, গোধূম, তিসি প্রভৃতি রবি শস্য প্রত্যূষে কর্ত্তন করিতে হয়। অপরাহ্নে কর্ত্তন করিলে অতিশয় শুষ্কতাবশতঃ শীর্বসমূহ অল্পাধিক নরম থাকে, সুতরাং সে সময়ে শস্য ঝরিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। তামাক, কার্পাস প্রভৃতি ফসল প্রত্যূষে না সংগ্রহ করিয়া ৯।১০ ঘটিকার সময় সংগ্রহ করা উচিৎ, কারণ ইতিমধ্যে তামাকের পাতা ও কার্পাসের ফল হইতে শিশির শুকাইয়া যায়,সুতরাং সে সময়ে সংগ্রহ করিলে কোনও দোষ ঘটে না, শিশির সিক্তাবস্থায় সংগ্রহ করিলে নানা দোষ ঘটে।

কৃষিক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ধান্য

ভারতবর্ষ নানাবিধ ভূমি এবং বিবিধ প্রকার মৃত্তিকাসমন্বিত বিস্তৃত মহাদেশ। এইজন্য এ দেশে বহু প্রকারের ধান্য জন্মিয়া থাকে কিন্তু, তাহার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রদেশে, অধিক কি, নিকটস্থ ভিন্ন জেলাতেই একই ধান্য ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া অসিতেছে।

ধান্য,—এক-বীজদল (Monocotyledenous) অনতিকালজীবী উদ্ভিদ,—কয়েক মাস জীবিত থাকিবার পর ফসল প্রদান করিয়াই তাহার পরমায়ু শেষ হয়।

ধান্য প্রধানতঃ দুইটী বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত.—আশু ও আমন। এতদুভয়ের আবাদ প্রণালীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বড় অল্প। উক্ত দুইটী ফসল ব্যতীত বোরো, জলি, ত্বরা-আশু প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকারের ধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় তত প্রয়োজনীয় ফসল নহে। আশু ও আমন—এই দুইটী বিশেষ ফসলের উপরেই আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়।

আশু ধান্য।—কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীগণ সাধারণতঃ আশু ধান্যের উপরেই সমধিক নির্ভর করে। আশু ধান্যের ফসল অল্পদিনের মধ্যেই গৃহজাত করিতে পারা যায় এবং অল্প বৃষ্টিতেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। এই দুই কারণে প্রায় সকল কৃষকই আশু ধান্যের অল্পাধিক আবাদ করিয়া থাকে। আশুর তণ্ডুল তত ভাল নহে এবং তেমন সুসিদ্ধ হয় না, ফলতঃ সহজে পরিপাক হয় না। বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার ব্যবহার নাই বলিলে অত্যুক্তি বা দোষ হয় না।

প্রকারভেদে আশুধান্য দুই ভাগে বিভক্ত,—ছোট্‌না-আশু ও বরাণ-আশু। ছোট্‌নার আবাদের জন্য ক্ষেতে জল বাঁধিবার কোন প্রয়োজন হয় না, সাময়িক অল্প বৃষ্টিতে উত্তম আবাদ হইয়া থাকে। যে সকল ভূমিতে প্রথম ও অল্প বর্ষাতেই জল দাঁড়ায়, তাহাতে ইহার আবাদ করা উচিত নহে, কিন্তু বারণ-আশুর জন্য ক্ষেতে আধ হাত হইতে তিন পোয়া জল থাকা আবশ্যক, কেবল আকাশের জলে ইহার আবাদ ভাল হয় না। ছোট্‌নার ফসল কিছু অগ্রে, এবং বরাণের ফসল কিছু পরে, পাকিয়া থাকে। দুই জাতীয় আশুই উচ্চ ও সমতল ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, ছোট্‌না-আশু কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও গড়েন জমিতেও জন্মে কিন্তু বরাণের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক নহে, কারণ ঈদৃশ জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে না।

আশুর উপযোগী ক্ষেত্র হইতে রবি ফসল স্থানান্তরিত হইলে বিলম্ব না করিয়া আশুধান্যের জন্য ক্ষেত তৈয়ার করিতে হইবে। রবি ফসলের ক্ষেত খালি হইবার জন্য চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়; অতঃপর, বৈশাখ মাসে হলচালনাদি দ্বারা মাটি উত্তমরূপে তৈয়ার করিতে

হয়। চৌমাসী বা 'চৌমাস'লব্ধ * ক্ষেত হইলে ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসেই কর্ষণাদি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়।

আশু ধান্যের বীজ বুনিবার সময়,—বৈশাখ মাস, সুতরাং মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে প্রথম পসলা বৃষ্টি পাইলেই 'জোত-কোড়' করিয়া ক্ষেত তৈয়ার করিতে হয়। † উক্ত সময়ে অনাবাদী ক্ষেত শুকাইয়া কঠিন হইয়া থাকে, এমন অবস্থায় শক্ত মাটি কর্ষণ করা বড় দুষ্কর, সুতরাং এক পসলা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বৃষ্টির পর মাটিতে 'যো' পাইলে হলচালনাদি করিতে হইবে।

বপন ও রোপণ।—উভয়বিধ প্রণালীতেই আশুধানের আবাদ হইয়া থাকে। বুনানী অর্থাৎ বপন প্রণালীতে আবাদ করিতে হইলে এমন জমিতে আবাদ করিতে হইবে, যেন সহসা অধিক বৃষ্টিতে ক্ষেতে সমধিক জল সঞ্চিত হইয়া চারা গাছদিগকে না ডুবাইয়া দেয়। অল্প অল্প বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে জল সঞ্চিত হইলে ভয়ের কারণ নাই, কারণ, জল-বৃদ্ধির সঙ্গে গাছ সকলও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় উচ্চ, সমতল ও গড়েন জমিতে বুনানী পদ্ধতিতে আবাদ করিতে এবং ঈষৎ নাবাল জমিতে রুইতে পারা যায়।

---

* ক্ষেত হইতে কোন ফসল উঠিয়া যাইবার পরে, এক ফসল-কাল, যদি তাহাতে কোন আবাদ না করা যায়, তাহা হইলে 'চৌমাস' দেওয়া কহে। 'চৌমাস' কথাটী বোধ হয় ছয় বা চারি মাস শব্দদ্বয়ের অপভ্রংশ। 'চৌমাস' দিলে ক্ষেতের পূর্ব্বেকার শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরিয়া আসে, এজন্য কৃষকেরা সময়ে সময়ে কিম্বা ফসল বিশেষের জন্য 'চৌমাস' দিয়া থাকে। 'চৌমাস'—জীরেন্ বা fallowing ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং আবাদী জমি জীরেণ পাইলে যেরূপ নূতন শক্তি লাভ করে, চৌমাসলব্ধ জমিও সেইরূপ শক্তি লাভ করে।

† ক্ষেত প্রস্তুতার্থে হলচালনাদি কার্য্যকে গ্রাম্য ভাষায় 'জোত-কোড়' কহে।

বীজ বুনিবার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ৩।৪ হইতে ৬।৭ বার চাষ দিবার পরে বুনানী করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য যে, বীজ বুনিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা-কর্ষণ ও মদিকা পরিচালনদ্বারা ক্ষেত 'লাল' করিতে হইবে। 'লাল' ক্ষেতে বীজ শীঘ্রই উপ্ত হয় এবং ফসলও ভাল হয়। জমি 'লাল' করিয়া রাখিবার পর বৃষ্টি হইলে যাবৎ না 'যো' হয় তাবৎকাল অপেক্ষা করতঃ পুনরায় ক্ষেত্রকে ২।১-বার কর্ষণাদির দ্বারা মাটিকে জাগাইয়া লইতে হয়। বুনিবার পূর্ব্বে ক্ষেতের মাটি ধূলাবৎ হইয়া থাকা উচিত।*

বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে আষাঢ় মাসের পণর দিনের মধ্যে হলচালনাদির পর বীজ বুনিয়া মদিকা বা চৌকির দ্বারা ক্ষেতকে সমতল করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের নিম্ন বাঙলার ন্যায় বারিপ্রধানদেশে বৈশাখ মাসেই বীজ বুনিতে পারা যায়, কিন্তু উচ্চ বঙ্গ, বেহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে বারিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রকৃত বর্ষা আরম্ভ হয়, এজন্য শেষোক্ত স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে বীজ বপন করা উচিত। এ সম্বন্ধে বর্ষারম্ভের অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। সচরাচর বৈশাখ-বপিত ক্ষেত্রের ধান্য শ্রাবণে, জ্যৈষ্ঠের বপিত ক্ষেতে ভাদ্রে এবং আষাঢ়ের বপিত ক্ষেতে আশ্বিন মাসে ফসল পাকিয়া থাকে কিন্তু বর্ষাসমাগমের অগ্রপশ্চান্নিবন্ধন ইহার ব্যতিক্রম হয়।

বুনিবার দিন হইতে চতুর্থ দিনে বীজের 'কল' বাহির হয় অর্থাৎ বীজমধ্যস্থিত ভ্রূণ অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়। এইজন্য কৃষকেরা বলিয়া থাকে যে, চতুর্থ দিনে 'ধান ধ্যানে বসে'। অতঃপর ২।১ দিনের মধ্যে ক্ষেত্রে 'ছুঁচফোড়' দেখা দেয়। একবীজদল যাবতীয় বীজ

* ভাবী ফসলের জন্য জোত-কোড় প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা মাটি তৈয়ার হইয়া থাকিলে তাহাকে 'লাল' মাটি কহে।

অঙ্কুরিত হইলে তাহা হইতে একটী মাত্র পত্র সূচাকারে ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয়। এইজন্য অঙ্কুরিত ধান্যের উক্ত অবস্থা ছুঁচফোড় নামে অভিহিত। ১০।১২ দিনের ক্ষেত্র মধ্যে ছুঁচফোড় জাওলায় সমগ্র ক্ষেত্র মনোহর হরিদ্বর্ণে আলোকিত হয়। চারা আধ হাত বাড়িয়া উঠিলে 'জাওলা' নামে অভিহিত হয়। এই কয় দিনের মধ্যে ক্ষেতে মুথা, শ্যামা-ঘাস প্রভৃতি উদগত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। তাহাদিগকে বিনাশ করিবার এবং মাটিকে অল্পাধিক চাপিয়া দিবার জন্য এক্ষণে ক্ষেত্রে ৩।৪ পালা মদিকা পরিচালিত করা আবশ্যক। তৃণাদি মরিয়া গেলে এবং মাটি আল্গা হইলে জাওলা শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। বৃষ্টিতে অথবা শিশিরে যতক্ষণ গাছ সিক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরে মই দিতে হয়। শিশির সিক্তাবস্থায় মদিকা সঞ্চালিত হইলে পোয়ালী কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায় এবং অনেক গাছ এরূপ দৃঢ়রূপে ভূমিসংলগ্ন হইয়া যায় যে, আর খাড়া হইয়া উঠিতে পারে না। মদিকার পরিবর্ত্তে বিদ্ধক পরিচালনদ্বারা ক্ষেতের মাটি বিচালিত করিয়া দিলে ভাল হয়। ইতঃপূর্ব্বে বারম্বার মদিকা পরিচালনায় এবং বৃষ্টি হইয়া থাকিলে বারি-পাতে মাটি চাপিয়া যায়, সুতরাং এক্ষণে বিদ্ধক দিলে উপকার হয়—চারা সকল ঝাঁপাইয়া উঠে। মৃত্তিকার সিক্তাবস্থায় বিদ্ধক ব্যবহার করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। ভিজে জমিতে বিদে দিলে মাটিতে ঢেলা বাঁধিয়া যায়। গাছের কাণ্ডে যতদিন না গ্রন্থি বা গাঁট দেখা দেয় তাবৎ মধ্যে মধ্যে উত্তম যোয়ে ক্ষেত্রে বিদে চালনায় সমূহ উপকার দর্শে। গ্রন্থিযুক্ত হইবার পর বিঁদে পরিচালনা করিলে জাওলা ভাঙ্গিয়া যায়, ফলতঃ সে সকল গাছ আর খাড়া হইতে পারে না, কিন্তু গাছের গোড়া হইতে নূতন নূতন ফেঁকৃড়ি উদগত হয়। একটীর স্থলে কতকগুলি গাছ উৎপন্ন হইলে একটীর শক্তির দ্বারা পাঁচটী

প্রতিপালিত হয়, অগত্যা তাহার ফলন কম হয় এবং শস্যের আকার খর্ব্ব হয়। অতুর্ব্বরা ভূমিতে একটী গাছ হইতে পাঁচটী গাছ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইলে আসল গাছের ক্ষতি হয় না কারণ নূতন ফেঁকৃড়িগুলির উদগমের সঙ্গে প্রত্যেকের গোড়ায় শিকড় বাহির হইয়া উহাদিগকে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দেয়। এই সকল ফেঁকৃড়িকে তখন স্বতন্ত্র গাছ বলিতে এবং প্রত্যেকটীকে স্বতন্ত্র করতঃ স্থানান্তরে রোপণ করিতে পারা যায়। ধান্যাদি ফসল ওষধিবর্গীয় অল্পজীবি বলিয়া উক্ত প্রণালী অবলম্বনে অর্থাৎ ফেঁকৃড়ী স্বতন্ত্র রোপণ করিয়া লালনপালন করিতে আবাদের বহু সময় অতিবাহিত হইয়া যায় সুতরাং তাহা স্পৃহনীয় নহে। ক্ষেতে যে গাছটী রোপণ করা যায়, সেইটীই বজায় থাকিয়া একটী মাত্র শীষ ধারণ করে, কিন্তু উর্ব্বরা ভূমিতে একটী গাছের গোড়া হইতে অনেকগুলি ফেঁকৃড়ি জন্মিয়া মনোরম্য ঝাড়ে পরিণত হয় এবং তাহাদিগের প্রত্যেকটীতেই একাধিক শীষ উদগত হয়। যাহা হউক, চারা সমূহে যতদিন না গ্রন্থি দেখা দেয়, ততদিনের মধ্যে যে কয়েকবার বৃষ্টি হইবে, ততবার মাটিতে 'যো' হইলে বিদে পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। জাওলা অবস্থায় বারম্বার বিদে পরিচালিত হইলে দুইটী উপকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ,—ভূমির মৃত্তিকা বিচালিত হয় ও তৃণাদি বিনষ্ট হয় ; দ্বিতীয়তঃ,—মৃত্তিকা সঞ্চালনের সঙ্গে চারিদিকের অনেক মূল ছিন্ন হইয়া গেলে নূতন নূতন বহু শাখা-মূল (lateral roots) জন্মে—তদ্দ্বারা উদ্ভিদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আহারীয় সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে মূল-পোয়ালী সমধিক তেজাল ও ঝাড়াল হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত, উহার গোড়া হইতেও নূতন নূতন ফেঁকড়ি উদগত হয়। বলা বাহুল্য যে, গাছ ঝাড়াল হইলে এবং তাহাদিগের খাদ্যাভাব না ঘটিলে ফসলও অধিক হইবে। বিদে দিবার ২।১

দিন পরে বৃষ্টি হইবার লক্ষণ দেখা যাইলে আপাততঃ বিদে দেওয়া স্থগিত রাখিতে হইবে। বিদে দিবার পরে ৩।৪ দিন খরাণি অর্থাৎ প্রখর রৌদ্র হইলে পরিচালিত মৃত্তিকা উত্তমরূপে শুষ্ক হইতে পায়। অতঃপর, পুনরায় উহার জলশোষণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আশুধান্যের আবাদে মদিকা ও বিদ্ধক পরিচালনের বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। উচ্চ জমিতে বর্ষাকালে অতি শীঘ্র তৃণাদি জন্মিয়া থাকে, এজন্য উহাদিগকে আদৌ বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। ভূমি পরিষ্কার ও মাটি আল্গা থাকিলে পোয়ালি অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও ঝাড় বাঁধে। নাবাল জমিতে তৃণাদি না জন্মিলে এবং জলে না হাজিয়া মরিয়া গেলে, ধান্যের কোন অনিষ্ট হইতে পায় না। এইজন্য, নাবাল জমি অপেক্ষা উচ্চ জমির আবাদে অপেক্ষাকৃত অধিকবার বিদে ও মই দিতে হয়। এতদুভয় প্রক্রিয়াদ্বারা নিড়েন করিবার খরচ অনেক বাঁচিয়া যায়। তাহা ব্যতীত, বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নিড়েনের দ্বারা একদিক হইতে কাজ শেষ করিয়া ক্ষেতের অপর দিকে যাইতে-যাইতে কয়দিন মধ্যে আবার সেই পরিষ্কৃত স্থানে ঘাস জন্মিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ বিদ্ধক পরিচালনা করিলে তাহা হইতে পায় না। বিদ্ধকিত হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষেতের তাবৎ তৃণাদি বিনষ্ট হয় এবং মাটি আল্গা হইয়া যায়। পোয়ালি বড় হইয়া উঠিলে খুরপি বা নিড়েন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ক্ষেতে জল সঞ্চিত হইলে নিড়ানীর আর প্রয়োজন হয় না। যথাসময়ে ধান্য পাকিয়া উঠিলে গোড়া ঘেঁসিয়া গাছগুলিকে কাস্তে দ্বারা কর্ত্তন করিয়া স্থানে স্থানে ফেলিয়া রাখিতে হয়। কর্ত্তন করিবার পরে বৃষ্টি-বাদলের আশঙ্কা না থাকিলে তদবস্থায় কর্ত্তিত ধান্যকে ক্ষেত্রে ২।১ দিন ফেলিয়া রাখিলে ক্ষতি হয় না। পরে খামারে আনিয়া খড় হইতে ধান্যকে পৃথক করিতে হয়। রজকের পাটের মত

এক খণ্ড কাষ্ঠে, খড় গুচ্ছের নিম্নভাগ ধরিয়া আছাড় মারিতে থাকিলে শীষ হইতে দানা খসিয়া পড়ে, অতঃপর খড় সমূহকে আঁটি বাঁধিতে হয় এবং ধান্য সংগ্রহ করিয়া মরাই মধ্যে রাখিতে হয়। অন্য উপায়,—ধান কাটিয়া খামারে আনিয়া বলদ দ্বারা পদদলিত করিয়া ধান্য ও খড় পৃথক করিতে হয়। শেষোক্ত প্রণালীতে ধান্যকে পৃথক করিবার জন্য খামারের এক স্থানে একটী ৫।৬ হাত লম্বা বাঁশ প্রোথিত করতঃ তাহাতে একটী রজ্জু বাঁধিয়া, সেই রজ্জুর সহিত ৪।৫টা বলদ সমশ্রেণীতে যোজিত করিয়া রাখিতে হয়। বলদগণকে এইরূপে যোজিত করিবার পূর্ব্বে বাঁশের চারিদিকে ধান্য প্রসারিত করিয়া বলদদিগকে তাহার উপরে বারম্বার ঘুরাইতে হয়। এইরূপে ধান্য পৃথক হইয়া গেলে খড় স্বতন্ত্র করিবার পর ধান্য সংগ্রহ করিতে হয়। উক্ত প্রণালীতে খড়গুলি এলোমেলো হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে গুছাইয়া রাখিতে হয়। এইজন্য সেই সকল দলিত খড়ের আঁটী বাঁধা যায় না এবং উহা দ্বারা ঘরের ছাউনি করা চলে না, পশুদিগকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া জাব দিবার সুবিধাও হয় না।

বর্দ্ধমান অঞ্চলে আশু ধান্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা „হইয়া থাকে যথা ঃ—আউশ, কচ্‌রি ও কেলশ। ছোটনা আশু এবং বরাণ আশু বা কেলশ—কার্ত্তিকশালের অন্তর্গত। কার্ত্তিকশাল-ধান্য আশ্বিনের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিকের শেষভাগ মধ্যে পাকিয়া উঠে, এইজন্য ইহা কার্ত্তিকশাল নামে অভিহিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আশু ধান্যেরই অন্তর্গত। স্থানবিশেষে কার্ত্তিকশাল ভিন্ন জাতীয় ধান্যরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে।

আমন-ধান্য।—হেমন্ত ঋতুতে আমন-ধান্য পাকিয়া থাকে বলিয়া ইহা হৈমন্তিক-ধান্য নামেও অভিহিত অর্থাৎ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ

মাসে যে সকল ধান পাকে,তাহার অন্তর্গত বহুপ্রকারের ধান্য আছে এবং তাহার অধিকাংশই অল্পাধিক উত্তম। ইহাদিগের ফলনও সমধিক হয়।

বিল, কুড়ি, জোল প্রভৃতি নিম্নভূমিই আমনের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যে সকল ক্ষেতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জল আবদ্ধ থাকে, তাহাতেই উত্তম আমন জন্মে। বর্ষার জল যাহাতে বহির্গত হইয়া যাইতে না পায়, তজ্জন্য আমন-ক্ষেতের চারিদিকে মাটির উচ্চ আল দিতে হয়। ক্ষেতে জলের অভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে খাল বিল হইতে জল আনিয়া ক্ষেত পুরিয়া রাখিতে হয়।

সার।—মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইবার পর প্রথম যো পাইলেই ক্ষেত্রে দুই-তিন পালা চাষ দিতে হয়। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য এই সময়ে উহাতে ধঞ্চে, নীল, অড়হর বা বুট বুনিয়া দিলে আষাঢ় মাসের মধ্যে ঐ সকলের গাছ এক হাত বা ততোধিক বাড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা। সেই সময়ে ক্ষেত্রে একবার উত্তমরূপে হাল ও চৌকি দিলে ঐ সকল চারা ভূমিসাৎ হইয়া যায় এবং ক্রমে পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়। এইরূপে ক্ষেত্রের সমূহ উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। ইহাকে হরিৎ-সার বলা যায়। এইরূপে চাষ দেওয়াকে 'পচান-চাষ' বলে। এতদ্ব্যতীত, আমন ধানের ক্ষেতে নানা-বিধ প্রাণীজ আবর্জ্জনাও প্রদত্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গো-শালার আবর্জ্জনাই সচরাচর ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ গৃহস্থের অঙ্গিনাপার্শ্বস্থ সার-কুড়ের ওঁচলা রাশিও ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া থাকে। আঁটাল মৃত্তিকায় কাঠের ছাইও প্রদত্ত হয়। প্রাণীজ সার দিলে উদ্ভিদের আবশ্যকীয় সকল পদার্থই প্রায় দেওয়া হইল, কারণ অন্যান্য পদার্থ ছাড়া ইহাতে পোটাসিয়ম ও ফস্‌ফরিক্‌-এসিড্‌ বিদ্যমান। উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য এই তিনটী পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন। ছাই প্রয়োগ দ্বারা শেষোক্ত

জিনিষ দুইটী এবং অপরাপর অজৈব জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু যবক্ষারজান বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ পাওয়া যায় না। সাধারণ আবাদী জমিতে আমনের আবাদ করিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে সোরাজান বা যবক্ষারজান দিবার তত প্রয়োজন দেখা যায় না, কারণ তাহা বর্ষার ফসল। এ সময়ে আকাশের জলের সহিত বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারজান যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিতে আসিয়া স্থান পায়। এই জন্য কূপ তড়াগাদির জল অপেক্ষা বৃষ্টির জল উদ্ভিদের পক্ষে এত উপকারী। গোয়াল ও খোঁয়াড়ের জঞ্জাল এবং সর্ষপাদি নানাবিধ খৈল ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। বিঘা প্রতি ৫।৭ গাড়ি হইতে ৮।১০ গাড়ী পর্য্যন্ত জঞ্জাল দিতে পারা যায়। অতিরিক্ত সার দিলে গাছ ষাঁড়াইয়া যায় সুতরাং ফসল অধিক হয় না—খড়ের পরিমাণ অধিক হয়। প্রথম বা দ্বিতীয়বার চাষ দিবার পূর্ব্বে সংগৃহীত সার ক্ষেত্রময় প্রসারিত করিয়া দিবার পরে ক্ষেত্রে কর্ষণ করিতে হয়।* কিঞ্চিৎ অগ্রে এরূপ না করিলে সার বিগলিত হইতে বিলম্ব হয়, ফলতঃ নবরোপিত গাছ সকল প্রথমাবস্থায় সার আহরণের সুযোগ পায় না। খৈল দিতে হইলে গুড়া করিয়া (জাওলা রোপণের পর) ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি এক মণ হইতে দুই মণ ব্যবস্থা।

বীজ-তলা।—ক্ষেতে রুইবার জন্য যে স্থানে বীজের পাত দেওয়া হয় অর্থাৎ বীজ বপন করা যায় তাহাকে বীজতলা কহে। সাধারণ ভূমি হইতে উক্ত ভূমি কথঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক নচেৎ বর্ষার

---

* বেহার প্রদেশে চাষীগণ প্রথম চাষকে 'অক্তা' বা পহেলা, দ্বিতীয়কে 'দোয়ার, তৃতীয়কে 'তেয়ার', চতুর্থকে 'চারম' ও পঞ্চমকে 'পাচম্' চাষ বলে। সচরাচর প্রতি বন্দে অর্থাৎ দফায় ক্ষেত্রে তিন বার চাষ দেওয়া হয়, এজন্য প্রথম তিনটী শব্দের ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

জলে ডুবিয়া যাইতে পারে। চৈত্রমাসে খরাণির সময় বীজতলা প্রস্তত করিবার প্রকৃষ্ট সময়, কারণ এক্ষণে মাটি কর্ষিত হইলে তাহাতে যে সকল তৃণাদির শিকড় থাকে তাহা প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। মাটি বারম্বার সঞ্চালিত হইলেও 'রাব্' দিতে হয়, অর্থাৎ মাটি অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিতে হয়। এতদ্দ্বারা মাটির ভিতরে যে কিছু তৃণাদির শিকড় অথবা কীটাদি থাকে তাহা পুড়িয়া বা ঝলসিয়া যায়, সুতরাং বীজতলায় চারা জন্মিলে আর কোন উপদ্রব থাকে না। অতঃপর, সেই স্থানে পুষ্করিণীর পাঁক অথবা গোশালার আবর্জ্জনা প্রসারিত করিয়া দিবার পর মাটির সহিত উহাকে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। এই সময়ে বিল, ডোবা, পুষ্করিণী, নয়াঞ্জুলি প্রভৃতির জল অনেক স্থলে শুকাইয়া যায়, সুতরাং পাঁক সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। পাঁক বা আবর্জ্জনা দিবার পরে ৭।৮ দিন বীজতলাকে এতদবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারিলে বিশেষ উপকার এই যে, এই কয়দিনে পাঁক বা আবর্জ্জনা মধ্যে যে সকল বীজ থাকে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে এবং তখন ইহাদিগকে বিনাশ করিলে বীজ-তলা জঙ্গলময় হইতে পায় না।

অস্থিচূর্ণ ও সোরা।—এতদুভয়ের মিশ্র-সারের দ্বারা ধান্যের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। সিংহলের কৃষি-সমিতি (Ceylon Agricultural Society) ক্রমান্বয়ে ষোল বৎসরকাল উক্ত মিশ্র-সার ব্যবহার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত মিশ্র-সারের দ্বারা শস্য ও খড় —উভয়েরই ফলন যথেষ্ট হইয়া থাকে। এতদর্থে তাঁহারা প্রতি বিঘায় ১/০ মণ অস্থিচূর্ণ ও দশ সের সোরা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহার ফলে, প্রতি বিঘায় প্রায় ১৭/০ ধান্য এবং ২৪/০ হইতে ২৫/০ খড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সারের গুণবত্তা যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা

বিস্ময়কর নহে। উল্লিখিত সার ব্যবহারে বিঘা প্রতি ৬৲ বা ৭৲ টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়িতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও, খরচ বাদে প্রভূত লাভ থাকে। ক্ষেত হইতে যাহাতে প্রভূত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামীরই অক্ষুণ্ণ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বীজতলার কাঠা-প্রতি জমিতে দুই সের বীজ ফেলিতে হয়। বীজ ভাল না হইলে ইহার দ্বিগুণ বীজই ফেলিতে হইবে।* এক কাঠার পোয়ালিতে এক বিঘা ভূমি রোয়া হইতে পারে। বীজতলার মাটি বিশেষ সারাল এবং চূর্ণীকৃত হওয়া উচিত নতুবা পোয়ালি সকল ক্ষীণ ও লম্বা হয়, ফলতঃ তাহাতে ভাল ফসল হয়না। বীজতলার মাটি একদিকে যেমন উত্তমরূপে চূর্ণীত হওয়া উচিৎ, অন্য দিকেও দেখিতে হইবে মাটি যেন আল্গা থাকে। এইজন্য বীজ পাত দিবার পূর্ব্বে চৌকি বা মই দ্বারা মাটি চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাটি আল্গা থাকিলে পোয়ালি সকলের মূল মৃত্তিকার মধ্যে অনেক দূর গিয়া পড়ে, সুতরাং উৎপাটন কালে অনেক শিকড় ছিঁড়িয়া যায়। অতঃপর, বীজ বপন করা হইলে তাহাতে একবার উত্তমরূপে চৌকি দেওয়া আবশ্যক। এক্ষণে চৌকি বা মই দিলে বীজ সকল মাটিতে ঢাকিয়া ঘনভাবে মাটির সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন শীঘ্রই চারা জন্মিয়া থাকে। ধানের চারা দেশবিশেষে পোয়ালি, জাওলা, বীজ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত বীজ বপনের প্রণালীকে বুনানী-পাত বলে। অপর প্রণালীর নাম—

নেওচা-পাত।—ক্ষেতে অল্প জল বাঁধিয়া মাটিকে কাদা করতঃ বীজ বুনিবার প্রণালীকে নেওচা-পাত বা নেওচা-করা বলে। উক্ত প্রণালীতে বীজের পাত দিতে হইলে বীজতলায় ৮।১০ আঙুল জল

* দ্বিগুণ বীজ বপন অপেক্ষা বীজধান উত্তমরূপে বাছাই করা অকীটদষ্ট বীজই ব্যবহার করা উচিত।

থাকা প্রয়োজন। ঈষৎ আবদ্ধ জল না থাকিলে বহির্দ্দেশ হইতে জল আনিয়া ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে আবদ্ধকরতঃ পুনঃ পুনঃ হাল ও মই বা চৌকি দ্বারা ক্ষেতের মাটিকে উত্তমরূপ কাদায় পরিণত করিতে হয়। মাটি উত্তম থকৃথকে কাদাটে হইলে তাহার উপরে বীজ-ধান ছড়াইয়া দিতে হয়। মৃত্তিকার তারল্য হেতু বীজসমূহ আপনভারে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়, সুতরাং বীজ বুনিবার পরে বুনানী-পাতের ন্যায় আর মদিকা বা চৌকি পরিচালন করিতে হয় না। ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় জল থিতায়, কাদার মাটি ভূমিতে গিয়া স্থির হয় এবং জল উপরে স্বতন্ত্র থাকে। এইরূপে ঘোলা জল থিতাইয়া পরিষ্কার হইলে বীজতলার কোনও স্থানের আল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। কয়েক দিবস এইরূপ অবস্থায় থাকিলেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে; তখন একবার ক্ষেতের উপরে কিছু সার ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় ক্ষেত জলপূর্ণ করিয়া দিতে হয়, কিন্তু সাবধান, যেন অতিরিক্ত জলে চারা সকল ডুবিয়া না যায়। ৬।৭ দিনের মধ্যে ক্ষেত্রের উপরিভাগে চারা দেখা যায়।

যে প্রণালীতেই বীজপাত দেওয়া হউক, চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে সর্ব্বদা ক্ষেতে জল আবদ্ধ রাখা আবশ্যক, নতুবা চারা সকল শীর্ণ হইয়া পড়ে। ধান্যকে,—বিশেষতঃ আমন ধান্যকে, একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ বলিলে কোন ক্ষতি হয় না। বিনা জলে ধান জন্মে না—বাড়ে না,—ফসলও প্রদান করে না। বীজতলায় জলের অভাব হইলে আর এক বিষম আপদ আছে—শ্যামা, মুথা প্রভৃতি ঘাসের আবির্ভাব হয় এবং তাহারা ক্ষেত্রের সার আহরণ করে অথবা অপহরণ করে ফলতঃ চারা অবাধে বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে অসুবিধা হয়। পোয়ালি আধ হাত, কি তিন-পোয়া আন্দাজ বড় হইয়া উঠিলে, ক্ষেতে রোপণ করিবার উপযোগী

হয়। ইহাপেক্ষা ছোট অবস্থায় রেপণ করিলে আকস্মিক প্রভূত পরিমাণ বৃষ্টি হইলে অথবা বন্যার ক্ষেতে যদি জল বাড়িয়া উঠিলে চারা সকল ডুবিয়া যায়, আবার অধিক বড় গাছ পুতিলে রৌদ্রে শুকাইয়া যায়, কিম্বা বাতাসে হেলিয়া পড়ে।

রোপণ।—আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ হইতে শ্রাবণের পণর-কুড়ি দিনের মধ্যে রোপণকার্য্য শেষ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। ধান্যের চারা রুইবার এই সময়কে 'সেরা-বাত' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সময় বলে। এই সময়ে যে সকল চারা ক্ষেত্রে রোপিত হয় তাহাতে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু 'নামলা-বাতের' অর্থাৎ বিলম্বে রোয়া-ক্ষেত্রে তেমন হয় না। এজন্য ইতঃপূর্ব্বে সকল কার্য্য সারিয়া সেরা-বাতের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে, এবং সময় আগত হইলেই রোপণকার্য্য শেষ করিতে হইবে। আষাঢ় মাসের যে কোন সময়ে ক্ষেতে জল সঞ্চিত হইলেই ভূমিতে কাদাল-চাষ দিয়া রোপণোপযোগী করিতে হইবে। ক্ষেত্রে জলের অভাব থাকিলে অথবা অপ্রাচুর্য্য হইলে নিকটস্থ খানা-ডোবা হইতে জল আনিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে আবদ্ধকরতঃ উত্তমরূপে কর্ষণাদি দ্বারা কাদা করিতে হইবে। এইরূপে ক্ষেত তৈয়ার হইলে বীজতলা হইতে পোয়ালি আনিয়া রোপণ করিতে হইবে। রোপণের পূর্ব্ব দিবস পাত হইতে ধীরে ধীরে টানিয়া চারাসমূহকে উৎপাটন করতঃ গুচ্ছ বাঁধিতে হয়। অনন্তর, সেই সকল গুচ্ছকে এমন করিয়া জলে ধৌত করিতে হইবে, যেন চারার গোড়ায় আদৌ না মাটি থাকে। এই অবস্থায় এক রাত্রি গুচ্ছদিগকে ফেলিয়া রাখিলে পোয়ালিগণের গোড়ায় নূতন আঁকড়ি বা মূলের উদ্ভব হয়। এরূপ অবস্থায় রোপণ করিলে উহাদিগের মূল অপেক্ষাকৃত শীঘ্র মৃত্তিকায় সংলগ্ন হয়। অনেক সময় রোপণকালে চারা কম পড়িয়া যায়, তখন বীজতলা হইতে চারা সদ্য

তুলিয়া আনিয়া রোপণ করিতে হয়। অতঃপর, কতকগুলি গুচ্ছ একত্রে বাঁধিয়া এক-একটী বোঝা করিতে হয় এবং সেই সকল বোঝার দুইটী বোঝা প্রতি বাঁকে বা ভারে ঝুলাইয়া ক্ষেত্রে আনয়ন করতঃ পোয়ালি সকলকে রোপণ করিতে হইবে। এক্ষণে বোঝা খুলিয়া বামহস্তে একটী করিয়া আঁটি বা গোছা লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক-একটী চারা আধ হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। নাম্‌লা-বাতের গাছ সেরা-বাতের পোয়ালী অপেক্ষা ঘনভাবে রোপিত হয়, কারণ বিলম্ব হেতু উহাদিগের ঝাড় বাঁধিবার সময় থাকে না সুতরাং অধিক স্থানেরও আবশ্যক হয় না। চারার গোড়ায় নূতন ফেঁকৃড়ি বা চারা উদ্গত হইয়া থাকিলে একটী বা দুইটী পোয়ালি রোপণ করিতে হইবে। পোয়ালি রোপণের জন্য খুরপি, নিড়েন প্রভৃতি কোন যন্ত্রেরই আবশ্যক হয় না—হস্তদ্বারা কাদায় পুতিয়া দিলেই হইল। রোপণকার্য্য আরম্ভ করিয়া মধ্যে মধ্যে আর স্থগিত না রাখিয়া অবিলম্বে কার্য্য সমাধা করা উচিত। নামলা-বাতের চারা ভাদ্র মাসের শেষ অবধি ক্ষেতে রোপিত হইতে পারে। কোন কোন বৎসর অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন বা বন্যা হেতু ক্ষেত-পাথার অপরিমিত জলে ডুবিয়া গেলে রোপণে বিলম্ব ঘটে, অতঃপর জল নামিয়া গেলে আশ্বিন মাসেও রোপিত হইতে দেখা যায় কিন্তু এ সময়ে রোপণ করিয়া চারি আনার অধিক ফসলের প্রত্যাশা করা যায় না। বর্ষা অত্যন্ত নাবি হইলেও রোপণকার্য্যে বিলম্ব ঘটে।

ধান্যের পোয়ালি কতদূর অন্তর এবং প্রত্যেক গর্ত্তে কয়টী করিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সিংহলে কৃষি-সমিতি উপর্য্যুপরি পরীক্ষার দ্বারা এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, এক বিতস্তি (৯ ইঞ্চি) হইতে এক ফুট অন্তর চারা রোপণ করিলে ভাল হয়। অতঃপর, প্রত্যেক গর্ত্তে

২।৩টীর পরিবর্ত্তে একটী গাছ বসাইলেই যথেষ্ট হয়। ঘনভাবে রোপণ করিলে কিম্বা গুচ্ছ রোপিত হইলে, গাছ অধিক বর্দ্ধিত বা গুচ্ছাল হয় না সুতরাং সেরূপ রোপণে কোন ফল নাই। এতদ্দ্বারা আরও বিশেষ লাভ যে, বীজের সাশ্রয় হয় এবং খড় ও শস্য—উভয়েরই ফলন অধিক হয় কিন্তু—

এ সম্বন্ধে বিবেচনার কয়েকটী বিষয় আছে। সকল দেশে বা সকল প্রকার জমিতে এ নিয়ম নির্দ্দিষ্টভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যে দেশের বারিপাত স্বভাবতঃ অল্প, কিম্বা যে জমির মাটি বালিপ্রধান, অথবা যে জমি অনুচ্চ ও রসধারণক্ষম নহে, তথায় এত অধিক দূর অন্তর রোপণ করা বিধেয় নহে, কারণ তথায় গাছ তাদৃশ বৃদ্ধিশীল হয় না, তন্নিবন্ধন মৃত্তিকামধ্যে রৌদ্র ও বাতাস অবাধে প্রবিষ্ট হইয়া মাটির রস টানিয়া লয়। যে দেশের বারিপাত অধিক, কিম্বা যে জমি নাবাল ও সারাল, তথাকার পক্ষে এ নিয়ম বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মদেশ, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, নিম্নবঙ্গ, তরাই প্রভৃতি স্থানে নিরাপদে এ প্রথা অবলম্বন করা যইতে পারে। সকল ক্ষেত্রস্বামীর ইহা পরীক্ষা করা উচিত। যাহা হউক—

রোপণ করিবার পর হইতে ক্ষেতে ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ আধ হাত জল থাকা প্রয়োজন। বৃষ্টির অভাবে ক্ষেতের জল শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইলে এবং সুবিধা থাকিলে নিকটের খাল বিল, ডোবা বা নয়ানজুলির জলের দ্বারা ক্ষেত পুরিয়া দিতে হইবে। গাছ বৃদ্ধির সহিত জলের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। দিনে রৌদ্র রাত্রে বৃষ্টি—সকল উদ্ভিদের—বিশেষতঃ ধান্যের জন্য বিশেষ আবশ্যক। ক্ষেত নিরন্তর জলপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও গাছ সকল তেজাল হইয়া না উঠিলে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেতে সারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরূপ অবস্থায় আলু কাটিয়া

দিয়া ক্ষেতের জল নিকাশ করিয়া দিবার পর, জল একটু টানিয়া গেলে তাহাতে বিঘা প্রতি দেড় মণ হইতে দুই মণ হিসাবে সর্ষপ কিম্বা রেড়ির খৈলচূর্ণ অথবা এক মণ সোরা ছড়াইয়া দিতে হয়। অতঃপর, একবার নিড়েন করিয়া দিলে প্রসারিত সার মাটির সহিত মিশিয়া যায়, তখন আবার ক্ষেত্রকে জলপূর্ণ করিয়া দিলে অগৌণে অর্থাৎ ৮।১০ দিন মধ্যে পাংশুবর্ণতা বিদূরিত হইয়া ক্রমে গাছ হরিদ্বর্ণ ধারণকরতঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাদের মূলদেশ হইতে নূতন ফেঁকৃড়ি উদ্গত হয়। ঈদৃশ অবস্থায় সার সংযুক্ত করিতে হইলে শ্রাবণ মাস বা ভাদ্র মাসের প্রথম ৫।৭ দিনের মধ্যে করা উচিত, নতুবা তদ্দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, কারণ বিলম্ব হেতু গাছের বৃদ্ধি ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসে, কাজেই তখন উহারা আর সে সার আহরণ করিবার অবসর বা সময় পায় না।

রোপণ করিবার অগ্রপশ্চাৎ হেতু আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ধান গাছে থোড়ের সঞ্চার হয়। থোড় জন্মিলেই গাছের বৃদ্ধি শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। থোড়,—শীষের বাহক মাত্র। শীষ মাথায় লইয়া গাছের মধ্যে থোড় উঠিতে থাকে। কদলী, গোধূম, ভূট্টা প্রভৃতি অন্তঃসার (Endogenous) উদ্ভিদ যে নিয়মে মোচা লইয়া উঠে ধান্যের গাছও সেই নিয়মের অধীন, কারণ ধান্যও সেই বর্গীয় অর্থাৎ অন্তঃসার-উদ্ভিদ। উদ্ভিজ্জগতে ইহা একটী সুবৃহৎ শ্রেণী বা বিভাগ এবং উক্ত বর্গীয় অধিকাংশ গাছই ফল প্রসব করিবার পরে মরিয়া যায়। কদলী, ভুট্টা গোধূম, যব প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

যাহা হউক, কাণ্ড ভেদ করিয়া শীষ বাহির হইলেই যে তন্মধ্যে তণ্ডুল পাওয়া যায় এমন নহে। প্রথমাবস্থায় ধান্যের আবরণ মধ্যে পুষ্প ব্যতীত কিছুই থাকে না, পরে ক্রমশঃ উহার মধ্যে শ্বেত তরল পদার্থের সঞ্চার

হয়—ইহাকে ধান্যের দুগ্ধ কহে। উক্ত দুগ্ধ পরিপক্ক হইয়া ক্রমে কঠিন ভাব ধারণ করে এবং তখনই উহাকে তণ্ডুল বা চাউল বলা যায়। ধান্যের মধ্যে দুগ্ধের সঞ্চার হইবার দিন হইতে ধান্য পাকিতে ১৩,১৪ দিন সময় লাগে। ধান্য সুপক্ক হইয়া উঠিলে ফসল কাটিয়া যথানিয়মে ঝাড়াই-মলাই করিয়া মরাই মধ্যে রাখিতে হয়।

আমনের তিনটী জাতি আছে, কিন্তু আবাদ প্রণালীর কোন স্বতন্ত্র নিয়ম নাই, তবে জাতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। উক্ত তিন প্রকার আমন—ছোট্‌না-বাগ্‌ড়ে, বারণ-বাগ্‌ড়ে ও রাঢ়ী-আমন।

ছোট্‌না-বাগ্‌ড়ে জাতীয় ধান্য অনতিগভীর জলেই ভালরূপ জন্মে। যে জমিতে আড়াই হাতের অধিক জল দাঁড়ায় তাহাতে ইহার অনিষ্ট হয় —গাছ পচিয়া যায়। এরূপ জমিতে আবাদ করিবার জন্য বরাণ-বাগড়ে প্রশস্ত, কারণ ক্ষেতের উপর ক্রমে ক্রমে ২০ হাত জল দাঁড়াইলেও বরাণ-বাগ্‌ড়ের গাছ সঙ্গে সঙ্গে সেই মত বাড়িয়া উঠে এবং জলের উপরিভাগে শিরোভাগ মাত্র জাগিয়া থাকে। ছোটনার ফসল অগ্রে এবং বরাণের ফসল কিছু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। রাঢ়ী-আমনের অন্তর্গত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট জাতীয় ধান আছে। ইহাদের আবাদ প্রণালীর কোন তারতম্য নাই। রাঢ় দেশে ইহারা সমধিক পরিমাণে জন্মে এবং তথাকার মাটি ও জলবায়ু ইহাদের অনুকূল, এই জন্য ইহারা রাঢ়ী-আমন নামে অভিহিত। ইহাদিগের ফসল বড় নাবী অর্থাৎ অতিশয় বিলম্বে পাকে। সচরাচর মাঘ মাসের পূর্ব্বে ইহার ফসল পাকে না। রাঢ়ী-আমনের মধ্যে উড়ে, কনকচূর ও মৈনকী—এই তিন প্রকার ধান্যে খৈ তৈয়ার হয় এবং তাহাদিগের ফলন খুব বেশী হয়। উড়ে জাতীয় ধান্য পাকিলেই খসিয়া পড়ে। এজন্য কিঞ্চিৎ অগ্রে সংগ্রহ করা উচিত। রাঢ়ীর অন্তর্গত 'বোকা' নামে এক জাতীয় ধান্য আছে। অন্ন

প্রস্তুত করিবার জন্য তাহায় তণ্ডুল সিদ্ধ করিতে হয় না,—ক্ষণকাল জলে ভিজাইয়া রাখিলেই তাহা অন্নে পরিণত হয়।

প্রায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট চাউল আমনের অন্তর্গত। নানাবিধ চাউলের মধ্যে পাটনাই, পেশোয়ারি ও ফিলভিট চাউল উৎকৃষ্ট। উক্ত কয় প্রকার চাউলেই সচরাচর পোলাও তৈয়ার হইয়া থাকে। দাউদকান্দি (দাদখানি) চাউল খুব সরু এবং মূল্যও অধিক। ধনীদিগের মধ্যে ইহার চলন অধিক। রুগ্ন ব্যক্তিদিগের জন্য ডাক্তার-কবিরাজেরা দাদখানি চাউলের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গোবিন্দভোগ, মালভোগ, রাধুনী-পাগল প্রভৃতি কয়েক জাতীয় চাউলের অন্ন অতি সুবাসিত এবং আস্বাদ অতি উপাদেয়। এই সকল চাউলের পরমান্ন উত্তম হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ জেলায় বহুল পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয় এবং তৎসমুদায় 'বালাম' নামে খ্যাত। সচরাচর ব্যবহারের পক্ষে উহা অতি উত্তম চাউল কিন্তু তাদৃশ পুষ্টিকর নহে।

বোরো ধান্য।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বোরো ধান্যের চাউল অতি নিকৃষ্ট এবং তাহার বর্ণও মলিন। বন্যায় ক্ষেত-পাথার ডুবিয়া গেলে অনেক সময় আমন ধান্যের আশা থাকে না, তখনই লোকে বোরোর আবাদ করে,কিন্তু বারমাসই ইহার আবাদ হইতে পারে। ক্ষেত ডুবিয়া গেলে পলি পড়িয়া এবং তৃণাদি পচিয়া স্বভাবতঃই মাটি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, এইজন্য তজ্জাত বোরো-ধান্যের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়—এমন কি বিঘা প্রতি বিশ মণ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। জল হটিয়া যাইবার পর তাহাতে বোরোর আবাদ করিলে প্রভূত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। বিগত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের মতিঝিল নামক সুবিস্তৃত জলাশয়ের কিনারায় ইহার আবাদ করিয়া বিঘা প্রতি কুড়ি মণ ধান্য পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ জমি বোরোর পক্ষে প্রশস্ত।

এইরূপ জমিতে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বোরোর আবাদ করিতে পারা যায়। বপন ও রোপণ—দুই প্রণালীতেই বোরো ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। যে নিয়মে আশু-ধান্যের বীজ বুনিতে হয়, বোরোর বুনানীও সেইরূপ।

বুনানী আবাদে সচরাচর কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বুনিতে হয়। ইহার পক্ষে উচ্চ জমি পরিহার করিয়া উল্লিখিত জাতীয় জমিতে যথাসময়ে যথারীতি হলচালনাদি দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিয়া বিঘায় ১৫।১৬ সের বীজ বপন করিতে হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ধান পাকিয়া উঠিলে যথানিয়মে গৃহজাত করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, চারা উৎপন্ন হইলে ক্ষেত্রে জল বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

রোয়া-বোরো।—বুনানী আবাদ অপেক্ষা রোয়া আবাদে সকল প্রকার ধান্যেরই ফসল অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে সুতরাং রোয়া-বোরো সে নিয়মের বহির্ভূত নহে।

রোপণ করিবার জন্য বীজ ধান্যকে অঙ্কুরিত করিয়া পরে বীজতলায় পাত দিতে হয়। অঙ্কুরিত করিবার জন্য বীজধান্যকে কোন পাত্রে ২৪-ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে জল ফেলিয়া দিয়া, বীজ গুলিকে কোন স্থানে ২।৩ অঙ্গুলি পুরু করিয়া প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। যে স্থানে ধান্যকে ঐ রূপে বিস্তৃত করিয়া দিতে হইবে, সেইস্থানে একখানি চট্ বা থোলে কিম্বা কদলী পত্র পাতিয়া তাহার উপর ধান্যকে ঐরূপ প্রসারিত করিয়া দিয়া তদুপরি আবার কদলী পত্র অথবা বিচালি চাপা দিতে হয়। কদলী পত্র অপেক্ষা বিচালি কার্য্যকরী, কারণ বিচালি সিক্ত থাকিলে শীঘ্রই তাহাতে উত্তাপ জন্মে এবং সেই উত্তাপ সংযোগে তন্নিম্নস্থিত ধান্যও শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। আবৃত ধান্য শুষ্ক হইয়া গেলে অঙ্কুরিত হয় না, আবার অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে

নবোদ্গত অঙ্কুর বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে এরূপ বিঘ্ন না ঘটে তজ্জন্য আবৃত ধান্যের উপরে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে জলের ছিটা দিতে হয়। এইরূপে ৪।৫ দিনের মধ্যে ধান্য সমুহ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অতঃপর, সেই ধান্য বপন করিতে পারা যায়। এই সময়ে ধান্যকে নাড়াচাড়া করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক নতুবা অঙ্কুর সকল ছিঁড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক বিঘা পাতের জমিতে ছয় সের ধান্যের প্রয়োজন হয়।

ইতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট পাতভূমিকে নেওচা করিয়া রাখিতে হয়। এক্ষণে অঙ্কুরিত বীজ আনিয়া আমনের নিয়মে বপন করিতে হইবে। ৪।৫ দিন পরে গাছ বাহির হইলে বীজতলায় ক্রমশঃ অল্প করিয়া জল ভরিয়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য, জলে গাছ না ডুবিয়া যায়। জাওলা যেমন দিন দিন বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে জলের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ, পাত-ভূমিতে জলের না অভাব হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

এক্ষণে ক্ষেতের মাটি কর্দ্দমাক্ত করিয়া লইতে হইবে। এ সময়ে বর্ষা প্রায় শেষ হইয়া যায়, ক্ষেতের মাটি বসিয়া যায়, ইত্যাদি কারণে তখন সকল ক্ষেতে হলকর্ষণাদি চলে না, অগত্যা কোদাল দ্বারা মাটি কোপাইয়া পাঁচ-সাত দিনের জন্য ক্ষেতে জল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে কয়েক দিন ক্ষেত জলপূর্ণ থাকিলে মাটি সহজে কাদাটে হইয়া যায়। মাটিতে যদি হলচালনা করিবার সুবিধা না হয় অর্থাৎ মাটি যদি দৃঢ় ও ঘন থাকে তাহা হইলে পা দিয়া চট্‌কাইয়া কাদা করিতে হয়। ইহা অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য। যাহা হউক, ক্ষেত যদি গড়েন হয় তাহা হইলে তাহার মাঝে মাঝে এমন ভাবে আল্ দিতে হইবে, যেন সর্ব্বত্র জল অবরুদ্ধ থাকিতে পারে। এক্ষণে ক্ষেত্রমধ্যে

আধ হাত অন্তর ৪।৫টী জাওলা রোপণ করিতে হইবে। খরাণের দিনে কাদাটে মাটি ক্রমশঃ জমাট বাধিয়া যায়, তন্নিবন্ধন তাহাতে নবরোপিত চারা সমূহ কণ্ঠরুদ্ধবৎ হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অবস্থায় থাকিতে দিলে চারা সকল অচিরে মরিয়া যায়, কিন্তু সেই সময়ে ক্ষেতের মাটি একবার হস্তপদাদির দ্বারা বিচলিত করিয়া দিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়, ফলতঃ উহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এইরূপে মৃত্তিকাকে পরিচালিত করিবার সময় প্রত্যেক গাছের গোড়া ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হয়। অতঃপর আমন ধান্যের যেরূপে পাট করিতে হয়, বোরো ধান্যের পক্ষের সেই সকল প্রণালী অবলম্বনীয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বোরো ধান্য পাকিয়া উঠে।

জলি-ধান্য।—ইহা যে স্বতন্ত্র জাতীয় ধান্য তাহা নহে। আশু—বিশেষতঃ ছোটনা-আশু জলা-ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম জলি-ধান্য। নদীতীর, চর ও জলা-ভূমিতে ফাল্গুন মাসে ইহার বীজ বুনিতে হয়। যে কোন ধান্যই হউক, আমনের ন্যায় আবাদ করিলে সকল ধান্যেরই সময়-অসময়ে ফসল পাওয়া যায়, তবে যে জাতীয় ধান্য যে সময়ে ও যেরূপ ভূমিতে জন্মিয়া থাকে, তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া আবাদ করা উচিত।

তামাক

(Lat. Nicotiana. Tabacum. Eng. Tobacco.)

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—সংস্কৃত ভাষায় ইহা তাম্রকূট নামে অভিহিত। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে নদীয়া, যশোহর, পাবনা,

রঙ্গপুর, জলপাইগুলি, কুচবিহার, পূর্ণিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি বাঙ্গালা ও বেহারের নানা জেলায় তামাকের যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ, নদীয়া ও রঙ্গপুর জেলা, বেহারের অন্তর্গত মতিহারি এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। তামাকের জমির খাজানা অপরাপর ক্ষেতের তুলনায় অত্যন্ত অধিক। দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত বছৌর পরগণায় তামাকের জমির খাজানা বার্ষিক ৮৲ টাকা হইতে ৪০৲।৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য আছে। সে সকল জমিতে কৃষকেরা তামাক ব্যতীত অপর কোন ফসলের আবাদ করে না। তামাকের ফসল সংগৃহীত হইবার পর হইতে পর বৎসরের আবাদের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষেতকে 'চৌমাস' অর্থাৎ বিশ্রাম দেয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে জমিতে চাষ দিয়া রাখে।

স্থানীয় আবহাওয়া এবং মৃত্তিকার পরিগঠন, প্রাকৃতিক অবস্থাভেদ প্রভৃতি কারণে তামাকের গুণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত, আবাদ-প্রণালীর তারতম্যে তামাক নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হয়। তামাক বুভুক্ষু ফসল—শীঘ্রই মাটিকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে।

সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দো আঁশ অপেক্ষা ঈষৎ বেলে মাটিতেই ভাল হয়। এঁটেল মাটিতে যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহা ওজনে ভারি হয়, কিন্তু দো-আঁশ মৃত্তিকাজাত তামাকের ন্যায় গুণ-সম্পন্ন হয় না। বালুকাপ্রধান ক্ষেত্রোৎপন্ন তামাক অতিশয় নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমধিক উচ্চ অপেক্ষা ঈষন্নিম্ন ও সমতল জমি তামাকের পক্ষে প্রশস্ত। ঈদৃশ জমিতে বর্ষাকালে অল্পাধিক জল সঞ্চিত হইয়া থাকে ফলতঃ বর্ষার পরেও মাটি সরস থাকে। তামাকের জন্য বিশেষ

উর্ব্বরা জমির আবশ্যক। শ্রাবণ মাসের শেষভাগ মধ্যেই জমি হইতে ভাদুই ফসল সংগৃহীত হইলে সচরাচর তাহাতেই তামাকের আবাদ হইয়া থাকে কিন্তু যাহারা উত্তম তামাক উৎপন্ন করে তাহারা ভাদুই ফসলের প্রত্যাশা রাখে না।

ভাদুই ফসল সংগৃহীত হইবার পরেই অথবা ভাদ্র মাসের মধ্যে বা আশ্বিনের প্রথমভাগে কর্ষণাদির দ্বারা মাটি তৈয়ার করিতে হয়। চাষ দিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রোপরি সার প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রোপরি সমভাবে সার প্রসারিত হওয়া উচিত, নচেৎ কোন স্থানে অধিক, কোন স্থানে অল্প সার পড়ে, আবার অনেক স্থান বে-সার অবস্থায় থাকিয়া যায়, তন্নিবন্ধন ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমভাবে গাছের বৃদ্ধি হয় না এবং তামাকের গুণেরও সামঞ্জস্য থাকে না। উলু, কেশে প্রভৃতি মৃত্তিকার শক্তি অপহারক বুবুক্ষু তৃণসম্পন্ন ভূমিকে সদ্য ভাঙ্গিয়া তাহাতে তামাকের আবাদ করা উচিত নহে, কারণ উল্লিখিত আগাছা সকল মাটির জান্ নষ্ট করিয়া দেয়। ঈদৃশ জানবিহীন জমিতে আবাদ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাঘ-ফাল্গুন মাস হইতে ক্ষেত্রের কর্ষণাদি কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। গভীর চাষ দিয়া মাটি হইতে তৃণাদির শিকড় সাধ্যমত বাছিয়া ফেলিয়া বিঘা প্রতি ২/• দুই মণ চুণ ছড়াইয়া দিবার পর, পুনঃ পুনঃ হলচালনাদি করা উচিত। আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে ১০।১২ বার বা ততোধিক বার ক্ষেত্রকে কর্ষণাদি দ্বারা 'লাল' করিয়া তুলিতে হইবে।

তামাকের ক্ষেতে কৃষকগণ সচরাচর ছাই দিয়া থাকে। কেবল ছাই দ্বারা তামাক ক্ষেতের সকল অভাব পূরণ হয় না। তামাকের ক্ষেতে গো-শালা, অশ্বশালা বা ছাগ ও ভেড়িশালার আবর্জ্জনা, সোরা, ছাই, চুণ প্রভৃতি বিশেষ উপকারী। চুণ ব্যবহার করিতে হইলে চারা

রোপণের ২।৩ মাস পূর্ব্বে উহা ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া পরে হল-চালনাদি করা উচিত। চুণ ব্যবহার করিলে জৈব সার বহু পরিমাণে দেওয়া উচিত। যে সারই ব্যবহৃত হউক, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে সম্মিলিত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষেতের প্রকৃতি, পরিগঠন এবং তাহার বর্ত্তমান উর্ব্বরতার মাত্রা বুঝিয়া তাহাতে প্রয়োজনমত গবাদি পশুশালার সার দেওয়া চলিতে পারে। হাতীশালার আবর্জ্জনায় বিপুল উদ্ভিজ্জ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। উক্ত সার বর্ষাকালে ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। সংক্ষেপে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, তামাকের জমিতে চুণ, সোরাজানসম্ভূত-সার ও পটাস (potosh) বিশেষ উপকারী। উল্লিখিত প্রাণীজ পদার্থসমূহ ও সোরা,—সোরাজান জাতীয় এবং চুণ অস্থিভস্ম বা অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি চুণ জাতীয় পদার্থ। কলা-বাগান হইতে কলা গাছের শুষ্ক পাতা ও বাস্‌না সংগ্রহ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ছাই উৎপন্ন হয় তাহাতে বহু পরিমাণে পোটাস থাকে, এহ জন্য অপরাপর ক্ষার অপেক্ষা ইহার ক্ষার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বীজ বপন।—যথায় বীজ বপন করিতে হইবে তথাকার মৃত্তিকা হাল্কা ও চূর্ণিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথা বীজ-অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। বীজ বুনিবার জন্য ক্ষেতের অদূরে একটি ভাঁটি প্রস্তুত করিতে হয়, এবং তাহা সাধারণ জমি অপেক্ষা ঈষৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক নতুবা বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা, উপরন্তু ভাঁটির মাটিও সিক্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ সিক্ত মাটিতে বীজ পচিয়া যায় কিম্বা অত্যধিক সর্দ্দি লাগিয়া চারা মরিয়া যায়। ভাঁটির মাটি চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে তৃণাদির শিকড় বাছিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর, তাহাতে পুরাতন ঝুরা গোবরসার মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে

বীজ বুনিবার পূর্ব্ব দিবস তাহাতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখিলে মাটিতে রস বাঁধে। ইদানীং প্রমাণিত হইয়াছে যে, কচুরী (water Hyacinth) পটাসপ্রধান উদ্ভিদ এবং উহার ভস্মে যথেষ্ট পটাস বিদ্যমান। সুতরাং কচুরী বা কচুরীভস্ম তামাক-ক্ষেতে সংযোজিত করিতে পারিলে তামাকের বিশেষ উপকার হয়। যাহা হউক—

পরদিবস প্রাতে সেই সিক্ত মাটিকে খুরপী বা নিড়েনের দ্বারা উলট-পালট করিয়া সমস্ত দিবস বাতাস লাগিতে দিলে মাটির অতিরিক্ত রসের ভাগ শুষ্ক হইয়া মাটিতে যো হয়, মাটি ঝুরা ঝুরা হয়। মাটির অবস্থা এইরূপ হইলে অপরাহ্নে ভাঁটীতে বীজ বপন করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে আবাদের জন্য এক ভরি বীজ লাগে। বীজ ক্ষুদ্র বলিয়া বপন-কালে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে না, এইজন্য উহার সহিত ৮।১০-গুণ ঝুরা মাটি বা ছাই মিশাইয়া হাপোরে বপন করিতে হয়। বীজ যাহাতে হাপোরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। ঘনভাবে বীজ পতিত হইলে চারাও অতিশয় ঘনভাবে জন্মে এবং ঘনরূপে জন্মিলে স্থানাভাবে বহু চারা মরিয়া যায়। একভরি বীজ বপন করিবার জন্য ষোল বর্গ (৪×৪) হাত পরিমিত স্থানের উপর হাপোর করিতে হইবে। হাপোরে সমভাবে দানা পতিত হইলে ভবিষ্যতে চারাদিগের স্থানাভাব হয় না, সুতরাং তাহারা শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে ও তেজাল হয়। বীজ বপন করা হইলে ভাঁটির মাটি ধীরতা সহকারে হস্ত দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া দিবার পর, তদুপরি একখানি কাগজ প্রসারিত করতঃ হস্তপুট দ্বারাই মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। এইরূপে চাপিয়া দিলে বীজ সকল মৃত্তিকা সংলগ্ন হয় এবং শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বপনকার্য্য সমাধা করিয়া ভাঁটীর উপর এক অঙ্গুলি পরিমিত স্থূল করিয়া খড় প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। ৫।৬ দিনের পর হইতে

মধ্যে মধ্যে দেখিতে হইবে যে, বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে কিনা। যদি অঙ্কুরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভাঁটীতে আর খড় রাখিবার আবশ্যক নাই। বীজ অঙ্কুরিত না হওয়া অবধি ভাঁটিতে আদৌ জলসেচন করা উচিত নহে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে মাটির অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে হাপরে জলসেচন করিতে হইবে। বীজ বপিত হইবার পর যদি বৃষ্টিতে মাটি চাপিয়া যায় তাহা হইলে মাটির রস মরিলে একটী লৌহ বা কাষ্ঠের সূক্ষ্ম শলাকা দ্বারা ভাঁটীর উপরিভাগের মাটি সাবধানে উস্কাইয়া দেওয়া উচিত। মাটি কঠিন হইয়া গেলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। শ্রাবণ মাসের মধ্যেই উত্তম শুষ্ক সারাল মাটিতে তামাকের বীজ বপন করা কর্ত্তব্য।

ঘনভাবে জন্মিয়া চারাগাছের বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখিলে, ঘনস্থান হইতে আবশ্যকমত কতকগুলি চারা যত্ন সহকারে উৎপাটন পূর্ব্বক ফাঁক-ফাঁক রোপণ করিয়া দিলে ঘন স্থানের চারা যেমন এক দিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, অন্যদিকে স্থানান্তরিত চারাগণও উন্মুক্ত স্থানে আশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠিবে। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করা যেরূপ আবশ্যক, মধ্যে মধ্যে নিড়েনের সাহায্যে হাপোরের মাটি আল্গা করিয়া দেওয়া ততোধিক প্রয়োজন।

ক্ষেত্রে চারা রোপণ।—তামাক,—রবিফসল মধ্যে গণ্য। বর্ষাকাল অতীত হইলে চারা রোপণ করিতে হয়। আশ্বিন মাসের পনর দিবস অতীত হইলে অধিক বৃষ্টির আর আশঙ্কা থাকে না সুতরাং আশ্বিন মাসের পনর তারিখের পর হইতে কার্ত্তিক মাসের পনরই পর্য্যন্ত চারা রোপণের উত্তম সময় অর্থাৎ সেরা-বাত। যাঁহারা অগ্রে বীজ বপন করিয়া ইতিমধ্যে চারা বড় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অগ্রেই রোপণ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বিলম্বে বীজ ফেলিয়াছেন কিম্বা অন্য

কোন কারণে যাঁহাদিগের চারা বড় হইয়া উঠে নাই, তাঁহাদিগকে অগত্যা দুই তিন সপ্তাহকাল আরও অপেক্ষা করিতে হইবে। চারা গাছে ৫।৬টী পাতা না জন্মিলে ক্ষেতে রোপণ করা কোন মতে উচিত নহে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বদিবসে ক্ষেত্রে এক দফা হলচালনা করিয়া ও চৌকি বা মই দিলে মাটি আল্গা করিয়া লইতে হয় এবং রোপণ করিবার দিন সকালে ভাঁটিতে একবার অল্প পরিমাণে জলসেচন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে জলসেচন করিলে ভাঁটি হইতে চারা উৎপাটন করিবার সময় উহাদিগের গোড়া হইতে মাটি ঝরিয়া পড়ে না এবং গাছের শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।—বৈকালে চারা রোপণ করিবার উত্তম সময়। এস্থলে মনে রাখা উচিত যে, ২।১ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি হইয়া মাটি সিক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে যাবৎ মাটি ঝুরা না হয় তাবৎ কালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

তামাকের জাতিভেদে এবং ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনুসারে একহাত হইতে দুই হাত অন্তর শ্রেণী করিয়া, শ্রেণী মধ্যে ততদূর অর্থাৎ ১ হাত অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারাপরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বা আঁতর কিছু অধিক হইলে কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু ঘন করিয়া বসাইলে স্থানাভাবে গাছের পাতা বড় হইতে পায় না, ক্ষেত্রের মধ্যে জনমজুরেরা নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করিতে পারে না, ফলতঃ ক্ষেত্রের পাট-তদ্বির ভালরূপ হয় না। মতিহারি, হিঙ্গলি প্রভৃতির চারাকে একহাত অন্তর দিলে চলিতে পারে কিন্তু হরিণশৃঙ্গ প্রভৃতি দীর্ঘ্যপত্র তামাকের গাছকে দুই হাত স্থান দিতে না পারিলে তাহাদিগের সুবৃদ্ধি হয় না। পারস্যদেশীয় মস্কেটেল (Rose Muscatalle) জাতীয় তামাকের পাতা ১৭।১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ্য ও ১৬ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাকে বা ইহার ন্যায় সুবৃহৎপত্র গাছের জন্য পুরা দুই হাত স্থান দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। বৃক্ষ পরস্পরের মধ্যে

সচরাচর দেড় হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত ব্যবধান করা উচিত। অতঃপর, সরল সারি করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যবধানে এক-একটী চারা রোপণ করিতে হয়। অতঃপর, রোপণ করিবার দিন হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন অপরাহ্নে জলসেচন করা আবশ্যক, বৃষ্টি হইলে জলসেচনের আবশ্যকতা নাই। জলসেচনের পর, জলের ভাবে গাছের পাতা ভূমি সংলগ্ন হইয়া যাইলে মাটিতে জল শোষিত হইয়া যাইবার পরে, বংশশলাকা সাহায্যে পাতাগুলিকে মাটি ছাড়াইয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে উহারা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র মাটিতে সংলগ্ন হইয়া ভূগর্ভে শিকড় প্রসারিত করিতে আরম্ভ করে, অন্যথা নবশক্তি লাভ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। প্রথম দুই দিবস প্রাতে নবরোপিত চারাগুলিকে কদলি-পেটিকার দ্বারা ঢাকিয়া অপরাহ্নে জলসেচন করিবার পূর্ব্বে, সেই ঢাকনি খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে রৌদ্র, আলোক বা বাতাস উহাদিগকে জখম করিতে পারে না, সুতরাং দুই-তিন দিনের মধ্যেই চারাসমূহ পত্রসমেত শিরোত্তলন করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। চারাগণ যত শীঘ্র দাঁড়াইতে সক্ষম হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে দিন হইতে শিরোত্তলন করিতে সমর্থ হইবে সেই দিন হইতেই উহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

চারা শিরোত্তলন করিরা দাঁড়াইবার ২।৩ দিবস পরে গাছের গোড়া একবার নিড়েন করা আবশ্যক। নিড়েন করিবার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় দুই মুটা ঝুরা সার দিলে ভাল হয়। অতঃপর নিড়েন করিবার সময় মাটি ও সার একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া দিতে হইবে।

মাটিতে রসের অভাব দেখিলে ২০।২৫ দিবস অন্তর ক্ষেতে জল-সেচন করা উচিত কিন্তু অনেক স্থলে তামাকের ক্ষেতে জলসেচন করিতে

দেখা যায় না। জলসেচন করিলে গাছ সকল অমিততেজে বাড়িয়া উঠে এবং মৃত্তিকার সার সমূহ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উদ্ভিদের ব্যবহারপযোগী হয়। রস ও সারের সাহায্যে গাছ যেমন একদিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অন্যদিকে পাতা সকলও স্থূল ও বৃহৎ হয়। তাহা বতীত, পত্রশিরাসমূহ কঠিন না হইয়া রসাল ও স্থিতিস্থাপক হয়। নীরস জমীর পাতা ছোট, পাতলা ও কঠিন হয় এবং মাটিতে রসের অভাববশতঃ সমধিক ও শীঘ্র বাড়িতে পারে না। দগ্ধিভূত হইলে যে পাতা হইতে অধিক ছাই উৎপন্ন হয়, তাহাতে স্থূল অর্থাৎ খনিজ পদার্থের (Inorganic matters) প্রাধান্য অধিক বলিয়া জানিতে হয়, কিন্তু দাহ্য বা বাষ্পীয় পদার্থ (Organic matters) অধিক থাকিলে পত্র সকল গভীর হরিদ্রাবর্ণের হয়। পত্রের স্থিতিস্থাপকতা তামাকের একটি বিশেষ গুণ এবং সেই গুণ রক্ষা করিতে হইলে ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া ও জলসেচন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সারবিহীন ও নীরস ক্ষেত্রোৎপন্ন তামাক অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহার প্রতি মণের মূল্য—চারি পাঁচ টাকার অধিক হয় না কিন্তু উৎকৃষ্ট তামাকের মূল্য তাহার তিন চারি গুণ অধিক হয়।

প্রতিবার জলসেচন করিবার পরে 'যো' হইলে খুরপি বা নিড়েন দ্বারা মাটি উস্কাইয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া এবং সময়ে সময়ে খুরপি করিয়া তৃণ ও আগাছা সমূহকে বিনষ্ট করা ভিন্ন এক্ষণে অন্য কোন পাট নাই। সমগ্র আবাদকালমধ্যে ৩।৪ বারের অধিক জলসেচন করিতে হয় না।

কলম।—অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগ হইতে পৌষ মাসের পনর দিনের মধ্যে প্রতি গাছেই প্রায় ১০।১২টী করিয়া পাতা জন্মিয়া থাকে! এই সময়ে গাছের ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ডগা কাটিয়া দেওয়াই প্রশস্ত। এইরূপ ডগা ভাঙ্গিবার পদ্ধতিকে 'কলম

করা' (topping) কহে। প্রত্যেক গাছে কয়টী করিয়া পাতা রাখিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে না, কিন্তু সংক্ষেপতঃ এই পর্য্যন্ত স্মরণ রাখা উচিত যে, গাছের অবস্থা বুঝিয়া রক্ষণীয় পত্রসংখ্যার ন্যূনাধিক্য নির্দ্দেশ করিতে হয়। সুপুষ্ট ও তেজাল গাছে দশটীর অধিক রাখা কোন মতে উচিত নহে, কিন্তু নিস্তেজ ও দুর্ব্বল গাছে ৫।৬টী মাত্র হইলেই যথেষ্ট। গাছে অধিক পাতা থাকিলে উপরিভাগে যত পাতা বাহির হইতে থাকে তৎসমুদায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার হয়; সমুদায় পাতাই পাত্‌লা হয় এবং স্থূল ও ঘন শিরাযুক্ত হয়। কলম করিবার পক্ষে অপরাহ্নকালই প্রশস্ত। শীতকালে সন্ধ্যা শীঘ্র সমাগত হয়, সুতরাং সূর্য্যোত্তাপে ক্ষত স্থান হইতে অধিকক্ষণ রস পরিশোষিত হইতে পায় না। রস নির্গমণ শীঘ্র রোধ করিবার জন্য ডগা কর্ত্তিত হইবামাত্রই কর্ত্তিত স্থানের উপর ঈষৎ ঝুরা মাটি বা ছাই দিতে হয়। অধিক রস নির্গত হইলে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ডগা কাটিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের নিম্নভাগে যে সকল রুগ্ন, ছিন্ন, দাগী বা পচা পাতা থাকে, তাহাদিগকেও কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া এবং সেই সকল কর্ত্তিত স্থান সমূহে উল্লিখিত প্রণালীতে ধুলা বা ছাই দেওয়া উচিত। গাছের ডগা ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্য এই যে, এতদ্দ্বারা গাছ আর উর্দ্ধে বাড়িতে না পারিয়া গাছের সমগ্র শক্তি দ্বারা অবশিষ্ট পত্রগুলিকে অধিক পরিমাণে পোষণ করিতে সমর্থ হয়, ফলতঃ পাতাগুলি ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে। কলম করিবার ৬।৭ দিবসের মধ্যে প্রতি গ্রন্থিতে ফেঁকড়ি বাহির হয়। এইজন্য কলম করিবার পর সপ্তাহান্তে প্রত্যেক গাছকেই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে যে, পত্র মুকুল উদ্গত হইতেছে কি না। পত্র মুকুল দেখিলেই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, কারণ তাহারা আসল গাছের রস অপহরণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উক্ত মুকুল বা

নবোদ্গত শাখা-মুকুল বা leaf bud ভাঙ্গিয়া দিবার নাম কাটিভাঙ্গা বা suckering। যে উদ্দেশ্যে ডগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই মুকুল ও শাখা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

খনা বলিয়াছেন—

"তামাকের বনে গুঁড়িয়ে মাটি, বীজ পুঁতো গুটি গুটি।

ঘনরূপে পুঁতো না, পৌষের অধিক রেখ না।"

"পৌষের অধিক রেখ না" এ কথাটীর মর্য্যাদা রক্ষা করা নিতান্ত দুষ্কর। আশ্বিন মাসের শেষ বা কার্ত্তিক মাসে তামাক রোপিত হইলে গাছের পাতা পরিপক্ক হইতে ৪।৫ মাস সময় লাগে, কিন্তু খনার উপদেশ মত পৌষ মাসে পাতা সংগ্রহ করিতে হইলে গাছকে বর্দ্ধিত ও পত্র নিচয়কে পরিপুষ্ট হইতে দিবার সময় কোথায়? সচরাচর পৌষের শেষে ডগা ভাঙ্গিতে হয়। ডগা ভাঙ্গিবার পরেও মাসাধিককাল তামাকের গাছ ক্ষেতে থাকিতে না পাইলে পত্র সকল সুপুষ্ট ও পরিপক্ক হয় না। খনা যে সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তামাকের প্রচলন ছিল কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে সুতরাং তামাকের আবাদ সম্বন্ধেও লোকে কিছু জানিত না বলিয়া মনে হয়। কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর হইল এদেশে তামাক প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও তামাক এদেশে উৎকর্ষতার চরম সীমায় উঠিতে পারে নাই। আমেরিকা হইতে উহা এ দেশে প্রথম আনীত হয়, কিন্তু সেখানেও উহা আজও উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছে নাই।

মাঘমাসের শেষভাগ হইতে চৈত্রমাসের মধ্যে আশ্বিন-কার্ত্তিকে রোপিত গাছ কর্ত্তন করিতে পারা যায়। পাতা যত পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তত স্বাভাবিক বর্ণ তিরোহিত হইয়া পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন পাতায় আটাবৎ পদার্থের আবির্ভাব হয়, পাতায় হাত দিলে চট্‌চট্ করে। এতদ্ব্যতীত পত্রের উপরিভাগের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র

ছোব বা দাগ ধরে। পরিপুষ্ঠ পাতায় এই লক্ষণগুলি দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, গাছ কর্ত্তনের সময় হইয়াছে। এক্ষণে অকারণ বিলম্ব না করিয়া গাছ কর্ত্তনে মনোযোগ করিতে হইবে।

তামাক কাটাই।—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পাতার গুণ হ্রাস পাইয়া থাকে, এইজন্য যথাসময়ে পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। গাছ কাটিবার দিন সমাগত হইলে যদি শীঘ্র অর্থাৎ ২।৪ দিনের মধ্যে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সত্বর গাছ কাটিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। এ সময় বৃষ্টি বা শিলাপাত হইলে তামাকের বিশেষ অনিষ্ট হয়। বৃষ্টির সময় অথবা বৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তামাক কর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। পরিপক্কাবস্থায় বৃষ্টি হইলে বিশেষ ব্যস্ত না হইয়া আরও ২।৪ দিম অপেক্ষা করিতে হয়।

কুয়াশা বা মেঘাচ্ছন্ন দিবস পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার দিবসে তামাক কর্ত্তন করিতে হয়। প্রাতঃকালই তামাক কাটিবার প্রশস্ত সময়। পাতায় শিশির থাকিলে সূর্য্যোদয়ের ২।১ঘণ্টা পরে কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করা উচিত। কর্ত্তনের জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না—কেবলমাত্র একখানি কাস্তে হইলেই চলিবে। এক্ষণে বামহস্তে গাছটী ধরিয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত কাস্তে দ্বারা গোড়া ঘেঁসিয়া গাছগুলিকে কাটিতে হইবে এবং প্রত্যেক গাছের কাণ্ডের নিম্নভাগ অর্থাৎ কর্ত্তিতাংশকে সূর্য্যাভিমুখ করিয়া ক্ষেতেই ফেলিয়া রাখিতে হইবে। এতদর্থে গাছগুলির কর্ত্তিতাংশ উত্তর কিম্বা পূর্ব্বদিকে শিয়র করিয়া শায়িত করিলে চলিবে। কর্ত্তিত গাছসমূহকে এইরূপে ক্ষেতে ৩।৪ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখিবার পর বোঝা বাঁধিয়া খোলায় * আনয়ন করতঃ জমির উপরে এক একটী

* ধান্যাদি শস্য ক্ষেত হইতে উঠিয়া আসিলে যে স্থানে তাহাদিগকে মাড়াই-ঝাড়াই করা যায় তাহাকে 'খামার' বা 'খলেন' কহে, আর যেখানে তামাকের কর্ত্তিত গাছ সমূহের পাট তদ্বির হয় তাহাকে 'খোলা' বলে।

করিয়া প্রত্যেক গাছ প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। শীঘ্র বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা না থাকিলে কর্ত্তিত গাছকে এক দিবস ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখা চলিতে পারে। এইরূপে পড়িয়া থাকিলে গাছ আম্‌লাইয়া যায় ও অনেক পরিমাণে শুকাইয়া যায় সুতরাং অনেক হালকা হইয়া আসে। উল্লিখিত উপায়ে আম্‌লাইয়া লইবার প্রক্রিয়াকে (Wilting) কহে। কর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরেই বোঝা বাঁধিয়া খোলায় আনিতে গেলে অনেক পাতা ভাঙ্গিয়া যায় এবং বোঝাও অধিক ভারি হয়। বোঝা ভারি বা হাল্‌কা হউক, তাহাতে তত আসিয়া যায় না, কিন্তু সদ্য কর্ত্তিত গাছের পাতা রসাল ও মচ্‌মচে থাকে বলিয়া অধিক নাড়াচাড়ায় ভাঙ্গিয়া যায়।

গুচ্ছ-বন্ধন।—খোলায় আনিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা কাণ্ডের কিয়দংশের সহিত পাতাগুলিকে কাটিয়া স্বতন্ত্র করতঃ ৪।৫টী পাতায় একটী করিয়া গুচ্ছ বাঁধিয়া রৌদ্রে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। পাতা শুকাইবার জন্য ঐরূপ গুচ্ছকে বাঁশে বা দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিলেও চলে। ভূ-প্রসারিত অপেক্ষা দোদুল্যমান পাতা শীঘ্র ও সমভাবে শুষ্ক হয় এবং রাত্রিকালে তাহাতে শিশিরও সমভাবে লাগিতে পায়। এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি যে, ভূমিতে প্রসারিত হউক অথবা ঝুলাইয়া রাখা হউক, এমন স্থানে পাতাগুলিকে রাখিতে হইবে যেখানে থাকিলে উহাতে দিবাভাগে রৌদ্র ও রাত্রিকালে শিশির লাগিতে পারে। এ সময়ে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে কালবিলম্ব না করিয়া পাতাগুলিকে গৃহমধ্যে উঠাইতে হইবে এবং বৃষ্টির পরে পুনরায় বাহিরে দিতে হইবে। এই অবস্থায় তামাকে কোনরূপে বৃষ্টি লাগিলে তামাকের গুণ কমিয়া যায়। রৌদ্রের প্রখরতা থাকিলে ২।৩ দিনের মধ্যে পাতা উত্তমরূপে শুকাইয়া

যায়, নচেৎ আরও ৫।৭ দিন সময় লাগে। যাহা হউক, পাতা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে গৃহমধ্যে আনিয়া 'জাগ' দিতে হয়। কৃষকেরা ক্ষেতেই 'জাগ দিয়া থাকে।

জাগ।—প্রাতঃকালেই 'জাগ' দিতে হয়। রাত্রিকালে শিশির সংস্পর্শে পাতা নরম হইয়া থাকে, সুতরাং নাড়া-চাড়া করিলে ভাঙ্গিয়া যায় না। তাহা ব্যতীত, শুষ্ক পাতাকে জাগে দিলে জাগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। পত্র সমূহকে স্তূপীকৃত করিয়া তন্মধ্যে উত্তাপ উৎপাদন করাই জাগের উদ্দেশ্য, কিন্তু স্তূপমধ্যস্থিত সামগ্রীতে অল্পাধিক রস না থাকিলে জাগের ভিতর উত্তাপ জন্মে না। রাত্রিকালে শিশিরে যদি পাতা অতিশয় ভিজিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পর এক আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলে পাতা হইতে শিশির ঈষৎ শুকাইয়া যায়। অতঃপর, গুচ্ছগুলিকে গৃহমধ্যে আনিয়া তক্তাপোষ বা মাচানের উপর স্তরে স্তরে সাজাইতে হইবে। জাগ দুই কিম্বা আড়াই হাত দীর্ঘ ও তদনুরূপপ্রায় প্রস্থ এবং তিন কিম্বা সার্দ্ধ তিন হাত উচ্চ করিতে হইবে। গুচ্ছসমূহকে জাগে দিবার সময় দেখিতে হইবে, যেন উহাতে দাগী বা পচা পাতা একটীও না থাকে। এক্ষণে সাজান' শেষ হইলে জাগের উপরিভাগে এক বিতস্তি বা বিঘৎ পরিমাণ স্থূল করিয়া বিচালি প্রসারিত করিয়া একখানি চট বা কম্বল দ্বারা জাগের উপরিভাগ ঢাকিয়া, ২।৩ খানি তক্তা দিয়া সর্ব্বোপরি এক খানি জাঁতা বা অপর কোন ভারী সামগ্রী রাখিয়া দিতে হয়। জাগের উপরে ভারী সামগ্রী থাকিলে জাগের পাতা সকল চাপিয়া বসিয়া যায়, তন্নিবন্ধন উহার মধ্যে অধিক বাতাস থাকিতে পায় না, ফলতঃ অনতিকাল মধ্যে জাগে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। জাগের উপরে যে ভারী সামগ্রীর রাখিবার কথা বলা গেল, তাহা যেন অতিরিক্ত

ভারী না হয়। উপরের চাপা অধিক ভারি হইলে জাগমধ্যস্থিত পাতা সকল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া অনেক পাতা নষ্ট হইয়া যায়। জাগ দিবার সময় পাতা কাঁচা বা ভিজা থাকিলে জাগের অবস্থায় পাতা হইতে রস নির্গত হয়, তন্নিমিত্ত পাতা পচিয়া যায়, অনেক পাতায় দাগ ধরে ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে। পাতাগুলি এই অবস্থায় ২।৩-দিন থাকিবার পর, জাগ ভাঙ্গিয়া নূতন জাগ করিতে হইবে। জাগর মধ্যে যদি উত্তাপ অধিক হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত কয়দিনের পূর্ব্বেও জাগ ভাঙ্গিতে পারা যায়। জাগের মধ্যে নর্ব্বই ডিগ্রির অধিক উত্তাপ হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। এই জন্য মধ্যে মধ্যে জাগের ভিতর হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করা আবশ্যক। তাপমান যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে ভালই হয়। অভিজ্ঞ কৃষকগণ হস্ত দ্বারাই উত্তপের পরিমাণ বুঝিতে পারে।

জাগ পরিবর্ত্তন।—'জাগ' ভাঙ্গিয়া উপরোক্ত পত্রগুচ্ছগুলিকে গৃহমধ্যেই প্রসারিত করিয়া দিয়া, একবার উপরিভাগের পত্রগুলিকে নিম্নভাগে দিয়া ক্রমশঃ পাতার গুচ্ছগুলিকে এরূপভাবে স্তরে স্তরে সাজাইতে হইবে, যেন পূর্ব্বজাগের নিম্নস্থিত গুচ্ছগুলি উপরে থাকিতে পায়। যতবার জাগ দিতে হয়, ততবার এইরূপ উলট-পালট করিয়া দিলে সমুদায় পাতা সমভাবে উত্তাপ লাভ করিতে পারে, ফলতঃ সকল পাতার গুণ সমান হয়। জাগ ভাঙ্গিবার সময় প্রত্যেক গুচ্ছকে একবার ঝাড়িয়া লইলে পাতা সকলের পরস্পর সংলগ্নতা ছাড়িয়া যায় সুতরাং তাহা করা আবশ্যক। অতঃপর, গুচ্ছের মধ্যে কোন পাতা পচিয়া গিয়া থাকিলে কিম্বা উত্তাপের আধিক্যবশতঃ মশিবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিতে হইবে। পত্রের প্রসারিতাবস্থায় গৃহমধ্যে সমধিক বায়ুর প্রয়োজন, এইজন্য এ সময়ে

গৃহের দ্বার গবাক্ষাদি উন্মুক্ত রাখা এবং বৃষ্টি বা কুজ্ঝটিকাকালে বন্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

সকালে জাগ ভাঙ্গিয়া সারাদিন পাতাগুলিকে গৃহমধ্যে অথবা অপর কোন অরৌদ্র স্থানে বা ছায়ায় রাখিয়া দিলে পাতার আর্দ্রতা অনেক কমিয়া যায়। অতঃপর, সায়ংকালে তদবস্থায় তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া রাখিয়া শিশির সিঞ্চিত হইতে দেওয়া হয়। পরদিন যথাসময়ে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর উহাদিগকে পূর্ব্ববৎ জাগ দিতে হইবে। দ্বিতীয়বার জাগ দিবার সময় ৬।৭টী গুচ্ছকে একত্রে বাঁধিয়া, গুচ্ছগুলিকে স্থূল করিয়া দিলে তামাকের কোন ক্ষতি হয় না এবং কাজের পরিমাণও অনেক লাঘব হয়। জাগ ভাঙ্গিয়া পাতাগুলিকে প্রসারিত করিয়া দিলে খরাণিতে যদি পাতা অত্যন্ত শুষ্ক ও ভঙ্গুর হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাতে অল্প পরিমাণ জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক।

বাছাই।—যথানিয়মে জাগের কার্য্য সমাহিত হইলে চারি জাগেই তামাক তৈয়ার হইয়া উঠে। তামাক যত তৈয়ার হইতে থাকে ততই উহা হইতে সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হয়,—পাতা সকলও স্থিতিস্থাপক হয়, পাতায় তলপ হয়। তামাক তৈয়ার হইলে, জাগ ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে একদিন দিবাভাগে বাতাস এবং রাত্রিকালে শিশির খাওয়াইয়া পরদিন পাতা হইতে শিশির শুকাইয়া গেলে পাতার গুণানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, ২০।২৫টী পাতায় এক একটী করিয়া গোছা বাঁধিতে হয়। সুমিষ্ট গন্ধ, বর্ণের সমভাবতা ও পাতার পূর্ণায়তন দেখিয়া প্রথম শ্রেণী পূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপে পাতার আকার, বর্ণ ও আঘ্রাণের ইতরবিশেষ দেখিয়া অপর তিন শ্রেণীর পাতা বাছাই করিয়া গোছা বাঁধিতে হইবে। অনন্তর, সেই সকল পাতার মধ্যে যে গুলি নিকৃষ্ট তাহাদিগকে একেবারে বাছিয়া ফেলা উচিত।

ছালা-বাঁধাই।—পাতা বাছাই হইলে প্রতি নম্বরের তামাক স্বতন্ত্র করিয়া চটের উপরে পাতার গোছাগুলিকে স্তরে স্তরে জাগের ন্যায় সাজাইয়া উপরেও চট দিয়া বোঝা বাঁধিতে হইবে। এইরূপ তামাকের বোঝাকে 'ছালা' কহে। প্রত্যেক ছালায় দেড় বা দুই মণ তামাক থাকে। ছালা সাজাইবার সময় পাতার বোঁটাসমূহকে বহির্ভাগে রাখিতে হয়। পাতাগুলির সুরক্ষার জন্য ছালার চারিদিকে উলুঘাস বা বিচালী দ্বারা ঢাকিয়া পরে ছালা বাঁধা উচিত। ছালা বাঁধা হইলে উহাকে বাজারে প্রেরণ করিতে পারা যায়। সচরাচর বর্ষার পরেই বাজারে তামাক প্রেরিত হয়। আপাততঃ বিক্রয় করিবার প্রয়োজন না থাকিলে ছালা-বাঁধা তামাক কোন শুষ্ক স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিত নতুবা ঠাণ্ডায় তামাক খারাপ হইয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগিয়া তামাকে পোকা ধরিলে কিম্বা পাতা দাগী হইলে তামাকের ঝাঁজ কমিয়া যায়, ফলতঃ মূল্যও কমিয়া যায়।

আয়-ব্যয়।—তামাক উত্তমরূপে জন্মিলে এবং কোনরূপে নষ্ট না হইলে বিঘা প্রতি ১০/মণ শুষ্ক তামাক উৎপন্ন হইতে পারে। সচরাচর ভাল তামাক বাজারে ৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি মণের দাম হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই যে ভাল তামাক উৎপন্ন হইবে অথবা বাজারে প্রতি মণের মূল্য ১০৲ হইবে এরূপ আশা করা উচিত নহে। এইজন্য আপদ-বিপদ ও দৈব-দুর্ঘটনার জন্য কিছু বাদ দিয়াও যদি বিঘা প্রতি আট মণ ফলন হয় এবং তাহার প্রতি মণের মূল্য ৭৲ টাকা ধার্য্য করিয়া লই, তাহা হইলে এক বিঘা জমি হইতে ৫৬৲ টাকা আদায় হইতে পারে। নিম্নে তাহার একটী আনুমানিক হিসাব দেওয়া গেল :—

জমা	খরচ	
তামাক, ৮৲ হিঃ	জমির খাজনা ...	৪৲
৭/০——৫৬৲	সার ...	৩৲
মোট——৫৬৲	লাঙ্গল ১০ খানা ।০ হিঃ	২॥০
	বীজ ...	১৲
	জমি কোপান	
	৮ জন মজুর ।০ হিঃ ...	২৲
	চারা রোপণ ৩টা মজুর	৸০
	জলসেচন (১২ জন) ...	৩৲
	ডগা ভাঙ্গাই (৩ জন) ...	৸০
	গাছ কাটাই (২ জন) ...	॥০
	শুকাই (১২ জন) ...	৩৲
	মোট—	২০॥০

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে উৎপন্নের পরিমাণ ও তাহার মূল্য কম করিয়া ধরা হইয়াছে, আবার খরচের দিকেও অধিক ধরা হইয়াছে। এক বিঘা তামাক করিতে ১৫।২০ টাকার অধিক খরচ পড়ে না। রাজনগরে সচরাচর টাকায় ১০টী মজুর পাওয়া যায়। * এইরূপ স্থলবিশেষে জনমজুরের দরের তারতম্য আছে। মোটের উপর বেশ দেখা যায় যে, বিঘা প্রতি তামাকের আবাদে তাবৎ খরচ বাদ দিয়া ৫০৲ টাকা লাভ থাকে। অধিকাংশ স্থলে জলসেচন হয় না সুতরাং সে বাবদের খরচ বাঁচিয়া যায়।

* উপরে যে হিসাব দেওয়া গিয়াছে তাহা ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন জীবিকানির্ব্বাহের খরচ এত অধিক ছিল না। এক্ষণে যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলতঃ খরচ সেই অনুপাতে ধরিয়া লওয়া উচিত।

চুরুটের তামাক।—সন ১৩০০ সালে মুর্শিদাবাদে থাকিতে চুরুটের জন্য 'রইসবাগে' কয়েক জাতীয় বিলাতী তামাকের আবাদ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কয়েকটীর বিষয় উল্লেখ করিব। (১) পারস্য রোজ মস্কেটেল (Persian Rose Muscatelle). (২) কিউবা (Cuba), (৩) কনেক্টিকট (Connecticut)।—উহারা উত্তম জাতীয় চুরুটের উপযোগী তামাক। যে কয়টীর নামোল্লেখ করিলাম, তাহাদিগের মধ্যে রোজ-মস্কেটল জাতির পাতা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পাতা ২৭।২৮ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং বোঁটা হইতে ছয় ইঞ্চ উপরে ১৩ ইঞ্চ চওড়া হইয়াছিল। কিউবা জাতীয় তাদৃশ দীর্ঘ না হইলেও, প্রস্থে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং স্থূলতর হইয়াছিল। কনেক্টিকটের আকার প্রায় রোজ-মস্কেটেলের ন্যায়। তৎপূর্ব্ব বৎসর ভার্জ্জিনিয়া (Virginia) তামাকের আবাদ করিয়াছিলাম। ইহাও চুরুটের উপযোগী উৎকৃষ্ট তামাক। উল্লিখিত কয় জাতির তামাকই অতি সুমিষ্ট ও সুবাসিত এবং তাহা হইতে যে চুরুট প্রস্তত হইয়াছিল তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

চুরুটের দোক্তা উৎপন্ন করিতে হইলে ক্ষেতে যথেষ্ট সার দিতে হয়, জলসেচন করিতে হয় এবং সাবধানে পাতা শুকাইতে হয়। পাতা শুকাইবার (Curing) প্রণালী বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য। মাটিতে সারের অভাব থাকিলে এবং আবাদকালে জলসেচন না করিলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরিত হয় না, এজন্য পাতা অতিশয় স্থূলশিরাযুক্ত হয়। ঈদৃশ পাতায় অদাহ্য (Inorganic) পদার্থ অধিক থাকে, তন্নিবন্ধন চুরুটের অধিক ছাই পড়ে। ভাল চুরুটের পক্ষে ইহা দোষের কথা।

যাহা হউক, চুরুটের জন্য তামাকের গাছ কর্ত্তন করিয়া ক্ষেত্রে ২।১ ঘণ্টা মাত্র রাখিয়া গাছগুলি ঈষৎ আমূলাইয়া গেলে খামারে আনিতে

হয়। খামারের জন্য একটী ঘর বা আবৃতস্থান নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ঘর না হইয়া ঘরের দর-দালান বা চারিপার্শ্ব উন্মুক্ত আটচালা হইলে ভাল হয়। সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র জানিয়া রাখিতে হইবে যে. যে স্থানে পাতা শুষ্ক করিতে হইবে, সে স্থানে রৌদ্র না প্রবেশ করিতে পারে অথচ অবাধে বায়ু প্রবাহিত হয়। আটচালার চারিদিক উন্মুক্ত হইলে, খামারের বায়ু অতিশয় শুষ্ক হইলে কিম্বা সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইলে, অথবা সহসা ঝড়বৃষ্টি আসিলে, স্থানীয় উত্তাপের (Temperature) হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে তামাকের গুণের ইতরবিশেষ হয়, কিন্তু পর্দ্দার বন্দোবস্ত থাকিলে ইচ্ছামত সেই পর্দ্দা উঠাইয়া ও ফেলিয়া দিয়া খামার মধ্যস্থিত বাতাস (Temperature) নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। অতঃপর, কর্ত্তিত গাছ হইতে পাতাগুলিকে পূর্ব্বের মত স্বতন্ত্র করতঃ গুচ্ছ বাঁধিয়া, সেই গুচ্ছগুলিকে বাঁশে ঝুলাইয়া উক্ত বাঁশ ছায়ায় টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। গুচ্ছগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া না থাকে—এজন্য গুচ্ছ পরস্পরের মধ্যে ২।১ অঙ্গুলি এবং বংশ পরস্পরের মধ্যে আধ হাত হইতে পৌনে এক হাত ব্যবধান থাকা আবশ্যক। গুচ্ছগুলিকে অতিশয় ঘনরূপে সাজাইলে এবং গুচ্ছসংলগ্ন বাঁশগুলিকে ঘেসাঘেসি রাখিলে পত্রগুচ্ছসমূহের মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবাহিত হইতে পায় না, তন্নিবন্ধন পাতা শুষ্ক হইতে বিলম্ব হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বায়ু নিতান্ত শুষ্ক থাকে সুতরাং সে সময়ে পাতা শুষ্ক হইতে ২০।২৫ দিবস সময় লাগিতে পারে ! গৃহ আর্দ্র বা স্যাতানে না হইলে শীঘ্রই পাতা শুকাইবার সম্ভাবনা। পত্রসমূহ অতিশয় শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে নামাইয়া জাগ দিতে হইবে এবং উল্লিখিত প্রণালীতে তাহার পরিচর্য্যা করিতে হইবে।

অপর প্রণালীমতে কর্ত্তিত গাছ সমূহকে গৃহজাত করিয়া যথানিয়মে

গুচ্ছ করিয়া আবৃতঘরের পাটাতন বা মাচানের উপরে একদিন প্রসারিত করিয়া রাখিবার পরে জাগো দিতে হয়। এ সকল পাতা কাঁচা থাকে এবং জাগে দিলে তাহার মধ্যে উত্তাপ জন্মিয়া পাতা সকলের মধ্যে একটী পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। কাঁচা পাতার জাগের উপরে কোন গুরুভার সামগ্রী না রাখিয়া চটের উপরে কেবল একখানি লঘু তক্তা চাপা দিতে হয়। গুরুভার চাপা দিলে কাঁচা পাতায় শীঘ্রই অধিক উত্তাপ জন্মিয়া পাতা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে এবং পাতার বর্ণ মশিবৎ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঈদৃশ তামাক অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কাঁচা পাতার জাগে ভারী জিনিষ না দিলে জাগের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, ফলতঃ তাহার ভিতরের উত্তাপের পরিমাণ অধিক হইতে পারে না বলিয়া মৃদু উত্তাপে পাতা সকল ধীরে ধীরে পরিপক্ক বা শুষ্ক হইতে থাকে।

কাঁচা পাতার জাগ একাদিক্রমে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখা উচিত নহে। প্রয়োজন বুঝিলে ১২।১৪ ঘণ্টার মধ্যেও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। দ্বাদশ ঘণ্টা পরে জাগের মধ্যে করপুট প্রবিষ্ট করিয়া দেখিতে হয় যে, তাহার মধ্যে কিরূপ উত্তাপ (Heat) জন্মিয়াছে এবং অতিরিক্ত উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ জাগ ভাঙ্গিয়া পাতাগুলিকে পূর্ব্ববৎ বাঁশে ঝুলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, পরদিন আবার সেই সকল পাতাকে নূতন করিয়া জাগ দিতে হইবে। প্রতিবার জাগ ভাঙ্গিয়া দাগী ও পচা পাতাগুলিকে বাছাই করিয়া ফেলা উচিত নতুবা অপর পাতাও দাগী হইবার বা পচিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপে বারম্বার জাগ্ দিলে পাতা ক্রমশঃ শুষ্কভাব ধারণ করিবে এবং ক্রমশঃ উহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। পাতা শুষ্ক হইয়া আসিলে রাত্রিকালে উহাদিগকে

বাঁশসমেত অঙ্গিনায় সারারাত্রি রাখিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় জাগ দিয়া ৫।৬ দিন রাখিবার পরে, পুনবায় জাগ ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া এবং রাত্রিতে শিশির খাওয়ান আবশ্যক। এইরূপ ৪।৫-বারের পর আর জাগ দিবার আবশ্যক হয় না। শেষবারে জাগ দিবার সময় প্রত্যেক পাতাটীকে জাগের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া উচিত। জাগ শেষ হইলে যথানিয়মে ছালা বাঁধিতে হইবে।

কাঁচা পাতার জাগে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। এ সময়ে জন-মজুরের উপর নির্ভর করিলে চলে না। একবার বিশেষ কোন কারণে কাঁচা পাতার জাগ ভাঙ্গিতে আমার বিলম্ব হওয়ায়, জাগের প্রায় সমুদায় পাতাই পচিয়া গিয়াছিল এবং যাহা ছিল তৎসমুদায় মশিবর্ণের হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই সকল পাতা একবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়ায় কোন কাজে আসিল না, ফলতঃ সেগুলি ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল। কাঁচা পাতার জাগে এইজন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

দো-কাট।—গাছ হইতে তামাকের পাতা কাটিয়া লইবার পর গোড়া হইতে পুনরায় নূতন পাতা বা ফেঁকড়ী leaf-bud উদ্গত হয়। উক্ত ফেঁকড়ীকে চাষীরা 'দোজী' কহে। দোজীর পাতা, প্রথম ফসলের ন্যায় আকারে অথবা গুণে সমতুল্য না হইলেও, উপেক্ষণীয় নহে। দোজী ফসলকে সচরাচর বৈশাখ মাসের শেষভাগে কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম-ভাগে পূর্ব্ববৎ গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাতা শুষ্ক করিলে আর এক দফা তামাক পাওয়া যায়। প্রথমবার গাছ কাটিয়া লইবার পরে হাল্‌কারূপে ক্ষেত্রকে একবার কোপাইয়া ও মাটি ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিলে ভাল হয়। অতঃপর, একবার জল-সেচন করিয়া পুনরায় ঐরূপে কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করিয়া দিলে তামাকের পাতা অপেক্ষাকৃত বড় হইবে এবং তাহার ঘ্রাণ ভাল হইবে। প্রথমতঃ

গাছ কাটিয়া লইবার পরে কৃষকগণ সে ক্ষেতের আর কোন পাট করে না। প্রথমবারের পাতা লইয়া ব্যস্ত থাকে বলিয়া বোধ হয় অবসরাভাবে ক্ষেতের কোন খবর লইতে পারে না।

তামাকের ক্ষেত খালি হইলে, সেই ক্ষেতে ২।১-বার ভূমি কর্ষণের পর, পরবর্ত্তী ফসলের জন্য—বিশেষতঃ তামাকের জন্য—হরিৎ-সারের ব্যবস্থা করা উচিত। এতদর্থে ঘনভাবে শণের আবাদ করিতে হয়। অতঃপর, যথানিয়মে মাঝ-বর্ষায় বা বর্ষার প্রাক্কালে শণ গাছ ভূশায়ী করিয়া দিতে হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই উক্ত ফসল ভূশায়ী হইলে অবশিষ্ট বর্ষাতেই কচি শণ গাছগুলি পচিয়া গলিয়া যাইবে, তখন বারম্বার হলচালনাদি দ্বারা ক্ষেত তৈয়ারী করিয়া লইলে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়।

নিম্নে কয়েক প্রকার দেশী তামাকের নামোল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

১। পান বাটা	৬। কপিপাতা	১১। মতিহারি
২। কৃষ্ণকলি	৭। ধালসা	১২। হরিণপালি
৩। দক্ষিণাবারণ	৮। কন্থা	১৩। শিবজটা
৪। হিঙ্‌লি	৯। হাতিকানি	১৪। কালজীরে
৫। হনুমানজটা	১০। ছোটনা	১৫। নোয়াখোল

বীজ রাখিবার জন্য ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবশ্যকমত কয়েকটী তেজাল গাছ রাখিতে হইবে। এই সকল গাছের ডগা বা পাতা ভাঙ্গা উচিত নহে। বীজ-গাছের ডগা বা পাতা ভাঙ্গিলে গ্রন্থি হইতে শাখা উদ্গত হইয়া তাহাতে বীজ হইতে পারে কিন্তু সে বীজ ভাল হয় না।

(Lat, Saccharum Officinarum, Eng. Sugarcane)

ভারতের নানাস্থানে ইক্ষুর আবাদ হয় এবং সেই ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথাপি কিন্তু ভারতের অভাব ভারতীয় চিনির দ্বারা পূরণ হয় না। এতন্নিবন্ধন বহু পরিমাণ বিদেশী-চিনি ও বীট-চিনি এদেশে প্রতিনিয়ত আমদানী হইতেছে। উন্নত প্রণালীতে আবাদ করতঃ ফলন অধিক ও উত্তম শর্করা উৎপন্ন করিতে পারিলে লাভ হইতে পারে।

সকল প্রকার মাটিতেই ইক্ষুর আবাদ হইতে পারে। দেশ বিশেষে কোন কোন জাতীয় ইক্ষু ভালরূপ জন্মে, আবার কোথাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বোম্বাই, পুনা, চিনিয়া, খাড়ি, শামসাড়া প্রভৃতি নানা জাতির আবাদ করিয়া কোন স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই। বাঙলা দেশের রসা-ভূমিতে লাল-বোম্বাই জাতীয় ইক্ষুতে কীটের উপদ্রব হয়। বেহারে তাহাদের আবাদ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথায় সে দোষ ঘটে নাই। উন্নত প্রণালীতে আবাদ করিয়া শামসাড়া, লাল-বোম্বাই ও পুনা—এই তিন জাতির প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছি কিন্তু লাল-বোম্বাই সাধারণতঃ তত মিষ্ট নহে। ধুবড়ী হইতে উপর-আসামের মার্গেরেটা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ভাল জাতীয় অর্থাৎ সুমিষ্ট ইক্ষু দেখিতে পাই নাই। সেখানকার ইক্ষু খুব স্থূল ও দীর্ঘ হয় বটে, কিন্তু তাহার রস পানসে, সুতরাং তাহা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই গুড় বা চিনি উৎপন্ন হয়। আমার মনে হয়, আসাম দেশের স্বাভাবিক উর্ব্বরা ভূমিতে শামসাড়া, চিনিয়া ও খাড়ি ইক্ষুর আবাদ করিলে উপকার হইতে পারে।

গভীর দো-আশ মাটি ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লবণাক্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন ফসল জন্মিতে পারে না, কিন্তু তথায় ইক্ষু উত্তমরূপে জন্মে। পঞ্চবিংশতি বর্ষাধিক কাল অতীত হইল, কলিকাতা হর্টিকাল্‌চারল্‌ ইনষ্টিটিউশনের উল্টাডিঙ্গিস্থ ক্ষেত্রে ইক্ষুর বৃহৎ আবাদ হইয়াছিল। উক্ত ক্ষেত্রের মাটি এতই লবনাক্ত যে, তথায় কোন ফসলের আবাদ করিয়া সুখ হইত না। পরীক্ষাস্বরূপ এক বৎসর তথায় অল্প পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ করা হয়। তথায় ফসল এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, কেহই সেরূপ আশা করে নাই। মুরশিদাবাদস্থ রৈইস্‌বাগ মধ্যে প্রায় দুই বিঘা ভূমি লবনাক্ত ছিল। সে জমিতে কোন ফসল ভালরূপে জন্মিত না। কিন্তু তথায় ইক্ষুর আবাদ করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছিল। এবং সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন ইক্ষুদণ্ড সকল যেমন দীর্ঘ, তেমন স্থূল ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। ঈদৃশ জমিতে কেবল ইক্ষু কেন, ইক্ষু সদৃশ সকল গাছই অতি সুন্দররূপে জন্মিয়া থাকে। সন ১৩০১ সালে সেই ক্ষেত্রে হাতি-ঘাস (Reana) নামক পশুখাদ্যের আবাদ করিয়াও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। সেই ক্ষেত্রজাত হাতি-ঘাসের দণ্ড (cane) আট হাত দীর্ঘ ও তদনুরূপ স্থূল ও রসাল হইয়াছিল। উল্লিখিত কয়টী পরীক্ষায় আমার ধারণা হইয়াছে যে, নোনা জমি ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ঈষদুচ্চ ও সমতল ক্ষেতই ইক্ষুর আবাদোপযোগী। জলা বা অতিরিক্ত রসা ভূমিতে যে ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহা তেমন সুমিষ্ট হয় না।

পৌষ হইতে মাঘমাস পর্য্যন্ত ইক্ষু রোপণের উত্তম সময়। কিন্তু কোন কোন স্থানে আষাঢ়-শ্রাবণে কিম্বা ভাদ্র-আশ্বিনেও রোপিত হয়। কিন্তু মাঘমাসের মধ্যে ইক্ষু রোপণ করিতে পারিলে অনেক সুবিধা

ও লাভ আছে। এ সময়ে অধিক বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, ক্ষেত্রের মাটিও সরস ও ঝুরা থাকে, তন্নিবন্ধন 'পাব' সকল শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ সময়ে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিও হয়, সুতরাং চারা গাছ সকল সুশৃঙ্খলে ঝাড়াইয়া উঠে। মাঘী রোপণের অনুকূলে আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, অনাবৃষ্টির বৎসর ব্যতীত ইহাতে জলসেচনের প্রায় প্রয়োজন হয় না, নিতান্ত বৃষ্টির অভাব দেখা গেলে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ২।১টী ছেঁচ দিলেই চলিতে পারে। মাঘী-রোপণের ইক্ষু ভাদ্র-আশ্বিন পর্য্যন্ত পূর্ণ বর্ষা সম্ভোগ করিতে পায়। অতঃপর কার্ত্তিক-অগ্রহয়ণ মাস পর্য্যন্ত মাটিতে খুব রস থাকে, সুতরাং ফসলের শেষ অবস্থায়ও জলের কোন প্রয়োজন হয় না। অপর সময়ের রোপিত আবাদে অন্ততঃ ৪।৫টী বা ততোধিকবার ছেঁচ না দিলে চলে না। অগ্রহায়ণ ও পৌষ—এই দুই মাসের মধ্যে ক্ষেত উত্তমরূপে তৈয়ারি করিতে হইবে। গভীর কর্ষিত ক্ষেতে ইক্ষু স্ফুর্ত্তিতে থাকে, এই জন্য ক্ষেতকে গভীররূপে কর্ষণ ও মৃত্তিকাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হয়। গভীররূপে মাটিকে বিচালিত করিবার জন্য কেবল লাঙ্গলের উপর নির্ভর না করিয়া দাঁড়া-কোদালের সাহায্যে জমিকে ২-কোদাল গভীর করিয়া কোপাইয়া, পরে হলচালনা করা উচিত। হলচালনার পর ক্ষেতে যে সকল ঢেলা ও চাপ থাকিয়া যায় তাহাদিগকে কোদালের শিরোভাগ দ্বারা কিম্বা মুদ্গর সাহায্যে চূর্ণ করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে জমি এক দফা ঠিক করিবার পর ক্ষেতকে সমতল করতঃ তদুপরি সার প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। সার সমভাগে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া হইলে, তাহাতে ১০।১২ দফা উত্তমরূপে চাষ দেওয়া আবশ্যক। যত অধিকবার চাষ দিবে ততই মাটি চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে সারও মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে।

ইক্ষুক্ষেত্রে প্রাণিজ সার ব্যতীত অপরাপর সার ক্ষেত্রময় প্রসারিত করিয়া দিতে গেলে অনেক খরচ পড়িয়া যায়। তাহা ব্যতীত, গাছ উৎপন্ন হইলে জমিতে সোরা ও লবণ দিবার রীতি আছে। বিঘা প্রতি জমিতে ২০০/০ মণ অর্থাৎ বিশ গাড়ী গোবর, ২।৩ মণ অস্থিচূর্ণ, ২।৩ মণ খৈল, সোরা ।৫ পনর সের ও লবণ ।৫ সের দিবার ব্যবস্থা আছে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বুঝিয়া উল্লিখিত পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অস্থিচূর্ণ বা অস্থিচূর্ণমিশ্রিত অপর সার পাব্ রোপণকালে বা রোপণের পর জুলির মধ্যে দিয়া কোদালের দ্বারা মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। কিম্বা যথারীতি গবাদি পশুর মলমূত্রজনিতসার ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া দিয়া যথানিয়মে হলকর্ষণাদি করিয়া দিলে চলে। বীজ রোপিত হইবার পর এবং গাছ উপ্ত হইবার পূর্ব্বে জুলির মধ্যে মিশ্র-সার দেওয়া উচিত। * মিশ্রসার ঝুরা করিবার জন্য তাহার সহিত সমধিক পরিমাণে প্রাণিজ সার মিশাইয়া লওয়া হইত। সোরা ও লবণ যে, ক্ষেত্রে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই তবে আবশ্যক বোধ করিলে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়। গ্রন্থকার এতদুভয়ের ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। নাইট্রোজেন বা পটাশ নামক দুইটী পদার্থকে ক্ষেত্রে সংযোজিত করিবার জন্যই সোরা ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু যে সকল সারের কথা উল্লিখিত হইল তৎসমুদায় মধ্যে উক্ত দুইটী পদার্থ ত আছেই তাহা ছাড়া ফস্ফেট্ প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে।

* দ্বারভাঙ্গা-রাজের রাজনগর কৃষিক্ষেত্রের এক পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত কয়েকটী হৌজ ছিল। উক্ত হৌজ কয়েকটী কামরায় বিভক্ত। কোন কামরায় খৈল, কোন কামরায় অস্থিচূর্ণ, আবার কোন কামরায় দুই তিন জিনিধ একত্রে পচিয়া তৈয়ার হইবার জন্য জলে নিমজ্জিত থাকিত। চালা দ্বারা হৌজটী সর্ব্বদা ঢাকা থাকিত। আবশ্যকমত হৌজ হইতে সার তুলিয়া ব্যবহার করা যাইত।

এইজন্য সোরা ব্যবহার করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। চুণ দ্বারা ইক্ষুর বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে—নিঃস্ব ক্ষেত্রে চুণ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। ইক্ষু রোপণের অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি জমিতে দুই মণ চুণ প্রসারিত করিয়া দিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয়, অন্ততঃ ১ মাস পরে তাহাতে সমধিক পরিমাণে প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ সার প্রদান করা উচিত। প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ সার ব্যবহার করিবার উপায় না থাকিলে ক্ষেতে চুণ প্রয়োগ করা উচিত নহে। ক্ষেত্রে বা কোন বিশেষ উদ্ভিদে চুণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইলে গ্রন্থকার যে প্রণালী আবলম্বন করিতেন তাহা অতি ফলদায়ক ও শীঘ্র কার্য্যকরী। উন্মুক্ত স্থানে চুণকে চব্বিশ ঘণ্টা-কাল বিস্তৃত করিয়া রাখিবার পর, উক্ত চুণের সহিত পঁচিশ মণ—প্রায় তিন গাড়ী—প্রাণিজ সার কোদাল দ্বারা উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হয়। পরে সেই রাশিকে স্তূপ করিতে হয়। রাজমিস্ত্রীগণ চুণ সুর্কীর তাগাড় মাখিবার জন্য যেরূপে চুণ-সুর্কির স্তূপের মধ্যস্থলে গর্ত্ত করিয়া জল ঢালিয়া দেয়, সেইরূপে চুণসমন্বিত সারস্তূপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে তাবৎ জল স্তূপে শোষিত হইয়া যায়। অতঃপর, জলসিক্ত স্তূপকে কোদাল দ্বারা বারম্বার উলট-পালট করিয়া দিলে চুণ ও সার বেশ মিশিয়া যায়। পাঁচ সাত দিন সেই স্তূপকে বারম্বার জলসিক্ত করতঃ পরে ভাঙ্গিয়া প্রসারিত করিয়া দিলে চুণের উত্তাপ ও তীব্রতা প্রায় আর থাকে না। উক্ত চুণমিশ্রিতসার যখন-তখন ব্যবহার করিতে পারা যায়। উক্ত মিশ্র দ্বারা ক্ষেত্রের ও উদ্ভিদের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। ইক্ষুক্ষেত্রে ও অন্যান্য অনেক ফলের গাছে আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক সময় বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইক্ষু রোপণ করিবার

পূর্ব্বে এই চুণ-মিশ্রকে জুলির মধ্যে দেড় বা দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিলে আরও একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এই যে, রোপিত ইক্ষুতে ভবিষ্যতে কোন কীটের উপদ্রব হয় না।

ইক্ষুর বীজ।—ইক্ষু দণ্ডকে দুই বা তিনটী গ্রন্থিসমেত কর্ত্তন করিলে যে টুকরা বা খণ্ড হয়, তাহাকে 'পাব' কহে। সচরাচর ইহাই বীজ নামে অভিহিত হয়। মরিচসহর (Mauritius) প্রভৃতি দেশে ইক্ষু গাছে প্রকৃত বীজ (seed) জন্মে এবং তথায় সেই বীজ হইতে চারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। এ দেশে পাব্ রোপিত হয়, এই জন্য ইহা বীজ নামেই পরিগণিত। সচরাচর বীজ-পাবে তিনটী করিয়া গ্রন্থি রাখিতে হয়। ইক্ষুদণ্ডের নিম্ন বা উর্দ্ধভাগের পাব অপেক্ষা মধ্যভাগের পাব রোপণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহণীয় কারণ তজ্জাত গাছ সমধিক তেজাল ও স্বল্পগ্রন্থি হয়। কিন্তু বিস্তৃত আবাদের জন্য কেবলই মধ্যাংশের পাব্ সংগ্রহ করিতে হইলে অত্যধিক খরচ পড়িয়া যায় বলিয়া সকলের পক্ষে তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। ইতঃপূর্ব্ব হইতেই যাঁহাদিগের ইক্ষুর আবাদ আছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে পারেন। নূতন ব্রতীগণের জন্য একটী সহজ উপায় আছে। তাঁহারা যতগুলি দণ্ডের বীজ বুনিবেন তৎসমুদায় হইতে মধ্যাংশের পাবগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে আবাদ করিতে পারেন। অতঃপর, পরবর্ত্তী ফসল হইতে ঐরূপে মধ্যাংশের পাব বাছিয়া লইলে দুই তিন বৎসর পরে আর অভাব হয় না। তাহা ব্যতীত, একটী বিশিষ্ট প্রকার ইক্ষু লাভ হয়। নীরোগ ও পরিপুষ্ট দণ্ডই বীজের জন্য ব্যবহার করা উচিত। দণ্ডের শিরোভাগ বা ডগা সমূহকে স্বতন্ত্র স্থানে কলম করিবার প্রণালীতে হাপোর দিয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রের যে সকল স্থানে চারা উদ্গত

না হইবে, বর্ষাকালে সেই সকল স্থানে তাহাদিগকে রোপণ করা উচিত। নিতান্ত কচি ডগা বীজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তজ্জাত গাছ তাদৃশ সবল বা সুপুষ্ট বা দীর্ঘ হয় না। তাহা ব্যতীত, সেই সকল দণ্ডে শর্করার ভাগ আশানুরূপ বা যথাযথ থাকে না। যে সকল পাবে কীট থাকে বা কীটের লক্ষণ দেখা যায়, তাহাদিগকে কোন মতেই রোপণ করা উচিত নহে, কারণ, সেই সকল কীট পরে ক্ষেত্রের অপরাপর গাছ আক্রমণ করিতে পারে। পাব্ কর্ত্তনকালে কীটদষ্ট পাব্ পাইলে তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলা উচিত। নির্ব্বাচিত বীজ বা পাব্‌সকলের সংশ্রব হইতে দাগী পচা বা পোকাধরাদিগকে পৃথক করিতে হইবে। উপরন্তু, অস্ত্রকেও পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহা হউক, যে সকল ইক্ষুদণ্ডে সুপুষ্ট মুখরিত 'চোক' থাকে, সেই সকল ইক্ষুই বীজের বিশেষ উপযোগী। এক বিঘা ভূমিতে ন্যূনাধিক এক কাহণ (১২৮০) পাবের প্রয়োজন হয়। প্রতি দণ্ড ইক্ষু হইতে পাঁচটী করিয়া পাব পাওয়া গেলে ন্যায্য হিসাবে ২৫৬ গাছা ইক্ষুতে এক বিঘার উপযোগী পাব্ উৎপন্ন হয়। এই বীজ-ইক্ষু খরিদ করিতে হইলে প্রত্যেক এক-শতের মূল্য ৩৲ টাকা হিসাবে ধরিলে ৭।৹ হইতে ৮৲ হইতে পারে। দণ্ড হইতে বীজ বাহির করিবার সময় গ্রন্থি না কাটিয়া যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাণাবীজ অর্থাৎ চোক-হীন বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইতে অনেক সময় লাগে, এজন্য মুখরিত ও উদ্গতচোক পাব্‌ই রোপণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

রোপণ প্রণালী।—এ দেশে দুই প্রকারে বীজ রোপিত হয়। প্রথম,—নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যবধানে এক-একটী গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে 'পাব্' ফেলিয়া মাটি চাপা দেওয়া ; দ্বিতীয়,—'দেহাতি' প্রণালী।

শেষোক্ত প্রণালীতে বীজ রোপণ করিতে হইলে সম্মুখে কৃষাণ লাঙ্গল বাহিয়া যাইতে থাকে এবং তাহার পশ্চাতে থাকিয়া এক ব্যক্তি খাদ বা জুলির মধ্যে আধ হাত, তিন পোয়া বা এক হাত অন্তর এক একটী পাব্ ফেলিতে থাকে। বীজ বুনিবার জন্য যে কয়খানি লাঙ্গল প্রবাহিত হয় তাহার প্রত্যেকের পশ্চাতে ঐরূপে একজন লোক বীজ ফেলিয়া যাইতে থাকে। ক্ষেত্রময় বীজ বোনা হইয়া গেলে, তদুপরে উত্তমরূপে চৌকী বা মই দিতে হয়। চীনে ও খাড়ি-ইক্ষু সচরাচর এই প্রণালীতে রোপিত হইয়া থাকে। এতদুভয় পদ্ধতি অপেক্ষা মরিচসহর প্রথা (Mauritius system) বিশেষ কার্য্যকরী। এইজন্য উক্ত প্রণালীতে ইক্ষুর আবাদ করা সমধিক স্পৃহণীয়।

মরিচসহর পদ্ধতি।—উক্ত প্রণালীতে আবাদ করিতে হইলে যথানিয়মে কর্ষণাদি কার্য্য শেষ করিয়া ক্ষেতে ১৷৷০-হাত হইতে ২-হাত অন্তর, ১-ফুট গভীর জুলি কাটিয়া, জুলির মাটি পার্শ্বে ফেলিতে হয়। অতঃপর, জুলি একবার উত্তমরূপে কোপাইয়া ও মাটি ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যে সরাসরি ৪-অঙ্গুলি পুরু করিয়া সার দিয়া ধীরে ধীরে কোদাল দ্বারা উক্ত সার মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর, একব্যক্তি জুলি মধ্যে ১৷৷০-হাত অন্তর এক-কোদাল মাটি তুলিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং তাহার পশ্চাতে অন্য এক ব্যক্তি জুলির সেই গর্ত্তে-গর্ত্তে এক-এক খণ্ড পাব্ ফেলিয়া যাইবে। অগ্রগামী ব্যক্তি সম্মুখে যে আবার একটী পাবের স্থান করিবে, সেই গর্ত্তের মাটি পশ্চাতের পাব-রোপিত গর্ত্তে আসিয়া পড়িবে। এইরূপে সমুদায় ক্ষেত্রে রোয়া শেষ হইলে জুলির মধ্যস্থিত মাটি সমতল করিয়া দিয়া কোদাল দ্বারা সমগ্র জুলি ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়।

যে প্রণালীতেই হউক, রোপণ করিবার পর ক্ষেত্র তৃণময় হইয়া

গেলে মধ্যে মধ্যে নিড়েন করা ভিন্ন আপাততঃ কোন কাজ নাই। মাঘী-রোয়া-ক্ষেত চৈত্রমাসের শেষভাগ মধ্যে চারাপূর্ণ হইয়া পড়ে। যাহা কিছু অঙ্কুরিত হইতে বাকি থাকে তাহা বৈশাখ মাসের ৮।১০ দিনের মধ্যে উদ্গত হয়। এক্ষণেও কোন কোন স্থানে চারা না উঠিলে বুঝিতে হইবে যে, সে সকল স্থানের পাব্ আর অঙ্কুরিত হইবে না। ফেঁকৃড়ি বা কোঁড় * সকল আধ-হাত বা তিন-পোয়া আন্দাজ বড় হইয়া উঠিলে অর্থাৎ জুলি ছাড়াইয়া সাধারণ জমির উপর উঠিলে জুলি পার্শ্বস্থিত 'উঠিত' মাটি দ্বারা খাদ সমূহ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এই 'উঠিৎ' মাটিকে ইতঃপূর্ব্বেই চুর্ণীকৃত ও তৃণাদিবিমুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। রোপণ করিবার পর বৃষ্টি হইলে মাটি বসিয়া যায় সুতরাং বৃষ্টির পর মাটিতে যো হইলে জুলি মধ্যে সাবধানে একবার খুরপি করা বিশেষ আবশ্যক।

ইক্ষু রোপণ করিবার পর ক্ষেতে জলসেচন করিবার কোন আবশ্যক নাই। মাটিতে যে রস থাকে, নবরোপিত পাবের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট! অঙ্কুরিত হইবার পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি অতিশয় খরাণি হয় তাহা হইলে, বর্ষাকাল আগত না হওয়া পর্য্যন্ত, ক্ষেতে প্রয়োজনমত ১৫।২০ দিবস অন্তর ছেঁচ দেওয়া এবং যো হইলে খুরপি দ্বারা মাটি উস্কাইয়া দেওয়া উচিত।

দেশী পদ্ধতি।—দেহাতি বা দেশীপ্রণালীতে আবাদ করিতে হইলে দুই হাত অন্তর শ্রেণিতে দুই হাত অন্তর গর্ত্ত করিতে হয়। উক্ত গর্ত্ত যেন একহাত গভীর ও একহাত ব্যাসের হয়। অতঃপর, উত্তোলিত

* ইক্ষুর গ্রন্থি বা গোড়া হইতে যে ফেঁকৃড়ি বা গাছ জন্মে তাহাদিগকে কোঁড় বা কল্ বলে।

মাটি চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সার মিশাইতে হয়। অনন্তর, গর্ত্ত হইতে অর্দ্ধেক মাটি বাহির করিয়া অবশিষ্ট মাটিকে ঈষৎ চাপিয়া প্রতি গর্ত্তে তিনটী পাব্‌কে ত্রিকোণাকৃতিতে স্থাপিত করতঃ উত্তোলিত মাটির দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া মাটি চাপিয়া দিতে হইবে। ইহাতে কিছু খরচ অধিক পড়ে পরন্তু আশানুরূপ ফসলও উৎপন্ন হয় না। ইহাকে গামলার আবাদের (Pot-culture) প্রকারান্তর বলিয়া আমাদের মনে হয়। গামলায় যে সকল গাছ থাকে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া গামলামধ্যস্থিত স্বল্প পরিমাণ মাটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সেইরূপ উল্লিখিত প্রণালীতে রোপণ করিলে গর্ত্তের আশে-পাশে মূল অধিক প্রসারিত হইতে পারে না, কাজেই গাছ সকল অবাধে বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, আষাঢ়মাসের প্রথমভাগেই ক্ষেত ঈষৎ কুদ্দালিত করতঃ আলের মত করিয়া গাছের গোড়ার মাটি উচ্চ করিয়া দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আগাছা সমূহকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। কোন কোন স্থানে ইহাকে 'মাদা বাঁধা' কহে। অনন্তর, গাছগুলি দুই হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহাদিগের পাতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক ঝাড়কে এইরূপে জড়াইয়া দিলে ইক্ষুদণ্ড হইতে আর ফেঁকড়ি উদ্গত হইতে পারে না। ফলতঃ উর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং স্থূল হইতে থাকে। জড়াইয়া না বাঁধিলে প্রবল বাতাসে ও বৃষ্টির ভারে গাছ সকল হেলিয়া পড়ে, তন্নিবন্ধন উর্দ্ধদিকের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া গিয়া প্রত্যেক গ্রন্থির পার্শ্বদেশ হইতে নূতন নূতন ফেঁকড়ি উদ্গত হয়—ইহা আসল দণ্ড সমূহের পক্ষে ক্ষতিকর। ঝাড় সকলকে উল্লিখিত প্রণালীতে পত্রদ্বারা জড়াইয়া বাঁধিবার আর একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ঝাড় সমূহকে ঘনরূপে

জড়াইয়া বাঁধিলে ইক্ষুদণ্ডে রৌদ্র বা আলোক লাগিতে পায় না, সুতরাং ইক্ষুদণ্ডের মধ্যস্থিত সারাংশ কোমল থাকে এবং রসাল ও সুমিষ্ট হয়। এই সকল কারণবশতঃ প্রত্যেক ঝাড়কে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া একটী বিশেষ কার্য্য।

যে বৎসর বর্ষাকালে সুবৃষ্টি না হয় সে বৎসর যথাযথ প্রয়োজন বুঝিয়া ১৫।২০ দিন অন্তর ক্ষেত্রে জলসেচন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়মাসের মধ্যে গাছসকল যদি বেশ ঝাড়াইয়া না উঠে কিম্বা গাছের বর্ণ স্বাভাবিক ঘন হরিৎ না হয়, তাহা হইলে প্রতি গাছের গোড়ায় ঝুরা সার প্রদান করতঃ কোদাল বা খুরপি দ্বারা মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত। এই সঙ্গে কিছু সোরা ও অস্থিচূর্ণ (বিঘা প্রতি ২।৩ মণ) দিতে পারিলে খুব শীঘ্রই ঝাড় সকল তেজাল ও গাঢ় বর্ণের হইয়া উঠে।

ঝাড়ে বহু সংখ্যক দণ্ড বা ফেঁকড়ী বাহির হইলে তেজাল দণ্ডগুলি রাখিয়া ক্ষীণ, খর্ব্ব ও দুর্ব্বলগুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা সমুদায় ইক্ষুদণ্ডই শীর্ণ ও শুষ্কপ্রায় হয়।

ইক্ষুক্ষেত্রে উইপোকা বড় অনিষ্ট করে। উইপোকা নিবারণের জন্য অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা যে উপায় দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার লাভ করিয়াছি, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ক্ষেতে জলসেচনকালে প্রধান নালার মুখে একখণ্ড কাপড়ের মধ্যে হিঙ্গ বা সর্ষপ খৈলের গুঁড়া বাঁধিয়া দিলে, সেই জল সমুদায় ক্ষেতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। হিঙ্গ বা বা সর্ষপ খৈলের দ্বারা উই পোকা নিবারিত হয়।

ইক্ষুর পরম শত্রু শৃগাল।—রাত্রিকালে ইহারা দলে

দলে ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ইক্ষু ভক্ষণ করে এবং অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে। কোনরূপ বিভীষিকা দেখাইলে ইহাদের ভয় হয় না। এজন্য ইক্ষু ক্ষেত্রের সন্নিকটে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা ভিন্ন অন্য উপায় দেখা যায় না।

ইক্ষু গাছ যখন অতিশয় ছোট থাকে, তখন সময়ে সময়ে খরগস আসিয়া নূতন ডগাগুলি কাটিয়া দেয়। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ক্ষেতের চারিদিক দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ করিয়া আগাছা বা কাঁটা দ্বারা ঘেরিয়া দিতে হয় অথবা প্রত্যেক ঝাড়ের নিকট ২।৪টী খেজুর পাতা এক হস্ত মাপে কাটিয়া পুতিয়া দিলে তাহারা আর ভয়ে তথায় যায় না। ক্ষেত্রমধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলেও ইহারা ক্ষেত্রের মধ্যে আসে না, কিন্তু ইহা তাদৃশ সুবিধাজনক নহে। রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে বড় পট্‌কার আওয়াজ করিলে কিম্বা কেরোসিনের টিন বাজাইলে ইহারা আসে না কিম্বা শব্দ শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করে। শৃগাল তাড়াইবার জন্যও ইহা একটী বিশেষ উপায়। শুনিয়াছি, টীন বাজাইলে ব্যাঘ্রও পলায়নপর হয়।

বীজ বুনিবার পর দশ-এগার মাসমধ্যে ইক্ষুদণ্ড পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহাদিগকে কাটিবার উপযুক্ত সময়। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইক্ষু নীরস হইয়া যায়, ইক্ষুদণ্ডের শিরা সকল স্থূলতা প্রাপ্ত হয় এবং রসে শর্করার ভাগও কমিয়া যায়। আবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কাটা গেলে যদিও তাহা হইতে অধিক রস বাহির হইবার সম্ভাবনা কিন্তু তাহার রস সুমিষ্ট হয় না কারণ তাহাতে তখনও অধিক শর্করা জন্মে নাই। পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বা পরে কাটিলে লোকসান আছে, এই জন্য যথাসময়ে কাটিতে হইবে কিন্তু উক্ত সময় নির্দ্ধারণ করা বিচক্ষণতার কার্য্য। অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাহা স্থির করা কঠিন।

তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারা যায় যে, গাছের বর্ণ যতদিন সবুজ থাকে, ততদিন উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই জানিতে হইবে এবং সে অবস্থা অতীত হইয়া যখন ফিকে বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে কাটিবার সময় সমাগত হইয়াছে এবং কাটিবার উপযোগী হইতেছে বুঝিতে হইবে। তৃতীয় অবস্থায় ইহার পূর্ণতা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। পৌষ বা মাঘী-রোপণের ফসল পরবর্ত্তী কার্ত্তিক পৌষ মাসের মধ্যে কাটিবার উপযোগী হয়।

দ্বিতীয় ফসল বা রেটুন (Ratoon)।—আবাদের সকল দণ্ডই যে এক সময়ে কাটিবার উপযোগী হয় তাহা নহে। যেগুলি পরিপক্ক হইয়াছে তাহাই কাটিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলি রাখিয়া দিলে পরবৎসর সেই ক্ষেত্র হইতে আবার ফসল পাওয়া যায়। এইরূপে একবারের আবাদে তিন বৎসর ফসল হইতে পারে। পুরাতন ঝাড় হইতে ফেঁকৃড়ি জন্মিলে পুনরায় তথায় আর বীজ রোপণ করিতে হয় না। তবে উক্ত ভূমিকে উত্তমরূপে কুদ্দালিত করিয়া ও প্রত্যেক ঝাড়ে সার দিয়া প্রথম চাষের ন্যায় অপরাপর পাট করিলে যথাসময়ে আবার ইক্ষুদণ্ড উৎপন্ন হইবে। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর এবং দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় বৎসর ফলন ক্রমশঃ কম হইয়া থাকে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সার-প্রদান ও জলসেচন করিতে পারিলে কতক সুবিধা হইতে পারে। যদিও অনেকে এ প্রথার পক্ষপাতী কিন্তু আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। একেই ত ইক্ষু এক বৎসর মধ্যেই জমিকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে, তাহাতে উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর এক স্থানে যদি তাহার আবাদ হয়, তাহা হইলে সে জমি কিছু কালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহা ছাড়া ফসলও ভাল হয় না সুতরাং প্রতি বৎসর নূতন জমিতেই আবাদ করা ভাল। আপত্তির আর একটী প্রধান কারণ এই যে, সে জমিতে

হলচালনার উপায় থাকে না এবং বহুল পরিমাণে সার দিতে হয়। আরও দেখা যায়, প্রথম বৎসরের ন্যায় দণ্ড সকল সুপুষ্ট হয় না, ফলতঃ হলচালনার পরিবর্ত্তে কোদালদ্বারা জমি কর্ষণ এবং বহুল পরিমাণে সারপ্রদান করিতে যে ব্যয় হইয়া থাকে, সেই ব্যয়ে নূতন জমিতে অল্পায়াসে আবাদ করা যাইতে পারে এবং তাহাতে আশানুরূপ ফসলও পাওয়া যায়। *

আয়-ব্যয়।—আবাদের তারতম্যানুসারে ইক্ষু ফসল হইতে বিঘাপ্রতি পঁচিশ টাকা হইতে একশত টাকার অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে খরচ ধরা যায় নাই, কারণ খরচ বাদ দিয়া এই টাকা লাভ থাকিবার সম্ভাবনা। বিঘাপ্রতি মোট খরচ ৩০৲ হইতে ৬০৲ টাকা পড়ে।

গুড় তৈয়ার করিবার প্রণালী।—যদিও ইহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অন্তর্গত নহে, তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি।

ইক্ষুদণ্ড মাড়িবার বা পেষণ করিবার জন্য টমশন-মিলনী কোম্পানীর (Thomson, Milne & Co.) যে কল আছে, তাহার মধ্যে ইক্ষুদণ্ড দিলে গরুর সাহায্যে কল ঘুরিয়া ইক্ষুদণ্ড হইতে সমুদায় রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির হয়। এই সকল যন্ত্র দেশী আক-মাড়া কলের রূপান্তর মাত্র। দেশী কল, ছোট ও কাষ্ঠনির্ম্মিত কিন্তু মিল্‌নি কোম্পানীর কল লৌহনির্ম্মিত সুতরাং ভারী। বরণ কোম্পানীর নির্ম্মিত যে আকমাড়া কল (Cane crushing machine) আছে তাহাতেও পেষণ কার্য্য বেশ চলে এবং তাহার মূল্যও বেশী নহে।

* প্রথম বারের আবাদ হইতে ২।৩ বৎসর ফসল উৎপন্ন করিবার পদ্ধতিকে ইংরাজীতে ratoon system কহে।

যে দুইটী রোলারের মধ্যে আক্ দিতে হয় তাহার নিম্নে একটী পাত্র থাকে। যাবতীয় রস তন্মধ্যে গিয়া পড়ে। অতঃপর সেই রস উত্তম রূপে ছাঁকিয়া ফাঁদাল বিস্তৃতমুখবিশিষ্ট ধৌতপাত্রে ঢাকিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া দিতে হয়। এরূপ সাবধানে জ্বাল দিতে হয় যে, অল্পক্ষণমধ্যে রসের অর্দ্ধাংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। রস ঘন ও দানাবৎ হইয়া আসিলে জ্বাল কমাইয়া উনান বা চুলা হইতে পাত্র নামাইয়া ক্রমাগত কাষ্ঠ দ্বারা নাড়িতে হয়। তাহা হইলেই গুড় তৈয়ারী হইল। অধিকক্ষণ অগ্নিতে চড়াইতে বিলম্ব করিলে রসে পচন-ক্রিয়ার (Fermentation) সূত্রপাত হয়, ফলতঃ রস পচিতে আরম্ভ হয় ও অম্লাক্ত হইয়া যায় এবং মিষ্টতার হ্রাস হয়।

দেশীয় প্রণালীতে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহাতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে, এইজন্য যত শীঘ্র রসকে গুড়ে পরিণত করিতে পারা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে গুড় সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ,—ক্ষেত্র হইতে আখ কাটিয়া আনিবার পর পেষণ করিয়া রস বাহির করিতে যেন বিলম্ব না হয়,—বিলম্বে রস কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ,—রস অধিকক্ষণ বাতাসের সংস্পর্শে না থাকে। তৃতীয়তঃ,—উনান বৃহৎ হওয়া চাই। চতুর্থতঃ,—জ্বাল দিবার পাত্র প্রশস্ত ও বৃহদাকার হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমোক্ত প্রণালীতে যাঁহারা গুড় তৈয়ার করিতে চাহেন অথবা সেই কলের ও তদানুষঙ্গিক জিনিষের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে পত্র লিখিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

সর্ষপ

Lat. Brassica dichotome. (Eng. Mustard.)

সমগ্র ভারতবর্ষে বহু প্রকার তৈল শস্তের আবাদ হইয়া থাকে এবং বহুবিধ ফলের আঁটী হইতেও তৈল উৎপন্ন হয় কিন্তু সর্ষপই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কারণ, সর্ষপ তৈলই আমাদিগের রন্ধনকার্য্যের বিশেষ উপাদান। উক্ত তৈল দ্বারা যাহা কিছু রন্ধিত ও রক্ষিত হয়, তাহারই স্বাদ উপাদেয় হয়। ভাজা, পোড়া ও ভাতে তরি-তরকারিতে মাখিলে তাহাদিগের স্বাদ অতি প্রীতিদায়ক হয়। দাক্ষিণাত্যে রন্ধনকার্য্যে সর্ষপ তৈলের ব্যবহার নাই। তথাকার কোথাও তিল-তৈল, কোথাও নারিকেল-তৈল ব্যবহৃত হয়। সর্ষপ তৈলে সকল তরিতরকারির স্বাদ যেরূপ মধুর ও সুবাসিত হয়, তিল বা নারিকেল তৈলে সেরূপ হয় না

সর্ষপের তিনটী জাতি আছে,—কাজ্‌লা, রাঈ ও শ্বেতী, কিন্তু কাজ্‌লার তৈলই উৎকৃষ্ট। সর্ষপের কচি পাতা ও ডগা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। পোড়া, সিদ্ধ বা ভাতে তরিকারিতে শ্বেতী বা রাঈ সর্ষপের গুঁড়া বা বাটনা মাখিয়া ভক্ষণ করিতে সমধিক সুস্বাদ লাগে।

সর্ষপের আবাদে গোময়, খৈল ও উদ্ভিজ্জ-ছাই বিশেষ ফলপ্রদ কিন্তু বেলে জমিতে ছাই প্রয়োগ না করিয়া কেবল খৈল ও গোবর ব্যবহার্য্য। অপর মাটিতে তিন প্রকার সারই নিয়োজিত হইতে পারে। ভাদুই ফসলের পরে সর্ষপের আবাদ করিবার সময়। ভাদুই ফসল ক্ষেত হইতে সংগৃহীত হইবার অব্যবহিত পরেই জমি উত্তমরূপে বারম্বার কর্ষণ করিয়া ঠিক করিতে হইবে। মাটি বারম্বার কর্ষণাদি দ্বারা চূর্ণ করিয়া কার্ত্তিক মাসে যখন আর আশু বর্ষার আশঙ্কা না থাকিবে তখনই বীজ বুনিতে হয়। শীঘ্র শীঘ্র বীজ বুনিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া অনভিজ্ঞের কার্য্য,

কেননা বর্ষা থাকিতে কিম্বা আশ্বিন মাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে ভূমির সুকর্ষণ অসম্ভব। অতঃপর বীজ বুনিবার পর বৃষ্টিপাত হইলে বীজ মাটি চাপা পড়িয়া যায়। অঙ্কুরিত হইবার পরেও, যদি বৃষ্টি হয় তাহা হইলে গাছের গোড়া মাটিতে আঁটিয়া যায়। অতএব, যাবৎ বর্ষা অতীত না হয় তাবৎকাল অপেক্ষা করিয়া সুদিনে বীজ বুনিতে হইবে। তবে. সচরাচর যেখানে ভাদ্রের শেষে কিম্বা আশ্বিনের প্রথমভাগে বর্ষা শেষ হইয়া যায় সেখানে আশ্বিন হইতে কর্ত্তিকের শেষ মধ্যে বীজ বুনিতে হয়। এসম্বন্ধে স্থানীয় অভিজ্ঞতার আবশ্যক।

সাধারণতঃ, বিঘাপ্রতি /১ হইতে /১॥০ বীজ লাগিয়া থাকে, তবে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অনুসারে স্থানবিশেষে তিন পোয়া বীজেও চলে। সরস ও উর্ব্বরা জমিতে তিন পোয়া, মধ্যবিত্তে এক সের এবং জমিতে /১৷০ হইতে /১॥০ বীজ বুনিতে হয়। বীজ যাহাতে সমভাবে ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়ে তজ্জন্য বীজের সহিত ২।৩ গুণ মাটি মিশ্রিত করিয়া বপন করা উচিত। তদনন্তর ক্ষেত্রে একবার মই বা চৌকী দিয়া বপনকার্য্য শেষ করিতে হয়। আবাদকালমধ্যে দুই তিনটা সামান্য বৃষ্টি হইলে সর্ষপ প্রভৃতি রবি শস্যের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অনেক স্থলে সর্ষপ মিশেন বা মিশ্রিত আবাদের (Mixed crop) অন্তর্গত। মিশ্রিত-আবাদে সর্ষপ, বুট, মসিনা ও গোধূম এই চারিটীর যে কোন তিনটীর একত্রে এক ক্ষেত্রে আবাদ করা হইয়া থাকে। মিশ্রিত আবাদে উল্লিখিত পরিমাণের প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ বীজ লাগে।

পৌষ-মাঘ মাসে গাছে ফুল ধরিয়া থাকে। মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে ফাল্গুনের শেষভাগ মধ্যে সচরাচর সর্ষপ পাকিয়া উঠে কিন্তু ঋতুর অবস্থাভেদে কখনও কিছু বিলম্ব হয়। সংক্ষেপতঃ, দানায় সামান্য রস থাকিতেই গাছ কর্ত্তন করা উচিত, নতুবা অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া গেলে

কতক শস্য আপনা হইতে মাটিতে ঝরিয়া যায়, আবার কতক কাটিয়া আনিবার কালে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। এজন্য ফলগুলি একেবারে শুষ্ক হইবার ৫।৭ দিবস পূর্ব্বে গাছগুলি কাটিয়া আনিতে হইবে। সর্ষপের গাছ কাটা হইবার পর তাহাদিগকে খামারের মধ্যে আনিয়া ৬।৭ দিবসের জন্য 'জাগ' দিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে বীজে যে সামান্য রস থাকে তাহা টানিয়া যায় বা শুষ্ক হইয়া যায়। শস্য মাড়িবার উপযোগী হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি সুঁটি হস্তে পেষণ করিতে হয়। বীজ পরিপক্ক হইলে তাহাতে আদৌ সবুজের লেশ মাত্র থাকে না, সবই ঘন লাল বা মসিবর্ণে পরিণত হয়। তখন 'দৌনি' * করিয়া যথানিয়মে মাড়িয়া-ঝড়িয়া শস্য সকলকে গৃহজাত করিতে হইবে। শস্যের সহিত মাটি বা আবর্জ্জনা থাকিলে তাহার মূল্য কমিয়া যায়, সুতরাং শস্যে এ সকল কুটি কাঠি বা ধুলা যাহাতে না থাকিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ফসল জাগ দিবার কালে যদি বৃষ্টি হয় তাহা হইলে জাগ পচিয়া শস্য নষ্ট হইতে পারে, এজন্য বৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে স্তূপের উপরিভাগ আবৃত করিয়া দেওয়া উচিত। গৃহস্থ কৃষকের পক্ষে খলনের উপরে কোন স্থায়ী আবরণ করা ব্যবস্থা।

সর্ষপের চাষে প্রতি বিঘায় চারি মণ হইতে আট মণ পর্য্যন্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট আবাদে বিঘা প্রতি ৪।৫ টাকার অধিক খরচ হয় না।

তৈল নির্গত করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট ছিবড়া থাকে তাহাকে খৈল বা খোল বা পিষ্টক বলা যায়। উক্ত খৈল গবাদি গৃহপালিত পশু-দিগের আহারের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কৃষকগণ সাররূপে ক্ষেত্রে

* বলদের দ্বারা দলনকে 'দৌনি' করা কহে।

ব্যবহার করে। খৈলভক্ষিত পশুর গোময় সাধারণ মেঠো গরুর গোবর অপেক্ষা সার হিসাবে অধিক মূল্যবান।

তৈল নিঃসারণের জন্য আজকাল কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে বিস্তর কল বসিয়াছে এবং মফস্বলের স্থানে স্থানেও এক-একটী কল দেখা যায়। কলে তৈল প্রস্তুত হইবার সময় হইতে তৈলের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুলভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মণ সর্ষপ বিদেশে চালান হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে এবং তাহা বিদেশীয় বণিকদিগের পক্ষে অপ্রিয় হইলেও, ভারতীয় কৃষির স্বার্থানুরোধে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। যে পরিমাণে সর্ষপ রাশি ভারতের বহির্দ্দেশে চালান হইয়া থাকে, ন্যূনকল্পে তাহার অর্দ্ধাংশ সারবান উদ্ভিজ্জাবশেষ ভারতবর্ষ হইতে আমাদের অজ্ঞাতসারে দেশান্তরে যায়। এইজন্য মনে হয়, সদ্য সরিষা চালান না করিয়া, উহা হইতে যদি তৈল বাহির করা যায় এবং সেই তৈল চালান দেওয়া যায় তাহা হইলে বহু লক্ষ মণ খৈল প্রতি বৎসর দেশে থাকিয়া যায়। আমাদিগের দেশ হইতে ক্ষেত্রজাত যত দ্রব্য বিদেশে যায়, বিদেশ হইতে সে পরিমাণের শস্যাদি এদেশে আসিলে আমাদিগের আপত্তির কারণ ছিল না, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন দেশীয় ক্ষেত্রের দুর্দ্দশা করিয়া সদ্য শস্য বিদেশে চালান দেওয়ায় কৃষির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

হরিদ্রা

(Lat: Curcuma longa. Eng: Turmeric)

হাল্‌কা দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট উচ্চ জমিতে হরিদ্রার আবাদ করিতে হয়। মাটি কঠিন হইলে তাহাতে ছাই বা উদ্ভিজ্জ সার মিশ্রিত করিয়া দিলে হাল্কা হইয়া থাকে। হরিদ্রা,—ভারতের নানা স্থানে জন্মে। হরিদ্রা হইতে নানা প্রকার রং প্রস্তুত হয়। হরিদ্রা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়।

হরিদ্রা গাছের মূলে যে গেঁড় থাকে তাহাকেই হরিদ্রা কহে। মূল জাতীয় গাছের গোড়ায় বর্ষাকালে জল সঞ্চিত হইলে সমুদায় মূল নষ্ট হয়, এজন্য হরিদ্রা চাষের জমি সাধারণ ভূমি হইতে উচ্চ হওয়া আবশ্যক। হরিদ্রা লাভজনক ফসল বটে কিন্তু উহার চাষে কৃষকগণ তাদৃশ যত্ন করে না এবং যথেচ্ছভাবে ও স্থাননির্ব্বিশেষে আবাদ করিয়া থাকে। প্রায় ইহাও দেখা গিয়া থাকে যে, যে সকল স্থান একেবারে রৌদ্রের আলোকে বঞ্চিত, বৃক্ষের ছায়ায় আবৃত বা আর্দ্র,সেই স্থানেই হরিদ্রা ,আদা প্রভৃতি রোপিত হইয়া থাকে। এরূপ নিকৃষ্ট প্রণালীতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যালোক এবং বায়ুহীন স্থানে কখন কোন ফসল সুচারুরূপে জন্মে না আমরা অনেকস্থানে দেখিয়াছি, ফলকর বাগানের গাছতলায় বিশেষতঃ আম্রকাননের নিম্নস্থ জমিতে হরিদ্রা রোপিত হয়, ফলতঃ হরিদ্রারও যথাযোগ্য ফলন হয় না। অনেক সুমিষ্ট সুস্বাদ ও সুগন্ধ আম্রাদি ফল হরিদ্রা গাছের সংশ্রবে থাকিয়া নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষিকার্য্য দ্বারা লাভবান হইবার বাসনা থাকিলে তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ে,—বিশেষতঃ জমির বিষয়ে—কৃপণতা করা বড়ই ভ্রম।

পৌষ-মাঘ মাস মধ্যে জমিকে উত্তমরূপে বারম্বার কর্ষণ করিতে

হইবে। দেশীয় ফালে গভীর করিয়া চাষ চলে না, এজন্য জমিকে কোদাল দ্বারা উল্টাইয়া শেষে লাঙ্গল ও মই চালনা করিতে পারিলেই ভাল হয়। যে উপায়েই হউক, হরিদ্রার জমি গভীর ও আল্গা করিতে হইবে। মৃত্তিকা স্থিতিস্থাপক না হইলে মূল বাড়িতে না পারিয়া কেবল গাছই বাড়িয়া থাকে। হরিদ্রার গাছ বাড়িলে কৃষকের লাভ কি? যাহাতে মূল বাড়িতে পারে ও পরিপুষ্ট হয় সে বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে।

উপরোক্ত প্রণালীতে জমি তৈয়ার হইলে মাঘ-ফাল্গুন মাস মধ্যে বীজ-হলুদ রোপণ করিতে হইবে। বীজ অর্থে এস্থলে মূল বা গেঁড় বুঝিতে হইবে। বিঘাপ্রতি বিশ সের বীজ হইলেই যথেষ্ট হয়। বৃহদাকারের বীজ রোপণ না করিয়া মূলগুলি কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলে এক এক টুক্‌রা বা খণ্ড এক একটি বীজ হইবে। মূলগুলিকে কাটিবার পর ঈষৎ ভিজা খড়ের মধ্যে ৮।১০ দিবস রাখিয়া দিলে গেঁড়গুলি শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সেই সময় উহাদিগকে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। প্রত্যেক টুকরাতে দুই একটি চোক থাকা আবশ্যক। ক্ষেতের মধ্যে একহাত অন্তর জুলির মধ্যে, তিন-পোয়া-হাত ব্যবধানে, এক একটী গেঁড় ৪।৫ অঙ্গুলি মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে। ঘনভাবে বীজ রোপণ করিলে স্থানাভাবে চারা উর্দ্ধে লম্বা হইয়া উঠে এবং পার্শ্বদেশে ঝাড় বাঁধিতে সুযোগ পায় না, ফলতঃ মূলও বাড়িতে পারে না।

গাছগুলি আধ হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে, ক্ষেত্র একবার নিস্তৃণ করা কর্ত্তব্য। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যদি একবারও বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে আবশ্যকমত একবার বা দুইবার সেঁচ ও কোদাল দ্বারা মাটি উল্টাইয়া ও চূর্ণ করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। আষাঢ় মাসে

বর্ষা আগত হইলে গাছের গোড়ায় খৈল সার দেওয়া উচিত। মাটি-বিশেষে বিঘা প্রতি দুই মণ হইতে তিন মণ খৈল কিম্বা ২।৩ গাড়ী গোশালার আবর্জ্জনা লাগে। মাটি আঁটাল হইলে বিঘা প্রতি ৪।৫ গাড়ী কাঠের ছাই দিলে ভাল হয়, মাটি ফেঁসো হয় ফলতঃ মূল বাড়িতে পারে। বর্ষা আরম্ভ হইলে উহাতে আর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া, তৃণজঙ্গলাদি ক্ষেত হইতে মুক্ত করিয়া গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিলে হরিদ্রার বিশেষ উপকার হয়।

পৌষ-মাঘ হইতে গাছ শুকাইতে থাকে এবং তখন ক্ষেত হইতে ফসল উঠাইবার সময় হয়। এক্ষণে কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া গাছের মূলগুলি বাছিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। বড় বড় মূলগুলি শীঘ্র শুষ্ক করিবার জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে দিতে হয়। আট দশ দিবসের পর মূল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, সেই সকল মূল গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। উক্ত জলের সহিত ঈষৎ গোময় মিশ্রিত করিয়া দিলে ভবিষ্যতে হলুদে পোকা ধরে না। সিদ্ধ করিবার সময় পাত্রটি ঢাকিয়া রাখিতে হয় এবং যখন জল গরম হইয়া পাত্র হইতে উথলিয়া উঠিতে থাকিবে, তখন উহা সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া অগ্নি হইতে নামাইতে হইবে। সিদ্ধ হইবার পর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই হরিদ্রা প্রস্তুত হইল। সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে দিবার পর যাবৎ না উত্তমরূপে শুষ্ক হয় তাবৎ প্রতিদিন প্রসারিত মূলের উপর চট বা এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা সেই হলুদ সমূহকে দলন করিতে হয়। এইরূপে দলন করিলে হলুদের শাঁস দানাদার হয়। ভবিষ্যতের চাষের জন্য যে বীজ রাখা যায় তাহা সিদ্ধ করিতে হয় না, সুতরাং তাহা কাঁচা অবস্থাতেই রাখিয়া দেওয়া উচিত। বিঘা প্রতি দশ মণ হইতে পনর মণ পর্য্যন্ত হরিদ্রা উৎপন্ন হয় কিন্তু উহা সিদ্ধ ও শুষ্ক হইবার পর প্রতি মণে পনর

সের দাঁড়ায়। একবিঘা ভূমিতে পনর মণ হরিদ্রা উঠিলে তাহা হইতে সাড়ে পাঁচ মণ পাকা অর্থাৎ শুষ্ক হরিদ্রা দাঁড়াইতে পারে।

হরিদ্রার সহিত চূণ মিশ্রিত করিলে ঘন লালবর্ণে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে বিশেষতঃ উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, ও মহীশূরের স্ত্রীলোকেরা হরিদ্রা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করে। হিন্দুদিগের অনেক শুভকার্য্যের ইহা একটী উপকরণ। শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে কিম্বা কোনরূপ আঘাত লাগিলে পেষিত হরিদ্রা উত্তপ্ত করিয়া লেপন করিলে উপকার হয়। খেত-খামারে অনেক সময় উই পোকা, পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। হরিদ্রা চূর্ণ করিয়া অথবা তাহা জলে গুলিয়া সেই স্থানে দিলে কীট মরিয়া যায় বা পলায়ন করে।

আর্দ্রক

(Lat: Zinziber officinale. Eng: Ginger)

চলিত ভাষায় লোকে ইহাকে আদা কহিয়া থাকে সুতরাং আমরা ইহাকে আদা নামে উল্লেখ করিব। আদা গাছের মৃত্তিকাভ্যন্তরে যে মূল থাকে তাহাকে আদা কহে।

মূলবিশিষ্ট ফসলের পক্ষে উচ্চ ও হাল্‌কা মাটির প্রয়োজন। আদাগাছের গোড়ায় জল বসিলে মূল পচিয়া যায় এবং কঠিন বা চিক্কণ মাটিতে আবাদ করিলে মূল বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

হরিদ্রার ন্যায় ইহার মূল বা গেঁড়ই বীজ। আদার জন্য অন্ততঃ নয় ইঞ্চ বা আধ হাত গভীর করিয়া মাটি চষিতে হইবে। মাটি আল্‌গা

ও ঝুরা করিবার জন্য ছাই বা উদ্ভিজ্জের আবর্জ্জনা তাহার সহিত মিশাইয়া লইলে ভাল হয়। এক বিঘা জমিতে কুড়ি হইতে পঁচিশ সের বীজ হইলেই চলিবে।

সচরাচর আর্দ্রক-মূল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপিত হইয়া থাকে কিন্তু গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতানুসারে মাঘমাসই রোপণের প্রশস্ত সময়। এ সময় ভূমিতে রস থাকে, মাটি নরম থাকে সুতরাং সে সময়ে কর্ষণাদি কার্য্য সহজে ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। অতঃপর উক্ত সময়ে অর্থাৎ মাঘ মাসে রোপণ করিতে পারিলে ফসল তিন চারি মাসকাল অধিক দিন ক্ষেত্রে থাকিতে পায় সুতরাং বর্দ্ধিত হইবার যথেষ্ট অবসর পায়। শেষোক্ত সময়ে রোপণ করিতে পারিলে প্রায় দ্বিগুণ ফসল পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আদার জন্য ক্ষেত্রকে নয় ইঞ্চ গভীর করিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করতঃ তাবৎ মাটি চূর্ণ করিতে হইবে। মাটি ভারী, ঘন বা এঁটেল হইলে গো-খানার বা কুড়ের আবর্জ্জনা, ছাই, কিম্বা গলিত উদ্ভিজ্জাদি দ্বারা তাহাকে হাল্কা ও ঝুরা করিয়া লইতে হইবে।

ক্ষেত্রমধ্যে দেড় বিঘত অন্তর সারি মধ্যে দেড় বিতস্তি অন্তর এক-একটী গেঁড় ৪।৫ অঙ্গুলি মৃত্তিকার মধ্যে রোপণ করিতে হয়। রোপিত হইবার পর দুই একটী বৃষ্টি হইলে গাছ বাহির হইতে অধিক বিলম্ব হয় না, নতুবা তিন চারি সপ্তাহ সময় লাগে। অঙ্কুরিত হইয়া গাছ গুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ বড় হইলে সমুদায় ক্ষেত একবার কোদাল দ্বারা কুদ্দালিত করতঃ প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিয়ৎ পরিমাণ খৈল-সার দিলে গাছগুলি পরিপুষ্ট ও ঝাড়াল হইয়া উঠে এবং তাহাতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অন্যান্য সার অপেক্ষা রেড়ীর খৈল আদার পক্ষে বিশেষ উপকারী। খৈল, চূর্ণ করিয়া দিলেই ভাল হয়।

আবাদকালে অনাবৃষ্টি বা নগণ্য বৃষ্টি হইলে ক্ষেতে জলসেচন করা বিশেষ প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজনীয়তা যিনি অনুভব করেন, তাঁহার পক্ষে আদা-ক্ষেতে অন্ততঃ মাসে একবার জলসেচন করা উচিত। বর্ষারম্ভ হইলে আর জলসেচন করিতে হয় না।

আর্দ্রক-ক্ষেত্র যাহাতে কঠিন ও জঙ্গলময় হইতে না পায়, তজ্জন্য প্রতি মাসে উহা একবার কোপাইয়া দিলে এবং মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া নিড়ানি দ্বারা পরিষ্কার ও আল্গা করিয়া দিলে ফসলের পরিমাণ বাড়িবে। প্রতিবার যেমন গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে সেই সঙ্গে গাছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিতে হইবে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস হইতে আদাগাছ শুকাইতে থাকে। গাছগুলি যখন একেবারে শুকাইয়া যাইবে, তখন কোদাল দ্বারা গাছের গোড়ার মাটি উল্টাইয়া সমুদায় মূল বাছিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর মূলগুলিকে জলে ধৌত করিয়া খামার বা অঙ্গিনা মধ্যে শুকাইয়া ধারাল ছুরিকা দ্বারা যাবতীয় মূলকে টুকরা টুকরা করিয়া, পুনরায় কয়েক দিবস উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে শুঁট প্রস্তুত হইল এবং এই শুঁটই বিলাতে রপ্তানি হইয়া থাকে। যদি শুঁট প্রস্তুত করিবার আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে কাঁচা অবস্থায় বিক্রয় করা যাইতে পারে।

এস্থলে সাধারণ পাঠকের বিদিতার্থ পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি যে, কোন ফলের গাছতলায় আদার আবাদ করিলে ফলকর গাছের বিশেষ অনিষ্ট হয়, কিন্তু অনেক বাগানেই দেখা যায় যে, হরিদ্রার ন্যায় আদাও গাছের তলায় রোপিত হয়, ইহাতে যে সমূহ অনিষ্ট হয় তাহা উদ্যানস্বামী লক্ষ্য করিতে পারেন না। ছায়াবৃত স্থানে আবাদ করিলে যে কোন লাভ হয় না তাহা হরিদ্রার প্রস্তাবে বলিয়াছি।

যব

(Lat: Hordeym hexastichon. Eng: Barley.)

যব,—রবি-শস্যের অন্তর্গত ফসল। ভাদুই ফসলের পর বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে ক্ষেত্র উত্তমরূপে আবাদোপযোগী করিতে হইবে। যবের ভূমি গভীররূপে কর্ষণ করা আবশ্যক, কারণ উহার মূল মাটীর ভিতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথম একবার বা দুইবার লাঙ্গল দেওয়া হইলে বিঘা প্রতি ৪।৫ গাড়ি গোবর সার দিয়া পুনরায় হলচালনা দ্বারা উহাকে মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। পলি-পড়া জমি হইলে তাহাতে সার দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যব ইংরাজী ভাষায় বার্লি নামে অভিহিত। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে মানব জাতির মধ্যে খুব পরিচিত। যব হইতে যবচূর্ণ (Barley Powder) এবং ভারতীয় কবিরাজগণ যবের মণ্ড বহুকাল হইতে রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন যবের মণ্ড স্থলে বিলাতী 'বার্লি'র ব্যবহার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আজকাল বার্লি-পাউডার স্থলে পার্ল-বার্লির (Pearl Barley) প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী হইয়াছে। যবদানা খোসা বিবর্জ্জিত হইলেই পার্ল বার্লির রূপ ধারণ করে। উদ্যোগী পুরুষ ইচ্ছা করিলে পাউডার ও পার্ল-বার্লি প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের এবং দেশের ও দশের সমূহ উপকার করিতে পারেন কিন্তু সে পুরুষ সিংহ কৈ ?

কার্ত্তিক মাস বীজ বপনের সময়। সচরাচর বিঘা প্রতি দশ সের বীজ ছিটান হয়, কিন্তু তাহাতে বড় পাতলা হয়। পনর সের বীজ দিলেই ঠিক হয়। ছিটাইয়া বীজ বপন করা অপেক্ষা সরল জুলির মধ্যে

বপন করায় লাভ আছে। যবের ক্ষেতে এদেশে জলসেচনের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু জল সেচন করিলে অধিক ফসল জন্মে। যে সকল ক্ষেতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে তথায় পাঁচ সের বীজ বুনিলেই চলিতে পারে। বীজ বপনের ৫।৬ দিবসের মধ্যেই চারা দেখা দেয়। চারাগুলি ঈষৎ বড় হইলে প্রতি বিঘায় ৭।৮ সের সোরা ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। মৃত্তিকা সরস না হইলে সোরা প্রদানে কোন ফল হয় না।

যাহারা শস্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল উহার গাছ পশুদিগকে খাওয়াইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে জলসেচনের বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। ক্ষেত্রে প্রতি মাসে দুইবার জলসেচন করিতে পারিলে তিন চারিবার গাছ কাটীয়া পশু-দিগকে খাওয়ান চলিতে পারে কিন্তু গাছ কাটিয়া লইলে ফসল কম জন্মে সুতরাং যাঁহারা শস্যের জন্য আবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা গাছ না কাটিয়া ক্ষেত্রে যদি মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জলসেচন করেন, তাহা হইলে শস্য অধিক হয়।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যব পাকিয়া উঠিলে ফসল কাটিয়া খ'লেনে আনয়ন করতঃ মাড়িয়া-ঝাড়িয়া লইতে হয়। ফসল অল্প হইলে দোনি না করিয়া 'ঠেঙ্গাইয়া' (লগুড়াঘাতে) শস্যকে স্বতন্ত্র করিলে চলে। বিঘা প্রতি ৫/০ মণ হইতে ২০/০ মণ শস্য জন্মে।

হিন্দুস্থানী দরিদ্র লোকেরা ইহার ছাতু খাইয়া প্রাণধারণ করে। উক্ত ছাতু অতি পুষ্টিকর জিনিষ। ছাতু খাওয়াইলে অশ্বগণ বলবান হয়।

গোধূম

(Lat: Triticum Vulgare. Eng: wheat.)

বেলে বা দোয়াঁশ অপেক্ষা আঁটাল মাটীতে গোধূম ভাল জন্মে কারণ, বৎসরের যে ভাগে ইহার আবাদ হয়, তখন বর্ষা অতীত হইয়া যাওয়ায় মাটি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। বেলে ও দোয়াঁশ মাটির রস শীঘ্র শুকাইয়া যায়, পরে মাটিতে রসাভাব হয়। অতঃপর উচ্চ অপেক্ষা নাবাল জমিতে (যাহা আশ্বিন মাসে জাগিয়া উঠে) গোধূম ভাল জন্মে। ডোবা জমিতে অস্থিচূর্ণ এবং উচ্চ জমিতে মিশ্র-সার ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে আশ্বিনের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যে জমি উত্তমরূপে তৈয়ার করিতে হয়। গোধূমক্ষেত্রে ৮।১০টী চাষ দেওয়া উচিত। গোধূমের মূল উপরিভাগে বিস্তৃত না থাকিয়া মৃত্তিকার ভিতরদিকে প্রবেশ করে সুতরাং ভূমি গভীরভাবে অন্ততঃ ৭।৮ ইঞ্চ কর্ষিত হওয়া উচিত।

মাটি নিস্তেজ হইয়া থাকিলে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া আবশ্যক। লাঙ্গল দিবার সময় গোময়-সার, এবং গাছ বড় হইলে সোরা বা লবণ দিতে হয়। ডোবা বা বন্যাপ্লাবিত জমিতে সার দিবার আবশ্যক নাই, তবে যদিই দিতে হয় তাহা হইলে ধূলাবৎ সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ লাঙ্গলের দিবার সময় দিলেই চলে। দানাযুক্ত সার বর্ষা থাকিতেই জমিতে ছিটাইয়া না দিলে শীঘ্র দ্রবীভূত হয় না। ক্ষেত্রের অবস্থাবিশেষে বিঘা প্রতি পাঁচ হইতে পনর সের সোরা বা লবণ এবং অস্থিচূর্ণ দুই মণ দিতে পারা যায়।

কার্ত্তিক মাস বীজ বুনিবার সময়। সচরাচর ছিটাইয়া বীজ বপিত

হয়, কিন্তু জুলি করিয়া বীজ বুনিলে ফসল অধিক হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা যে, গোধূমের আবাদে জলের প্রয়োজন হয় না কিন্তু দেখা যাইতেছে আবাদকালে ২-৩টী সেঁচ দিলে বিশেষ লাভ আছে। ক্ষেতে ফসল থাকিতে মধ্যে মধ্যে যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ফসলের বিশেষ উপকার হয়। সাধারণতঃ দুই তিন মণ ফসল বিনা সারে বা বিনা জলসেচনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ যত্ন করিলে বিঘা প্রতি ৯।১০ মণ গোধূম ও কুড়ি মণ খড় পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি দুই তিন মণের স্থলে নয় মণের কথা শুনিলে অনেকে বিস্মিত হইতে অথবা গল্প মনে করিতে পারেন, কিন্তু কয়েক বৎসর গ্রন্থকার স্বয়ং প্রতি বিঘায় আট মণ গোধূম উৎপন্ন করিয়াছেন। প্রতি মণের মূল্য ২॥০ ধরিলে শস্যের মূল্য ২০৲ টাকা হয়। এতদ্ব্যতীত খড়ের মূল্য আছে। উক্ত ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় অর্দ্ধ মণ সোরা পড়িয়াছিল। তাহার মূল্য ১॥০ হইতে ২৲ টাকার অধিক নহে। এতদ্ব্যতীত দুইবার জলসেচন করিতে হইয়াছিল। বেতনভোগী লোকে জলসেচন করিয়াছিল, কিন্তু সেই কয়জন লোক ঠিকা হইলে দুই বারে ১।০ হিসাবে ২॥০ টাকার অধিক লাগিত না। অতএব সাধারণ আবাদ অপেক্ষা এই আবাদে প্রতি বিঘায় ৪॥০ টাকা অধিক খরচ লাগিয়াছিল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ২০৲ টাকা হইতে ৪॥০ টাকা অধিক লাগিয়াছিল এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ২০৲ টাকা হইতে ৪॥০ টাকা বাদে প্রতি বিঘায় ১৫॥০ টাকা লাভ ছিল। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে যে আবাদ করা হয়, তাহাতে কোন সার প্রদান বা জলসেচন করা হয় না। ইহাতে ২॥০ মণ শস্য উৎপন্ন হয় এবং তাহার মূল্য ২॥০ টাকা হিসাবে ৬।০ টাকা হয়।

প্রতি বিঘায় ।৫ সের বীজ লাগে। উৎকৃষ্ট আবাদে ৴৭॥০ সের বীজ লাগিয়া থাকে। বীজগুলি কীটদষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য

রাখিতে হইবে। দেশী নিকৃষ্ট বীজ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমের বা অপর স্থানের ভাল বীজ বপন করিলেই ভাল হয়। এজন্য প্রতি বৎসর না হইলেও, দুই এক বৎসর অন্তর, নূতন বীজ আমদানি করা উচিত।

পূর্ব্বে যে জুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা তিন-পোয়া-হাত ব্যবধানে করিলেই চলিবে। উক্ত জুলি মধ্যে বীজ দিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। জুলি মধ্যে বীজ বপন করিলে ক্ষেতে জলসেচনের সুবিধা হয়। এ দেশে গোধূম-ক্ষেতে জলসেচনের ব্যবস্থা বা প্রথা নাই, এজন্য বিনা জুলিতেই বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। বীজ বপনের পর মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বৃষ্টির একান্ত অভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে জলসেচন করা উচিত। অনেক সময়ে মাটি এত নীরস হয় যে, গাছগুলি শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে অতি রুগ্ন ও শীর্ণ শীষ বাহির হয় ও তাহাতে অনেক দানা অপুষ্ট থাকে, ফলতঃ ফসলও যৎসামান্য হয়। গাছে শীষ আগতপ্রায় বা উদ্গত হইলে যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ক্ষেতে একবার জলসেচন করিলে শীষসমূহ দানাপূর্ণ হয়, এবং দানা পরিপুষ্ট হয়। সাধারণ চাষীদিগের বিশ্বাস যে, বীজ পাতলা ভাবে বুনিলে বরং বিশেষ ক্ষতি আছে। ইহাতে ক্ষেতের মধ্যে অতিরিক্ত সূর্য্যোত্তাপ প্রবেশ করতঃ জমির রস শীঘ্র শুষ্ক করে এবং উদ্ভিদ হইতেও বহু রস শুষ্ক হইয়া গাছকে হীনবল করে কিন্তু ঘন বুনিলে জমি তাদৃশ শীঘ্র নীরস হইতে পায় না অথচ গাছগুলিও সতেজ থাকে।

ফাল্গুন হইতে চৈত্র মাস মধ্যে গোধূম পাকিয়া উঠে এবং গাছ শুকাইয়া যায়, তখন ফসল কাটিতে হয়। ইহার বিচালি যদি গৃহপালিত গবাদি পশুকে খাওয়াইবার জন্য আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে শীষগুলি কাটিয়া লইলেই চলিতে পারে এবং গাছের অবশিষ্ট অংশ

ক্ষেত্রেই পতিত থাকিতে দিলে ক্রমে পচিয়া জমি সারবান হয়। যাহা হউক, শস্য কাটা হইলে খলেনে বা খামারে আনিয়া সর্ষপাদির ন্যায় দৌনি করতঃ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। বীজ পরিষ্কার করিবার জন্য বিলাতী এক প্রকার (winnowing machine) যন্ত্র আছে। ইহার চক্র ঘুরিবার সময় কিঞ্চিৎ উচ্চ হইতে শস্য ঢালিতে থাকিলে বাতাসে সমুদায় কাটিকুটি ও ধূলা উড়িয়া যায় এবং প্রকৃত শস্যগুলি ভূমিতে পতিত হয়। কৃষকগণ কুলা (কুলো) দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করে।

(Lat: Zea maize. Eng: Indian corn)

বাংলাদেশে ইহা মক্কা নামে অভিহিত কিন্তু ভুট্টা ইহার সাধারণ নাম। বেহারাঞ্চলে ইহা 'মকাই' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কৃষি-ফসলরূপে খাস বঙ্গদেশে ভুট্টার বড় আবাদ হয় না, কারণ তথায় ইহা খাদ্য শস্যরূপে পরিগণিত নহে। বাঙ্গালা দেশে বাগ-বাগিচায় ঔদ্যানিক ফসল হিসাবে ইহার অল্প-স্বল্প আবাদ হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা ভদ্রলোকের আহারীয় শস্য নহে। যে সকল দেশে ইহার যথেষ্ট আবাদ হয় তথাকার শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীগণ মধ্যেই উহার প্রচলন অধিক। পশ্চিমাঞ্চলে বারিপাতের অল্পতা হেতু যে তথায় ইহার আবাদে অধিক হয়, তাহার কোন ভুল নাই। ভুট্টা আবাদের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, অল্প বর্ষাতেই ইহার আবাদ হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করিতে পারা যায়। উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা এবং আসাম প্রদেশের বারিপাত সমধিক ও দীর্ঘকালস্থায়ী সুতরাং ধান্যই সেখানে উৎকৃষ্ট-রূপে জন্মে। এই জন্য এবং আবাহাওয়ার তারতম্যতা হেতু ধান্যই বাঙ্গালীর প্রদান খাদ্য শস্য কিন্তু বাঙ্গালা-দেশে যাহাতে ইহার

সমধিক আবাদ হয় সেজন্য চেষ্টা করা উচিত। শ্রমজীবী বা চাষীগণের ঘরে কিছু ভুট্টা মজুত থাকিলে ধান্য মহার্ঘ হইলে বা অজন্মা হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। ধান্য না জন্মিলে কিম্বা দুর্ম্মূল্য হইলে এই শ্রেণীর লোকই কষ্ট পায়—ইহাদিগের উপর দিয়াই দুর্ভিক্ষের বেগ চলিয়া যায়। এতদ্‌বস্থায় ভুট্টার আবাদ বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের কথা বলিয়া মনে হয়।

ঈষৎ উচ্চ জমিতে ভুট্টার আবাদ করিতে হয়। সকল প্রকার মাটিতেই ভুট্টা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে কেঁসা বা দোয়াঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। জমি,—বিশেষ উর্ব্বরা হওয়া প্রয়োজন। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস মধ্যে পাঁচ-সাত গাড়ী সারকুড়ের আবর্জ্জনা ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া বারম্বার হলচালনাদি দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্ষেত একবার যথারীতি চষিয়া, ছিটাইয়া বীজ বুনিতে হয়। বীজ বুনিবার পর চৌকি বা মদিকা দ্বারা মাটি সমতল করিয়া দিতে হইবে। বিঘা প্রতি ৴৫ সের বীজ লাগে। ৭।৮ দিনের মধ্যেই গাছ উৎপন্ন হয়। গাছ আধ হাত বাড়িলে নিস্তৃণীর প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইয়া মাটি চাপিয়া গিয়া থাকিলে এবং যো হইলে ক্ষেতে দুই পালা মই বা চৌকী দিতে হইবে। হালিকাভাবে বিদ্ধক পরিচালনা করিতে পারিলে আরও ভাল হয় কারণ তাহা হইলে তৃণাদি মরিয়া যায়, ভুট্টা গাছের গোড়ার মাটি আলগা হয়, ফলতঃ গাছ-গুলি অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। অনেক গাছের গোড়া ও মূলকাণ্ড হইতে ফেঁকড়ি উদ্গত হয়। সেই সকল ফেঁকড়ি একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, নতুবা গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে যে বাইল বা মোচা জন্মে তাহাতে অধিক দানা জন্মে না। ভুট্টা ক্ষেত্রের মাটি সমধিক তেজাল হইলে গাছ ঝাঁড়াইয়া যায় ফলতঃ তাহার

মোচায় দানা অধিক হয় না, আবার অনেক সময় ৩।৪টী মোচা জন্মে এবং সকল মোচায় অধিক ও পরিপুষ্ট দানা জন্মে না। এতদ্ব্যতীত দানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলে তদুৎপন্ন আটার পরিমাণ অল্প এবং খোসা বা ভুষির পরিমাণ অধিক হয়। ঝাঁড়াইয়া গেলে ডগার এক হাত আন্দাজ কাটিয়া দিলে শীঘ্রই মোচা দেখা দেয়। দানা পাকিয়া উঠিলে মোচা সংগ্রহ করিতে হয়।

জলসেচনের বন্দোবস্ত রাখিতে পারিলে বারমাসই ভুট্টার আবাদ করিতে পারা যায় কিন্তু ছেঁচ দিয়া ভুট্টার আবাদ করিতে খরচা অধিক পড়ে এবং আবাদ করিয়া বেশী লাভ থাকে না, এজন্য সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। মাটি বেশ রসা থাকিলে আশ্বিন মাসে আর এক দফা হৈমান্তিক ফসলরূপে আবাদ করা যাইতে পারে কিন্তু এ আবাদে বর্ষাতির ন্যায় ফসল হয় না।

দেশী অপেক্ষা মার্কিন ভুট্টার ফসল অধিক, কারণ তাহার মোচা ও দানা—উভয়ই বড় হইয়া থাকে। মার্কিন বীজের দাম অধিক বলিয়া লোকে দেশী বীজে আবাদ করে। ছিটান-বুনানী না করিয়া সারিবন্দি প্রণালীতে বীজ বুনিলে অল্প বীজ লাগে এবং ফসল ভাল হয়। ছিটান বুনানিতে বিঘায় /৫ সের এবং সারবন্দিতে /১॥০ সের বীজ লাগে; সারবন্দিতে ক্ষেতের মধ্যে এক হাত অাঁতর দিয়া শ্রেণীতে তিন-পোয়া-হাত বা ১॥০ বিঘত ব্যবধানে ৩।৪ অঙ্গুলি মাটির নিম্নে দুইটী করিয়া বীজ ফেলিতে হয়। প্রত্যেক স্থানে ২টী করিয়া গাছ জন্মিলে এবং চারাগুলি আধ হাত বড় হইলে প্রত্যেক স্থলে একটী গাছ রাখিয়া অপরটী উৎপাটিত করা উচিত। সারবন্দি প্রাণলীতে বীজ বপন করিলে গাছ যখন এক হাত উচ্চ হইয়া উঠে তখন গাছের পংক্তিতে মাটি দিয়া আল বাঁধিয়া দিতে হয়। ছিটান-বুনানিতে অনিয়মিতরূপে যথাতথা

বীজ নিপতিত হয় বলিয়া গাছের একটা শৃঙ্খলামত শ্রেণী পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাতে আ'ল বাঁধিতে পারা যায় না।

বিঘা প্রতি ৮।৯ মণ ভুট্টা (দানা) উৎপন্ন হয় কিন্তু চাষীদিগের সারহীন ক্ষেত্রে ৩।৪ মণের অধিক হয় না। অপরিপক্ক মোচা সন্নিকটস্থ বাজারে পাঠাইতে পারিলে অধিক মূল্য পাওয়া যায়। পরিপক্ক শস্যের মূল্য ১।।০ টাকা মূল্য হইতে ২৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। অপরিপক্ক ভুট্টাকে অগ্নিদগ্ধ করতঃ শস্যকে স্বতন্ত্র করিয়া তৈল ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিতে উপাদেয় লাগে—অতি মুখরোচক হয়। ইহার সহিত কাঁচা লঙ্কা বা মরিচের গুঁড়া থাকিলে আরও মুখরোচক হয়। বালি খোলায় ভুট্টা ভর্জ্জিত হইলে খৈ হইয়া থাকে। ভুট্টার আটা তৈয়ার করিতে হইলে উহাকে গরম জলে কিম্বা শীতল জলে ১০।১২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবার পর কিয়ৎক্ষণ প্রসারিত করিয়া রাখিতে হয়। শস্যের গাত্রস্থিত জল শুষ্ক হইয়া গেলে একবার উখোড় অর্থাৎ উদুখলে কুট্টন করতঃ জাঁতায় পেষণ করিলে আটা প্রস্তুত হয়। অতঃপর তাহা চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়। সচরাচর লোকে ভুট্টাকে জলসিক্ত না করিয়া খোলায় ঈষৎ উষ্ণ করিয়া পরে কুট্টন করে। জলসিক্ত করিয়া কুট্টন করিলে ভাল আটা উৎপন্ন হয়। কুট্টন করিবার পূর্ব্বে জলসিক্ত করিলে কুট্টন ও পেষণ কালে বাতাসে আটা উড়িয়া যাইতে পারে না কিন্তু অতিশয় সিক্ত থাকিলে ঘরট্টুতে বা উখ্‌লিতে পিণ্ড পাকাইয়া যায়।

মোচা হইতে দানা স্বতন্ত্র করিবার ও শস্য পেষণ করিবার যন্ত্র কলিকাতায় টি, টমসন কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়। ভুট্টার আবাদ উঠিয়া গেলে সেই ক্ষেতে সর্ষপ, গোধূম, তিসি, কুসুমফুল প্রভৃতির আবাদ হইয়া থাকে। ভুট্টা অতি অল্পজীবী ফসল, অত্যধিক তিন মাস কাল মাত্র ইহার পরমায়ু কিন্তু এত বুভুক্ষু যে, সেই অল্পকাল মধ্যেই

সুদীর্ঘ গাছে ক্ষেত ভরিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহারা সেই স্বল্পকাল মধ্যে ভূমি হইতে কত খাদ্য, ভূমির কত জৈব ও অজৈব পদার্থ আহরণ করিয়া থাকে। এই জন্য প্রতিবৎসর একই ক্ষেত্রে ভুট্টা বা ভূট্টা বর্গীয় ফসলের আবাদ করা উচিত নহে। ইক্ষু, দে-ধান (Sorghum) চীনা প্রভৃতি ভূট্টাবর্গীয় গাছ। এতদ্ব্যতীত ধান্য, গোধূম প্রভৃতি তৃণবর্গীয় ফসল ভুট্টা ক্ষেতে ভাল জন্মে না। এজন্য ভূট্টার পরবর্ত্তী ফসল ডাল-কড়াই মুগ, মসুরী, খেঁসারী, বুট প্রভৃতির আবাদ করাই শ্রেয়।

লঙ্কা

(Lat: Capsicum Sp. Eng: Pepper or Chilli,)

লঙ্কা অতি লাভের ফসল কিন্তু প্রতি বৎসর একই ক্ষেত্রে ইহার আবাদ করা চলে না। একই ক্ষেত্রে আবাদ করা ভিন্ন উপায় না থাকিলে লঙ্কা আবাদের পর ক্ষেত্রকে চৌমাস দিতে হয়। সাধারণ ডাঙ্গা-জমিতে ইহার আবাদ করা যাইতে পারে, তবে বালি মাটি ভাল নহে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইবার পর জমি প্রস্তুত করিতে হয় এবং যতদিন না চারা রোপিত হয় ততদিন মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে হলচালনা করিতে হয়। শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এইরূপ চাষ দিলে ক্ষেতের ঘাস-পালা পচিয়া মাটি বেশ সারাল হইয়া উঠে। গোবর, খৈল প্রভৃতি সার দিয়া জমির পাট করিলে ভূমি আরও উর্ব্বরা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে যথানিয়মে হাপোরে বীজ পাত দিতে হয়। হাপোর সারাল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বীজ বুনিবার পূর্ব্ব দিবস হাপোরে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া পরদিন যো হইলে মাটি উস্কাইয়া বীজ ফেলিতে হইবে। দুই ভরি বীজের চারায় এক বিঘা

ভূমি রোপণ করা যায়। দুই ভরি বীজের জন্য দীর্ঘে ৩-হাত ও প্রস্থে ৪-হাত ভূমির আবশ্যক। বীজ বুনিবার পর হাপোরের উপরিভাগে ২।৩ খানি পুরু কদলীপত্র কিম্বা বিচালি চাপা দিতে হয়। কদলি-পত্র বা বিচালি বাতাসে না উড়িয়া যায় এজন্য তাহার উপরে একখানা দরমা বা ঝাঁপ বা তক্তা চাপা দিয়া রাখা উচিত। প্রায় ৪।৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু তাহা না হইলে ৪।৫ দিনের পর হইতে ২।১ দিন অন্তর আবরণ খুলিয়া দেখিতে হয় যে, কিরূপ অঙ্কুরিত হইল। যখন বুঝিবে যে, আবরণ উন্মোচিত করিবার সময় হইয়াছে তখন আর বিলম্ব না করিয়া আবরণ উন্মোচন করিয়া দিতে হয়। অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারায় ২।৪টী পত্র স্পষ্টরূপে দেখা গেলে, অতি সাবধানে জলসেচন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইলে জলসেচনের পরিবর্ত্তে পাতভূমিকে সূচাল কাষ্ঠ-শলাকা দ্বারা উস্কাইয়া দিতে হইবে। যতদিন না চারা ক্ষেতে রোপিত হয়, ততদিন পাতভূমিতে মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও নিস্তৃণী করিতে হয়।

আষাঢ় হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে চারা রোপণ করিতে হয়। এক্ষণে যে দিন বর্ষা পাওয়া যায় সেই দিন ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিতে হইবে। লঙ্কার জাতিবিশেষে গাছ ছোট কিম্বা বড় হয়। আষাঢ়-মাসে রোপণ করিতে হইলে ১৷৷০-হাত অন্তর শ্রেণীতে ১৷৷০-বা ১৸০-হাত অন্তর চারা রোপণ করা উচিত কিন্তু বিলম্বে রোপণ করিলে গাছ অধিক বাড়িবার সময় পায় না, সুতরাং অধিক স্থানের আবশ্যক হয় না। এরূপ অবস্থায় ১-হাত হইতে ১।০-হাত অন্তর গাছ রোপণ করা বিধেয়। চারা রোপণের একমাস পরে গাছের গোড়ায় একমুষ্টি অর্দ্ধবিগলিত খৈল-সার কিম্বা আধকাঁচ্চা পরিমাণ সোরা-চূর্ণ দিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় মাটির সহিত মিলিত করিয়া দিতে

পারিলে গাছ শীঘ্রই ঝাঁপাইয়া উঠে এবং ফসল অধিক হয়। বর্ষায় লঙ্কাক্ষেত্রে সচরাচার জলসেচন করিতে হয় না কিন্তু বৃষ্টির অভাবে মাটি নীরস ও কঠিন হইয়া গেলে, জলসেচন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাদ্র-মাস হইতে কার্ত্তিক-অগ্রাহায়ণ মাস পর্য্যন্ত লঙ্কাক্ষেত্রে ৩।৪ বার নিড়েন করিতে হয়। ক্ষেতে তৃণ ও জঙ্গল না জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

পৌষমাস হইতে কাঁচা লঙ্কা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। ফাল্গুন মাসে লঙ্কা পাকিয়া উঠে কিন্তু তখনও গাছে ফুল হইতে থাকে এজন্য শেষ অবধি অপেক্ষা না করিয়া ক্রমে ক্রমে লঙ্কা সংগ্রহ করিলে ফসল অধিক হইয়া থাকে। ফাল্গুন-মাস হইতে বৈশাখ-মাস পর্য্যন্ত তিন চারিবার ফসল সংগ্রহ করিতে পারা যায়। লঙ্কা সংগৃহীত হইলে ৮।১০ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া থলের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ফলন ভাল হইলে বিঘা প্রতি ৪০।৫০ টাকার লঙ্কা উৎপন্ন হয়।

আরোরুট

(Lat: Maranta Arundinacea. Eng: Arrowroot.)

আরোরুট,—মূলজাতীয় উদ্ভিদ। গাছের গোড়ায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে মূল জন্মিয়া থাকে। মূল কুট্টিত হইলে পালো উৎপন্ন হয়। উক্ত পালো আরোরুট নামে অভিহিত।

দোয়াঁশ কৃষ্ণাভ-বেলে ও হাল্কা মাটিবিশিষ্ট ডাঙ্গা জমিতে উহার আবাদ করিতে হয়। মাটি খুব আল্গা ও সারাল হওয়া প্রয়োজন।

নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতি বিঘা ভূমিতে ২০।২৫ গাড়ী গো-শালার বা

অশ্বশালার আবর্জ্জনা প্রসারিত করিয়া মাঘ মাসে বারম্বার গভীর চাষ দিয়া মাটি ধুলিবৎ করিয়া ফেলিতে হয়। একদিকে যেমন ধূলাবৎ করিতে হইবে অন্যদিকে ক্ষেত্রের গভীর কর্ষণ হওয়া আবশ্যক। আরোরুটের ক্ষেতে এক ফুট গভীর করিয়া চাষ দিতে পারিলে ভাল হয়।

মাটি তৈয়ার হইলে অবিলম্বে গেঁড় রোপণ করিতে হয়। বিলম্ব করিলে ফসল কম হয়। যে সময় ক্ষেত্রের কর্ষণাদি হইতে থাকে, সেই সময় রোপণীয় গেঁড়গুলিকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য ধামা বা চাঙ্গারি মধ্যে অল্পাধিক বিচালি প্রসারিত করতঃ তাহার উপর গেঁড়গুলিকে রাখিয়া সর্ব্বোপরি পুনরায় খড় চাপা দিতে হয়। তাদৃশ বৃহৎ ধামা বা চাঙ্গারীর অভাব থাকিলে ক্ষেত্রের কোনস্থানে দেড় ফুট বা দেড় বিঘৎ পরিমিত এবং প্রয়োজনানুরূপ দীর্ঘ ও প্রশস্ত জুলি বা খাদ খোদিত করিয়া তন্মধ্যে এক প্রস্থ বিচালি বা শুষ্ক তৃণ প্রসারণপূর্ব্বক মূলগুলি তাহাতে সমতলভাবে সাজাইয়া তদুপরে আর এক প্রস্থ স্থূল করিয়া খড় বিছাইয়া দিতে হয়। এ স্থলে মাটি চাপা দিলেও চলে। এইরূপে ৮।১০ দিন থাকিলে তাবৎ মূল হইতে কল্ উদ্গত হয়। এক্ষণে সেই সকল অঙ্কুরিত মূল খাদ হইতে তুলিয়া আনিয়া ক্ষেতের মধ্যে যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়। ইঁহাকে 'ভাব্না' দেওয়া কহে। ভাব্না অবস্থায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিলে খাদের উপরিভাগ উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হইবে নতুবা তন্মধ্যে জল প্রবিষ্ট হয় এবং মূল পচিয়া যায়।

মূল উপ্ত হইবার পর মধ্যে মধ্যে নিড়ানি করা ভিন্ন আপাততঃ আর কোন কাজ নাই। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া চারা উদ্গত হইলে, প্রথম নিড়ানি-কালে বিগলিত অস্থিচূর্ণ বা অপর কোন সার গাছের গোড়ায় দিয়া ক্ষেত নিড়াইয়া দিতে পারা যায়। অস্থি-চূর্ণে আরোরুটের ফসল অধিক

হয়। আরোরুটের গাছ বর্ষাকালেই বর্দ্ধিত হয়। এ সময়ে প্রায় প্রচুর বৃষ্টি পাওয়া যায় সুতরাং ইহার আবাদে জলসেচনের আবশ্যক হয় না কিন্তু যে বৎসর প্রয়োজনমত বর্ষা না হয়, সে বৎসর ক্ষেতে জলসেচন করা বিশেষ আবশ্যক।

আরোরুট ক্ষেত্রের মাটি সর্ব্বদা অল্পা থাকা উচিত নতুবা মূল বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ক্ষেত্রের মাটি বসিয়া গেলে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া যায়, গাছ বিবর্ণ হইতে থাকে এবং তখনই ইহার মূল উৎপাটিত করিবার সময়। ইহার পূর্ব্বে উৎপাটন করিলে মূলে অধিক রস থাকে এবং তাহাতে শাঁস কম থাকে। আবার অধিক বিলম্বে উত্তোলন করিলে মূলে ছিব্ড়া অধিক হয় ও পালোর ভাগ কমিয়া যায়। এইজন্য যথাসময়ে মূল উত্তোলন করিতে হইবে।

ক্ষেত্রস্থিত তাবৎ মূল একদিনে বা একবারে উত্তোলন করা পদ্ধতি নহে। যে পরিমাণ মূল কুট্টন করিতে পারা যাইবে, প্রতিদিন সেই পরিমাণ মূল উৎপাটন করা উচিত। একবারে অধিক মূল সংগ্রহ করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া কুট্টন করিতে গেলে মূলের রস শুষ্ক হইয়া যায়, ফলতঃ কুট্টনে বিলম্ব হয়। অনন্তর, স্তূপীকৃত অবস্থায় থাকিতে মূলের শাঁস বিকৃত হইয়া যায়। যাহা হউক, অতঃপর সংগৃহিত মূলগুলিকে জলে ধৌত করিয়া ঢেঁকিতে অথবা উখ্লিতে উত্তমরূপে কুট্টন করিতে হইবে। এক্ষণে কুট্টিত পিণ্ডকে জলপূর্ণ বৃহৎ গামলায় বারম্বার দলিত করিয়া হস্তদ্বারা ছিব্ড়া সমূহকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়। অনন্তর, গামলাস্থিত ঘোলা জলকে ৪।৫-মিনিটকাল অবিচলিতাবস্থায় রাখিয়া দিলে জলমধ্যস্থ ভাসমান শ্বেতসার বা পালো (starch) গামলার তলদেশে গিয়া স্থির

হয়। তখন ধীরতা সহকারে গামলার জল ফেলিয়া দিয়া শ্বেতসারকে দুই-তিন-বার উল্লিখিত প্রণালীতে ধৌত করিলে উত্তম শুভ্রবর্ণের আরোরুট হইয়া থাকে। এক্ষণে উক্ত শ্বেতসারকে কোন পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া ক্ষণকাল রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আরোরুট প্রস্তুত হইল।

উৎকৃষ্ট আরোরুট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত—

(১) অতি প্রত্যুষে মূল কুট্টন করিতে হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে অথবা বৃষ্টি হইতে থাকিলে কুট্টনকার্য্য বন্ধ রাখিতে হইবে, কারণ এ অবস্থায় কুট্টন করিলে রৌদ্রাভাবে কুট্টিত পালো শুষ্ক করিতে পারা যায় না। কুট্টিত পদার্থকে সদ্য শুষ্ক করিতে না পারিলে আরোরুট বিবর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাতে অম্লগন্ধ জন্মে। শীতকালের দিন ছোট, উপরন্তু রৌদ্রও প্রখর নহে, এজন্য প্রত্যুষে উঠিয়া কুট্টনাদি কার্য্য তৎপরতা সহকারে সমাধা করিতে হইবে।

(২) মূল উত্তমরূপে বিধৌত হওয়া এবং কুট্টন যন্ত্র, গামলা, জল, শুষ্ক করিবার পাত্র প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শুষ্ক করিবার পাত্র প্রশস্ত হইলে পালো শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া থাকে। শুকাইবার সময় প্রবল বাতাস বহিতে থাকিলে প্রসারিত পালোর উপর একখানি বস্ত্র ঢাকা দেওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে উহাতে ধূলা পড়িবার কিম্বা পালো উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

তৈয়ারি আরোরুট অনাবৃত থাকিলে ঠাণ্ডা বাতাসে আস্বাদ বিকৃত হয় ও ধূলায় মলিন হইয়া যায়। বোতল কিম্বা কাচের বা টীনের কিম্বা চীনে-মাটির আধার মধ্যে রাখিয়া দিলে আরোরুট অনেক দিন ভাল থাকে।

আরোরুট যে বিশেষ লাভের ফসল তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত

দুই একটী পরীক্ষার ফল সন্নিবেশিত করিলাম। অষ্ট্রেলিয়ার কোন সাহেব বিগত ১৮৯৭।৯৮ খৃষ্টাব্দে তথায় যে আরোরুটের আবাদ করেন তাহাতে একার প্রতি ৩৩-টন মূল এবং প্রতি টন মূল হইতে ২-হন্দর ১৬ পাউণ্ড পালো উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা হিসাবে মোটামুটী বিঘা প্রতি ৩৩ মণ পালো উৎপন্ন হইয়াছিল। একবিঘা ক্ষেত্র হইতে তেত্রিশ মণ পালো উৎপন্ন করা কৃষকের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে। *

প্রতি বৎসর এক আধ বিঘা জমিতে আমি আরোরুটের আবাদ করিতাম। বিগত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের আবাদে বিঘাপ্রতি কিঞ্চিদধিক ৫৩/০ মণ মূল পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা হইতে পাঁচ মণ পালো উৎপন্ন হইয়াছিল।

আরোরুট হইতে যে পালো উৎপন্ন হয়, তাহা সাগু ও ট্যাপিওকা অপেক্ষা উপকারী সামগ্রী। রোগী ও শিশুদিগের পক্ষে আরোরুট অতি লঘু খাদ্য ও পথ্য। বাজারে সচরাচর প্রতি সেরের মূল্য বার আনা।

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে আরোরুট ব্যবহৃত হয় তাহা সকলেই বিদিত আছেন। শিশুদিগের তড়কা ও উদরাময় রোগ হইলে স্বতন্ত্র প্রণালীতে আরোরুট পথ্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে। উক্ত প্রণালী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

"অতিশয় ক্ষীণ লোকের জন্য, বিশেষতঃ দুর্ব্বল শিশুদের নিমিত্ত আরোরুটে হরিণ শৃঙ্গের চাঁচনী মিশ্রিত করিলে সমধিক পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হয়। প্রকৃত হরিণশৃঙ্গের চূর্ণক এক কাঁচ্চা পরিমাণে এক পাইণ্ট বোতল জলে ১৫ মিনিটকাল সিদ্ধকরতঃ ছাঁকিয়া এক বাটী

* New South Wales Agricultural Gazette, 1901

জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত দুই চাম্‌চে আরোরুট সংযুক্ত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে হয়। শিশুর উদরে যদি বায়ু জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ৩।৪ অথবা ৫।৬ ফোঁটা মৌরীর আরক অথবা জায়ফলচূর্ণ সংযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তদিগের পক্ষে পোর্ট সরাব বা ব্রাণ্ডিই উত্তম। উক্ত পথ্যদ্বারা এমন অনেকানেক শিশুর পোষণ করা গিয়াছে, যাহারা কেবল স্তন্যদুগ্ধ পান করিলে অথবা কেবল মাংসের যুস বা ঝোল ভক্ষণ করিলে কখন বাঁচিত না। একজন ভদ্রকুলোদ্ভবা নারীর পাঁচ সন্তান তড়কা অথবা উদরাময়বশতঃ নষ্ট হইবার পর অপর দুই শিশুকে উক্তরূপ পথ্য প্রদান করাতে তাহারা সুস্থ শরীরে জীবিত আছে"।

যে ক্ষেত্রে একবার আরোরুটের আবাদ হয়, তাহাতে পুনঃ পুনঃ আপনা হইতেই আরোরুটের গাছ জন্মিয়া ক্ষেত্র ভরিয়া যায়। মূল সংগ্রহকালে সকল মূলকে একবারে ক্ষেত উজাড় করিয়া উঠাইতে পারা যায় না, সুতরাং যে মূলগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে স্বতঃই গাছ উৎপন্ন হয়। এইজন্য মূল সংগৃহীত হইলে অনর্থক বিলম্ব না করিয়া ক্ষেত্রে সার বিস্তৃত করণান্তর চাষ দিয়া রাখিলে আর বীজ বুনিতে হয় না কিম্বা অল্প বীজ বুনিলেই চলে।

মাঠ-কড়াই বা চীনের বাদম

(Lat: Arachis hypogœa. Eng: Groundnut)

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে ইহার আবাদ হইতেছে, কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে, আমেরিকা মহাদেশ হইতে ইহা ভারতে আনীত

হইয়াছে। এক্ষণে এদেশে ইহার প্রচুর আবাদ হইয়া থাকে এবং সহস্র সহস্র মণ প্রতিবৎসর ইয়ুরোপে রপ্তানি হয়। চীনে-বাদাম মানুষের অতি মুখপ্রিয়, গবাদি গৃহপালিত পশুগণ ইহার খৈল আহার করিলে বলিষ্ঠ হয় এবং গাভী দুগ্ধবতী হয়। কৃষকের ক্ষেতের পক্ষে ইহার খৈল অমূল্য সার। এতদ্ব্যতীত, ইহা হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহা অলিব তৈল (Olive Oil) সদৃশ সুতরাং অনেক সময়ে অলিব তৈলের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বালানী কার্য্যে এবং সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত তৈল যথেষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহার আবাদ অতি সহজ এবং একবার আবাদ করিলে প্রায় আর বীজ বুনিবার আবশ্যক হয় না। ফসল উঠাইয়া লইলে যে, সমুদায় সুঁটী বা বাদাম ক্ষেতে থাকিয়া যায়, তাহা হইতেই পুনরায় গাছ জন্মিয়া ক্ষেত ভরিয়া যায়।

ইহাতে প্রাণীদিগের মল মূত্র না দিয়া পুষ্করিণীর মাটি দিতে পারিলে ভাল হয়। নদী, খাল, বিল প্রভৃতি হইতে পলি উঠাইয়া দিতে পারিলে উপকার দর্শে। বিঘাপ্রতি ১০।১৫ গাড়ী পলি বা পুষ্করিণীর মাটি দেওয়া আবশ্যক। এক বৎসর উক্ত সার প্রয়োগ করিলে আর ২।১ বৎসর কোন সার দিবার আবশ্যক হয় না।

সাধারণ দো-আঁশ ও দো-রসা মাটি চীনা-বাদামের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাগান জমি ইহার পক্ষে প্রশস্ত।

মাঘ-ফাগুন মাসে বীজ বুনিবার উত্তম সময়। সুতরাং মাঘমাসের মধ্যে জমি উত্তমরূপে তৈয়ার করিতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেও রোপণ করা চলে কিন্তু তাহাতে ফসল কম হয়।

মাট-বাদামের সুঁটী বা ফলের মধ্যে একটি হইতে চারটী পর্য্যন্ত বীজ বা দানা থাকে। সুঁটী ভাঙ্গিয়া একটী একটী পৃথক করিয়া বপন

করা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সুঁটী বপন করায় যদিও কিছু অধিক বীজ লাগে, তথাপি ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। পূর্ণ সুঁটী হইতে একাধিক গাছ জন্মে, গাছ ঝাড়াল ও তেজাল হয়, সুতরাং সে গাছের সুঁটী বড় হয়, ফলন অধিক হয়। পূর্ণ বা সমগ্র সুঁটী বপন করিলে তন্মধ্যে যে কয়টী দানা থাকে সবই অঙ্কুরিত হয় ও অল্পদিবসমধ্যেই গাছগুলি ঝাড়াল হইয়া উঠে। তাহা ব্যতীত, সুঁটী হইতে দানা স্বতন্ত্র করিয়া বপন করিলে পোকায় খাইয়া ফেলিতে পারে কিন্তু সুঁটি থাকিলে তত সহজে কিছু করিতে পারে না, ইতিমধ্যে বীজও অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। প্রতি বিঘায় পাঁচ সের হইতে আট সের বীজ (সুঁটী) লাগে। সারাল ও সরস মাটিতে বীজ অপেক্ষাকৃত কম লাগে।

ক্ষেতের মধ্যে ১৷৷০-হাত অন্তর সরল রেখা টানিয়া প্রতি রেখার মধ্যে ১৷৷০-বা ২-হাত ব্যবধানে ৩।৪-অঙ্গুলি মাটির ভিতরে এক-একটী সুঁটী পুতিয়া দিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০।১২-দিন সময় লাগে। বীজ পুতিবার পর ক্ষেতে এক পালা মই বা চৌকি দিয়া বীজে মাটি চাপা দিতে হইবে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইলে মাটিতে 'যো' পাইবামাত্র ক্ষেতে একবার মই বা চৌকি দেওয়া আবশ্যক। অন্য মতে —ক্ষেত তৈয়ার হইলে কৃষাণ যেমন ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিবে, অপর এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে থাকিয়া কর্ষিত ক্ষেতের জুলির মধ্যে দেড়-হাত-অন্তর একএকটী সুঁটী ফেলিয়া যাইতে থাকিবে। ক্ষেতময় বীজ বপন করা শেষ হইলে তাহাতে একবার উত্তমরূপে চৌকি দিতে হইবে। এ প্রণালীতে মজুরি কম পড়ে এবং পূর্ব্ব প্রণালী অপেক্ষা অর্দ্ধেক কম বীজে কার্য্য সম্পন্ন হয়।

অতঃপর, নিড়ানী ভিন্ন আপাততঃ কোন কাজ নাই। নিড়েন করিতে বিঘাপ্রতি পাঁচটা মুনিষের মজুরি পড়ে। গাছের শাখা-

প্রশাখা যত বাড়িতে থাকে, তত তাহাদের পত্রগ্রন্থি বা গাঁটে স্থূল সুঁচাকার শিকড় উদ্গত হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি শিকড় নহে, স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয়। যাহা হউক, এক্ষণে শাখাগুলির শেষাগ্রভাগের কয়েকটীমাত্র পাতা উপরে রাখিয়া সমুদায় অংশ আল্‌গা মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। শাখাগুলি এইরূপে যত চাপা দেওয়া যাইবে, ততই তাহা বাড়িতে থাকিবে এবং যত বাড়িবে তত চাপা দিতে হইবে। চাপা দিতে অবহেলা করিলে গর্ভাধার সকল শুষ্ক হইয়া যায়। যতগুলি শিকড় নষ্ট হইবে, ততগুলি ফল নষ্ট হইল জানিতে হইবে, কারণ সেই শিকড়েই বাদাম ফলে অর্থাৎ সেই সকল শিকড়ই ক্রমে স্ফীত হইয়া বাদামে পরিণত হয়। শাখায় মাটি চাপা দিবার কার্য্য মাসান্তর একবার এবং মোটের উপর তিনবার করিলেই চলিবে। কার্য্য সহজ কিন্তু সূক্ষ্ম, এজন্য সাবধানতার সহিত করা উচিত। খরচ লাঘব করিবার জন্য মাটি-দেওয়া-কাজ পুরুষ-মজুর অপেক্ষা বালক বালিকা বা স্ত্রীলোকের দ্বারা সহজে হইতে পারে। ইহাদিগের মজুরী কম অথচ এই সকল সূক্ষ্মকার্য্য বয়স্থ মজুর অপেক্ষা ইহাদিগের দ্বারা অনায়াসে ও ভালরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফুল হয়। ফুলগুলি হরিদ্রাবর্ণের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাতে ফল হয় না, কারণ ইহারা পুংপুষ্প। পত্রগ্রন্থির নিম্নভাগ হইতে যে স্থূল ও কোমল শিকড়ের ন্যায় অঙ্গ উদ্গত হয়, তাহাই স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয় (ovary) তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুং-পুষ্পের রেণু তাহাতে সংযুক্ত হইলে স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাধান হয় এবং তখন হইতে উক্ত গর্ভাশয় ক্রমে স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। কার্ত্তিক মাস হইতে যতই শিশির পড়ে ও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই গাছগুলি বিবর্ণ হইতে থাকে এবং শাখা-

প্রশাখার বৃদ্ধি হ্রাস পায়, কিন্তু গাছগুলিকে একবারে শুষ্ক হইতে দেখা যায় না। এক্ষণে আর শাখায় মাটি দিবার আবশ্যক হয় না।

ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের সময়। ইহার ফসল এক একটী করিয়া সংগ্রহ করা সুকঠিন, সুতরাং কোদাল দ্বারা সমুদায় ক্ষেত কোপাইয়া তাহা হইতে সুঁটীগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। এইরূপ একবার বাছাই করিবার পর ৪।৫ দফা লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্রকে কর্ষণকরতঃ পুনঃ পুনঃ বাছাই করিলে সহজেই সুঁটী সংগৃহীত হয়। মাটি হইতে সুঁটী বাছাই করিবার জন্য বালক-বালিকা বা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা ভাল। এক একটী গাছে ২০০।২৫০ ফল জন্মিয়া থাকে এবং বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ ফলন হয়। ক্ষেত হইতে উঠাইবার পরেই সুঁটীগুলিকে রৌদ্রে ৩।৮ দিন শুকাইতে হয়। বাদাম উঠাইয়া গাছগুলি ফেলিয়া না দিলে গরু বাছুরকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। পশুগণ চীনে-বাদাম বা তাহার গাছ আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকে।

জমি হইতে সকল ফল বাছিয়া উঠাইতে পারা যায় না, অনেক বাদাম তাহাতে থাকিয়া যায়, এবং একমাস অতীত না হইতেই ক্ষেত্র ব্যাপিয়া নূতন গাছ জন্মে। বাদাম সংগ্রহার্থে উপর্য্যুপরি কয়েকবার হলচালনা করিলে পুনরায় আবাদ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে আর ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার প্রয়োজন হয় না—কেবলমাত্র চৌকী বা মদিকা-দ্বারা ভূমি চৌরস ও মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিলেই হইল কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব করা কোনমতে উচিত নহে। অতঃপর, একমাস মধ্যে ক্ষেতময় নূতন চারা উদ্গত হয়, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্ব আবাদের সকল সুঁটী একেবারে উঠাইতে পারা যায় না। এক্ষণে চারা জন্মিবার পর যে সকল স্থানে গাছ জন্মে নাই, কিম্বা পাত্‌লাভাবে জন্মিয়াছে সেই সেই স্থানে নূতন বীজ পুতিয়া দিলেই চলিতে পারে।

মাঠ-কড়াইগাছ লতিকাস্বভাব,—ভূপৃষ্ঠেই প্রসারিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে কার্পাস আবাদ করায় লাভ আছে। ঈদৃশ ক্ষেত্রে কার্পাস আবাদ করিতে হইলে এক-ফসলে কার্পাস সি-আইলণ্ড (Sea Island), জর্জ্জিয়া (Georgia), নিউ অলিন্স (New Orleans) প্রভৃতি মার্কিণ জাতীয় কার্পাসের আবাদ করা উচিত।

মাঠ-কড়ায়ের ক্ষেতে কার্পাস-বৃক্ষ অথবা কার্পাস ক্ষেতে মাঠ-কড়াইয়ের বীজ বুনিলে এক আবাদে দুই ফসল পাওয়া যায়। ইহাতে কোন ফসলের অনিষ্ট হয় না, বরং বাদামের গাছ তথায় সংলগ্ন থাকায় কার্পাস বৃক্ষের উপকার হইয়া থাকে, কারণ মাঠ-বাদামের গাছ বায়ু হইতে বহু পরিমাণে সোরাজান (nitrogen) আহরণ করিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সাধন করে। তাহা ব্যতীত, এক ফসলের পরিচর্য্যায় দুই ফসলের পাট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিঘাপ্রতি গড়ে ৬।৭ মণ মাঠ-কড়াই ফলিয়া থাকে এবং প্রতি মণ ন্যূন কল্পে ৫৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় করিলে ১০৲ টাকা খরচ বাদ দিয়া ৭ মণে ২৫৲ টাকা লাভ থাকে। উত্তম আবাদের ১৫/০ মণ পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতি বুভুক্ষু ফসল দ্বারা ক্ষেত্র নিঃস্ব হইয়া পড়ে সুতরাং সেই সকল ফসলের পর মাঠ-কড়াইয়ের আবাদ করিলে ক্ষেত পুনরায় উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

পাট

(Lat: Corchorus Sp. Eng: Jute)

পাটের কাট্‌তি ও মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা আমাদের একটী বিশেষ ফসল হইয়া উঠিয়াছে। পাটের চাষে অন্যান্য ফসল অপেক্ষা বিশেষ লাভ থাকে, এইজন্য অনেক কৃষক—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কৃষক—ধান্যাদির আবাদ বন্ধ করিয়া কেবল পাটেরই আবাদ করিতেছে। দিন দিন বিলাতে যতই পাটের চাহিদা (demand) হইতেছে, ততই পাট মহার্ঘ হইতেছে, ফলতঃ পাটের চাষও বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাট হইতে নানাবিধ বাণিজ্য পণ্য প্রস্তুত হয়। পরিধেয় বস্ত্র, গাত্রাবরণের কম্বল, র‍্যাপার ও নানাবিধ কার্য্যের জন্য রজ্জু, ব্যবসায়ী-দিগের মাল চালানীর জন্য চট বা থলে (gunny bag) প্রতি বৎসর রাশি রাশি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাটের কাট্‌তি বৃদ্ধি হওয়ায় ইদানিং আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া দেশেও পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। চীন ও ব্রহ্মদেশেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার বিশেষত্ব হেতু ভারতের মধ্যে বাঙ্গালাদেশেই পাট-আবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। ময়মনসিং, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদে বহুল পরিমাণে পাটের আবাদ হইয়া থাকে। এতদ্বতীত ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায়ও যথেষ্ট পরিমাণে পাটের আবাদ দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্বেও একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি বাণিজ্যের পণ্য (commercial crop) হিসাবে পাটের চাষ সুফলপ্রদ হয় নাই।

আবাদ প্রণালী।—ঈষৎ নাবাল জমিতেই পাট জন্মিয়া থাকে বৈশাখের প্রথম ১৫-দিন মধ্যে জমি উত্তমরূপে চষিবে। জমি

কঠিন হইয়া থাকিলে জমিতে বারম্বার উত্তমরূপে লাঙ্গল দিতে হইবে। বহুদিনের পতিত সারাল জমিতে পাট অতি সুন্দর জন্মে। একবার আমরা পতিত জমিতে পাটের আবাদ করিয়াছিলাম। উক্ত ভূমিখণ্ডে ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন আবাদ না হওয়ায় উহা এতই জঙ্গলময় হইয়াছিল যে, তন্মধ্যে কাহারও প্রবেশ কবিবার সাধ্য ছিল না। সে বৎসর উক্ত জমিতে যথেষ্ট ও উত্তম পাট উৎপন্ন হইয়াছিল।

জমি সরস ও নিম্নতল হইলে বৈশাখের শেষভাগে বীজ রোপণ করা যাইতে পারে, নতুবা জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ পর্য্যন্তও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা উচিত। তাড়াতাড়ি করিয়া বীজ বপনের পর বৃষ্টির অভাব হইলে পাটের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এজন্য ঋতুর অবস্থা বুঝিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি দেড় সের বীজ লাগে। বীজগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য উহার সহিত ৪।৫ গুণ মাটি মিশাইয়া বপন করিলে ক্ষেতময় সমভাবে বীজ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পাত্‌লা ভাবে বীজ বপিত হইলে গাছগুলি শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, প্রবল বাতাসে এবং বৃষ্টির দাপটে হেলিয়া পড়ে; সুতরাং পাটের পক্ষে তাহা নিতান্ত ক্ষতিজনক। এজন্য পাটের বীজ বপন করিয়া রোপণ করিতে হইবে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৪।৫ দিবস সময় লাগে। চারা উদ্গত হইলে যদি দেখা যায় যে, কোন কোন স্থান অতিশয় ঘন হইয়াছে তাহা হইলে তাহার ভিতর হইতে বিবেচনামত অল্লাধিক চারা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। গাছসমূহের মধ্যে পরস্পর ৮-অঙ্গুলি ব্যবধান থাকিলেই যথেষ্ট হয়। গাছগুলি ৪-অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে ক্ষেতে প্রথমবার নিড়ানি করা আবশ্যক। অতঃপর ৪।৫-সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার নিড়ানী করা উচিত। গাছগুলি ঈষৎ বড় হইয়া উঠিলে আর নিড়েন করিবার প্রয়োজন হয় না।

পাটগাছ ওষধি বর্গ-(annuals) মধ্যে পরিগণিত। উক্ত বর্গের উদ্ভিদগণ ফুল-ফল প্রদান করিয়া মরিয়া যায়। গাছে পুষ্পোদ্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার বৃদ্ধি প্রায় শেষ হইয়াছে। এ অবস্থাতেও ত্বকের তন্তু সকল তাদৃশ দৃঢ় হয় না। সুতরাং তদবস্থায় কর্ত্তন করিলে দণ্ডসমূহের মধ্যাংশ হইতে শেষাগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে তন্তু থাকে, তাহা তাদৃশ দৃঢ়তার অভাবে জলে নিমর্জ্জিতাবস্থায় পচিয়া যায়। পুষ্পিতাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যখন ফলের সমাগম হয়, গাছ কর্ত্তন করিবার তাহাই প্রশস্ত কাল। ইহাপেক্ষা অধিক বিলম্বে, কর্ত্তন করিলে তন্তু স্থূল, ভঙ্গুর ও কঠিন হইয়া যায়, ফলতঃ তাহার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়, বর্ণের ঔজ্জল্যও হ্রাস পায়। ভাদ্র-মাস হইতে গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সেই ফুল, ফলে পরিণত হয়, তখনই পাট কর্ত্তন করিবার উপযুক্ত সময় গাছে যখন ফুল আসে তখন তাহার তন্তু এতই কোমল থাকে যে, কয়েক দিবস জলমধ্যে থাকিলে পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ফলগুলি পাকিবার পূর্ব্বে এবং পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রাক্কালে গাছ কাটিতে হইবে। ইহাতে পাটের কোমলতা ও দৃঢ়তা উভয়ই রক্ষা পাইবে এবং পাটেরও মূল্য বেশী হইবে। সুতীক্ষ্ণ কাস্তের সাহায্যে গাছের গোড়াটী কাটা ভিন্ন পাট কাটিবার বিশেষ কোন নিয়ম বা যন্ত্র নাই।

গাছ কাটা হইয়া গেলে, ক্ষেতেই উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে স্তূপাকারে সজ্জিত করতঃ তিন চারি দিনের জন্য তৃণাদি আগাছা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়, কারণ তাহাতে গাছের রস কথঞ্চিৎ শুকাইয়া যায় এবং পাতাগুলি স্বতঃই ঝরিয়া যায়। কিন্তু সাবধান, অতিরিক্ত শুষ্ক হইলে তাহা হইতে আর তন্তু বাহির হইবে না। আগে নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, গাছগুলি ঝাড়িয়া বড় বড় আঁটী-বদ্ধ করিতে হয়। গাছ

ঝাড়িবার সময় তাহার অপ্রয়োজনীয় অংশ অর্থাৎ উপরিভাগের অপরিপুষ্ট ও কোমল অংশ বাদ দিয়া আঁটী-বন্ধ করিলে বহনের অনেক অনর্থক ভার লাঘব হইবে এবং কাচিবারও সুবিধা হইবে। আঁটী বাঁধা হইলে তাহাদিগকে সন্নিকটস্থ কোন জলাশয়ে লইয়া গিয়া তন্মধ্যে ডুবাইয়া তদুপরি মাটির বড় বড় চাপ দ্বারা ভার দিতে হয়। যে পুষ্করিণীতে পাট পচান্ দেওয়া যায় তাহার জল দুর্গন্ধযুক্ত ও অস্পৃশ্য হইয়া যায়, সুতরাং যে পুষ্করিণীর জল মানুষে ব্যবহার করে, কিম্বা গবাদি পশুগণ পান করে, তথায় পাট ভিজিতে দেওয়া উচিত নহে। পতিত ডোবা বা পুষ্করিণী পাট ভিজাইবার পক্ষে উত্তম স্থান। জলে গাছ ভিজাইবার সময় ১০।২০টী আঁটী একত্রে ভেলার মত বাঁধিয়া ভেলাটী একটী বাঁধের সঙ্গে বা অন্য কোন খুঁটীতে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, নতুবা উহা বাতাসে অধিক জলে চলিয়া যাইতে পারে। আঁটী গুলিতে অনেক গাছ থাকিলে অথবা দৃঢ় করিয়া আঁটী বাঁধা থাকিলে ভিতরের গাছ পচিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু উপরের গুলি কাচিবার উপযুক্ত হয়। এ অবস্থায় কাচিতে গেলে মধ্যভাগস্থ দণ্ডগুলির ছাল, কাষ্ঠ হইতে সহজে পৃথক হয় না অথচ অধিক দিবস রাখিতে গেলে বহির্ভাগস্থ গাছের ছাল একেবারে পচিয়া গলিয়া যায়। এইজন্য প্রত্যেক আঁটীতে এতগুলি গাছ থাকা উচিত যে, ৭।৮ দিবসের মধ্যে সকল গাছগুলিই কাচিবার উপযোগী হয়। ভেলার উপরে মাটি চাপা না দিলে উহা ভাসিয়া উঠে তন্নিবন্ধন উপরিভাগস্থ দণ্ড সকল শুষ্ক হইয়া যায় ফলতঃ তাহা হইতে পাট বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে।

জাগ্ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আঁটী বাঁধিয়া জাগ দিবার ৬।৭ দিবস পরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, কাষ্ঠ হইতে ছাল সহজে পৃথক হইয়া আসে কি না। যদি না আসে তাহা

হইলে কাচিবার উপযুক্ত হয় নাই জানিয়া পুনরায় তদবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে এবং ২।৩-দিন অন্তর পরীক্ষা করিতে হইবে। গাছের ছাল আলুগা হইলে আঁটিগুলিকে জলাশয়ের কিনারায় আনিয়া তদুপরিস্থ মাটি ফেলিয়া দিয়া এক-একটী আঁটী কাচিতে হইবে। আঁটী বাহির করিয়া সম্ভবমত কতকগুলি কাঠি হাতে লইয়া (গোড়া হইতে দেড় বা দুই হস্ত উর্দ্ধে) বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিতে হইবে। পরে কাঠিগুলির উপরিভাগ ধরিয়া জলে বারম্বার হেলাইলে নিম্ন ভাগের ভগ্ন কাঠিগুলি স্বতঃই ভাসিয়া যাইবে। তখন নিম্নদেশের ছাল ধরিয়া জলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা টানিলেই উর্দ্ধদিকস্থ কাঠির অবশিষ্ট ভাগ পৃথক হইয়া যাইবে এবং হস্তে কেবল ছালগুলি থাকিয়া যাইবে। এক্ষণে ছালগুলি জলে বারম্বার আছ্‌ড়াইলেই সূত্র বা আঁশ বাহির হইয়া আসিবে এবং অপরিষ্কার অংশ ভাসিয়া যাইবে। এই আঁশ বা তন্তুকেই পাট কহে। পাট উত্তমরূপে কাচা হইলে নিঙ্‌ড়াইয়া শুকাইবার স্থানে আনিতে হইবে। পুষ্করিণীর জল যদি পঙ্কিল হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত পাট দ্বিতীয়বার সন্নিকটস্থ কোন পরিষ্কার জলাশয়ে কাচিয়া লইলে পাটের বর্ণ উজ্জ্বল ও সাদা হয়। ময়লা জলে কাচিলে পাটের রং ময়লা হয় সুতরাং মূল্য কম হয়।

শুষ্ক করিবার জন্য ক্ষেত্রের মধ্যে সুদীর্ঘ বাঁশের ভারা বাঁধিয়া তাহাতে পাতলা ভাবে পাট এলাইয়া দিতে হইবে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এবং সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর থাকিলে একদিনেই পাট শুকাইয়া যায়, নতুবা দুই-তিন দিবস সময় লাগে। যত শীঘ্র পারা যায় পাট শুকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ শুকাইতে বিলম্ব হইলে পাট পচিয়া যায় কিম্বা দাগী হইয়া যায়। পাট শুকাইয়া গেলে, গাঁট বাঁধিতে হইবে। প্রতি গাঁটে দেড় মণ পাট থাকে। এক গাঁটে

ইহাপেক্ষা অধিক পাট দিলে বহনকালে অসুবিধা হয়। বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ হইতে নয় মণ পর্য্যন্ত পাটের ফলন হয়।

পাট কাচিবার সময় যদি উপর্য্যুপরি কয়েক দিন বৃষ্টি হয় তাহা হইলে কাচা পাট কোন আবৃত বায়ুসঞ্চালিত স্থানে উক্ত প্রণালীতে খুব পাতলা ভাবে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। পাট কাচিবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনার কার্য্য আছে। একদিনে যে পরিমাণ পাট কাচিয়া উঠিতে পারা যাইবে, সেই পরিমাণ গাছ একই দিনে কাটিতে ও এক দিনে ভিজাইতে হইবে। সকল গাছ এক দিনে কাটিলে ও জলে দিলে ঐ পাট যথাসময়ে কাচিয়া উঠিতে পারা যায় না ফলতঃ অনেক পাট নষ্ট হয়। বীজ বপন হইতে পাট কাচাই পর্য্যন্ত পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। এইজন্য বিস্তৃত ভাবে আবাদ করিতে হইলে একদিনে সমুদায় বীজ বপন না করিয়া ২।৪ দিন ব্যবধানে বপন করাই উচিত। তবে যাঁহাদের আবাদ অল্প তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র তথাপি এ নিয়মটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

বীজ রক্ষণ।—ক্ষেতের একভাগে কতকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বড় গাছ বীজের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে হয়। বীজ পরিপক্ক ও শুষ্ক হইলে ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা পর বৎসর আবাদ করা চলিতে পারে। জমি হইতে পাট উঠিয়া গেলে, তাহাতে ইক্ষু, আলু, সরিষা, গম, মসিনা বুট, মটর, কলাই, তামাক প্রভৃতি বুনিতে পারা যায়।

ভাদ্রমাসের প্রথমভাগে পাট উঠিয়া গেলে সে ক্ষেতে আমন ধান্যও রোপণ করিতে পারা যায়। অপরাপর তন্তুদ-উদ্ভিদ মধ্যে সূর্য্যমুখী (Sunflower) বনঢেঁড়স (Malachra capitata) কস্তুরা (Hibiscus Abelmoschus) ঢেঁড়স, (Hibiscus esculentus) ইত্যাদি প্রধান। ঢেঁড়স, বেড়েলা, বনঢেঁড়স, কস্তুরা প্রভৃতি উদ্ভিদের

পাট আমরা কয়েকবার তৈয়ার করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। এই কয়েক জাতীয় গাছের পাট অতিশয় দৃঢ় ও চিক্কণ। এ সকল পাটও কালক্রমে বাজারে আমদানী হইতে পারে।

প্রতিবৎসর একজমিতে পাটের আবাদ না করাই উচিত কারণ পুনঃ পুনঃ এক জমিতে পাটের আবাদ করিলে মাটি ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তন্নিবন্ধন ফলন হ্রাস হয়। একই ফসলের পুনঃ পুনঃ আবাদ করিলে পরবর্ত্তী ফসলেব গুণবত্তা হ্রাস হইতে থাকে, ইহা বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত। যে সকল ক্ষেত্রের উপর প্রতিবৎসর পলি সঞ্চিত হয়, তথায় প্রতিবৎসর পাটের আবাদ করিতে পারা যায় এবং সেই প্রকার জমিতে উত্তম পাট জন্মে। সর্ব্বত্র সে স্থবিধা ঘটে না, এজন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। অপরাপর জমিতে সার প্রদান করা প্রয়োজন। উপর্য্যুপরি একই ক্ষেত্রে পাটের আবাদ হওয়ায় এবং তাহাতে যথেষ্ট সার না দেওয়ায় অনেক জমি খারাপ হইয়াছে স্থতরাং ফলন হ্রাস পাইয়াছে।

পাটের শত্রু।—এক জাতীয় কীট পাট-গাছের বিষম শত্রু। ইহারা ক্ষেতে একবার আশ্রয় লইলে ইহাদিগকে বিনাশ করা বড় কঠিন কার্য্য। ইহারা পাট গাছের ডগা ও পুষ্প ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। উক্ত কীট জেলা বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত যথা,—বাগ্দী-পোকা, ছোট-পোকা, তিরিং, দকরা, ঘোড়া-পোকা ইত্যাদি। ডগা খাইয়া ফেলিলে গাছ শুকাইয়া যায় কিম্বা কাণ্ডের নিম্নাংশ হইতে শাখাপ্রশাখা নির্গত হয় ফলতঃ সে গাছ কোন কাজে আসে না। দিবাভাগে একজাতীয় পতঙ্গ গাছের পাতার নিম্নতলে ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। অতঃপর, সেই ডিম্ব ২।৩-দিন মধ্যে ফুটিয়া কিড়া বা পোকা জন্মে। ইহারাই পাতা ভক্ষণ করে। পাট কর্ত্তিত হইলে সেই সকল

পোকা ও বহু ডিম্ব মাটির মধ্যে থাকিয়া যায়, পুনরায় পর বৎসর পাটের আবাদ কালে আবির্ভূত হয়। ইহাদিগের বর্ণ 'সবুজ, স্নুতরাং সহজে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, পাতার বর্ণের সহিত মিশিয়া থাকে। ইহারা ১৫-দিবসে পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রায় দেড় ইঞ্চ দীর্ঘ হয়। কীটাক্রান্ত গাছগুলিকে সমূলে ও সাবধানে উৎপাটিত করাই স্নুব্যবস্থা কিন্তু কীট বিস্তার লাভ করিয়া থাকিলে, অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা ক্রমে বলিতেছি। ক্ষেত্রের এক দিক হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ একখণ্ড রজ্জু উত্তমরূপে কেরোসিনে সিক্ত করিয়া সেই রজ্জুর দুই পার্শ্ব দুইজনে ধরিয়া পাট গাছের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হয়। উপর্য্যুপরি ২।৩ বার এরূপ করিলে অনেক পোকা মরিয়া যাইবে, অনেক ডিম্ব দাড়িতে সংলগ্ন হইয়া যাইবে, এবং পতঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত পোকাগণ উড়িয়া পলাইবে। পত্রে কেরোসিন গন্ধ থাকিয়া যাইবে স্নুতরাং আর পোকার উপদ্রব না হইতে পারে।

ক্ষেতে পোকার সমাবেশ দেখিলে ফসস উঠিয়া গেলে উত্তমরূপে ভূমিকে কর্ষণ করিলে কাক ও নানাবিধ পক্ষীতে কীটপতঙ্গদিগকে খাইয়া ফেলে।

তিসি বা মসিনা

(Lat: Linum utilissimum. Eng: Flax.)

তিসি,—রবি ফসল। অন্যান্য রবি ফসলের ন্যায় আশ্বিনের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিক-মাসমধ্যে ইহার বীজ বুনিতে হয়। সচরাচর ইহার মিশ্রিত বা মিশেন আবাদ হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ তিসিরই স্বতন্ত্র আবাদ করিয়া থাকেন। মিশেন আবাদে তিসির অবিচ্ছেদ্য

সঙ্গী,—বুট। এতদ্ব্যতীত সর্ষপ' গোধূম, রাই, যব,—এই কয়টীর মধ্যে যে কোনটী তিসির সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে কিন্তু মৃত্তিকাভেদে অবিমৃষ্যভাবে সঙ্গী নির্ব্বাচন করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তিসি যে প্রকার মাটিতে ভাল জন্মে সেই প্রকার মাটিতে সেই সময়ে অপর যে ফসল ভালরূপে জন্মিতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া সঙ্গী নির্ব্বাচন করা উচিত। তিসি ও বুট এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে, গোধূম ও যব সেই প্রকার মাটির উপযোগী, এইজন্য তিসি ও বুটের সহিত গোধূম বা যব মিশ্রিত হয়।

ভাদুই ফসলের ক্ষেতে প্রায় রবি ফসলের আবাদ হয়। আমন ধান্য যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে অগ্রহায়ণ মাসেও তাহাতে তিসির আবাদ করা চলিতে পারে কিন্তু সমধিক বিলম্ব হইয়া পড়ে এবং সে সময় মাটির রসও অনেক শুকাইয়া যায় বলিয়া গাছ তত বাড়িতে পারে না। বিল-বাদার পার্শ্বদেশ শুকাইলে তাহাতে উত্তম আবাদ হয়। সচরাচর কার্ত্তিক মাসের ১৫-দিনের মধ্যে কার্য্য শেষ করা কিম্বা শেষ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

সচরাচর বিঘাপ্রতি/৫ সের বীজ লাগে। উর্ব্বরা ক্ষেতে ইহাপেক্ষা অল্প বীজ বুনিলে চলে। তিসির বীজ ছিটাইয়া (Broadcast) বুনিতে হয়। মিশেন-আবাদে এক তৃতীয়াংশ বীজ লাগে। গোধূম, যব ও বুটের দানা বড় কিন্তু তিসির দানা ছোট, অধিকন্তু পিচ্ছিল সুতরাং উক্ত কয়-প্রকারের বীজ একত্রে মিশাইয়া বুনানি করিতে গেলে ক্ষুদ্রতা ও পিচ্ছিলতাহেতু তিসি হাতে থাকিয়া যায়। এজন্য তিসি অগ্রে বা পশ্চাতে বপন করা উচিত। তিসির সহিত সর্ষপ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। বীজ বপন করা হইলে একবার হাল্কা ভাবে লাঙ্গল দিয়া বিদা বা চৌকীদ্বারা মাটি সমতল করিয়া দিতে হয়। এ সকল

ফসলে বড় নিড়েন করিবার আবশ্যক হয় না, তবে যদি তৃণ জঙ্গলাদি অধিক জন্মে, তাহা হইলে একবার নিড়েন করা উচিত। সচরাচর চৈত্র-মাসে তিসি পাকিয়া উঠে এবং গাছও শুকাইয়া আসে। মিশেন-আবাদ হইলে, ক্ষেতের যে ফসলটী অগ্রে পাকিয়া উঠে, তাহাকে অগ্রে সংগ্রহ করা উচিত, কিন্তু তিসি ও বুট এককালে কাটিতে হয়। এতদুভয়ের কোন একটী পাকিতে বিলম্ব থাকিলে কয়েকদিন বিলম্ব করিয়া উভয়কেই একত্রে কাটিয়া একত্রেই দৌনী করিতে হয়, পরে কুলায় ঝাড়িয়া ছোলা ও তিসিকে স্বতন্ত্র করিতে হয়। সর্ষপ, গোধূম বা যব সম্বন্ধে একথা চলে না, কারণ শস্য পাকিয়া অধিক দিন ক্ষেতে থাকিলে গাছ হইতে দানা খসিয়া পড়ে। শস্য পাকিয়া উঠিলে গোধূমের ন্যায় প্রত্যূষে গোড়া ঘেঁসিয়া ফসল কাটিয়া খামারে আনয়ন করতঃ যথানিয়মে শস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। বিঘা প্রতি ৩/০ মণ হইতে ৪/০ মণ তিসি উৎপন্ন হয়।

বাজারে যে তিসি আমদানী হয় তাহাতে এত মাটি ও জঞ্জাল থাকে যে জিনিষ ভাল হইলেও তাহার মূল্য কম হইয়া যায়। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ খলেনে মাড়িবার পর অনেক জঞ্জাল শস্যের সহিত থাকিয়া যায় অথবা সেরূপ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মহাজনেরা কৃষকদিগের নিকট হইতে শস্য খরিদ করিয়া আনিয়া তাহার সহিত নানাবিধ জঞ্জাল, মাটি ও পরিত্যক্ত অপরাপর শস্য মিশাইয়া দিয়া পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তিসি বিলাতে রপ্তানী হইত কিন্তু ইদানীং রুসিয়াতে উহার আবাদ বৃদ্ধি হওয়ায় বিলাতী সওদাগরগণ ঐ স্থান হইতে অনেক তিসি খরিদ করিয়া থাকেন।

বাঙ্গলা, বেহার, যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চলে তিসির যথেষ্ট আবাদ

হয়। পূর্ব্বে মান্দ্রাজ হইতে বিস্তর তিসি রপ্তানী হইত কিন্তু এক্ষণে বাঙলা ও বোম্বাই এ বিষয়ে অগ্রণী।

সচরাচর দুই জাতীয় তিসি দেখা যায়। তন্মধ্যে শ্বেত জাতীয় হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। তিসির তৈল নানাবিধ বার্নিস, রং, সাবান ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মসিনার অর্থাৎ তিসির তৈল কঠোর শীতেও ঘনতা প্রাপ্ত হয় না কিম্বা নারিকেল তৈলের ন্যায় জমাট বাঁধে না। শীঘ্র শুষ্ক হয় বলিয়া ইহাতে নানাবিধ রং (Paint) প্রস্তুত হইয়া থাকে। অগ্নিপক্ক তৈল আরও শীঘ্র শুকাইয়া থাকে। তিসিজাত খৈল কৃষিক্ষেত্রের বিশেষ সার।

তিসির বীজ পাটের ন্যায় ঘন করিয়া বুনিলে গাছ দীর্ঘ হয়। সেই সকল গাছ পাটের ন্যায় কাচিয়া যে আঁশ বা সূতা উৎপন্ন হয় তাহা বড় মূল্যবান। শস্য ও তন্তু একই গাছ হইতে উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে কোনটাই ভাল হয় না, সুতরাং আঁশ উৎপন্ন করিতে হইলে কেবল তাহারই জন্য আবাদ করা, নতুবা শস্যের জন্য আবাদ করা, উচিত।

তিল

(Lat: Sesamum Indicum. Eng: Til or gingelly.)

বর্ণভেদে তিল দুই প্রকারের—শ্বেত ও কৃষ্ণ। আরও দুই জাতীয় তিল আছে ঃ—কার্ত্তিকে-তিল ও কাট-তিল। প্রথম দুইপ্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণ-তিল হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয় তাহাই উৎকৃষ্ট।

শ্বেত তিল।—দোয়াঁশ-মাটিযুক্ত ডাঙ্গা জমি শ্বেত তিলের পক্ষে উত্তম। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৩।৪ বার ক্ষেত্রকর্ষণ করতঃ মাটি ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। অতঃপর আষাঢ় মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে

ক্ষেতে পুনরায় উত্তমরূপে চাষ দিয়া বীজ বুনিতে হইবে। বীজ বুনিবার তিন চারি দিনের মধ্যে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আপাততঃ বপন কার্য্য স্থগিত রাখা উচিত। তিলের আবাদে কোনরূপ সার দিবার আবশ্যক হয় না। অধিক সারাল জমিতে তিলের গাছ ঝাঁড়াইয়া যায় ফলতঃ তাহাতে ফলন ভাল হয় না। সারপ্রদান না করিলেও, ক্ষেতের কর্ষণকার্য্য উত্তম হওয়া চাই। আবাদী ক্ষেতে বিঘাপ্রতি /১ সের হিসাবে বীজ বুনিতে হয়, কিন্তু মাটি উর্ব্বরা হইলে তিন পোয়া বীজেই চলে। ঘনরূপে বীজ উপ্ত হইলে গাছ বাড়িতে পারে না, তন্নিবন্ধন ফসল ভাল হয় না। ঘনরূপে যাহাতে বপিত না হয় এবং যাহাতে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, এজন্য পূর্ব্বরাত্রে বীজ জলে ভিজাইয়া, পরদিন উহার সহিত ৪।৫-গুণ ছাই বা বালি বা মাটি মিশাইয়া লইতে হয়। ৬।৭-দিনের মধ্যে গাছ দেখা যায়। যে সকল স্থানে চারা ঘন হইয়া জন্মিয়াছে তথা হইতে কতক চারা তুলিয়া ফেলিলে ভাল হয়। প্রত্যেক গাছ এক হাত হইতে দেড় হাত ব্যবধান থাকা উচিত। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিলে এবং চারা নিতান্ত ছোট থাকিতে যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মাটিতে যো আসিলে, হাল্‌কাভাবে একবার বিদ্ধক পরিচালনা করিলে চারা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। পৌষমাসে শস্য পাকিয়া উঠে। শুঁটী উত্তমরূপে পাকিলে গাছ কাটিয়া খামারে আনিয়া প্রসারিত করিয়া দিলে ৫।৭-দিন মধ্যে বেশ শুকাইয়া যায়। অতঃপর, তাহাদিগকে 'ডেঙ্গাইয়া' বাছাই-ঝাড়াই করিয়া লইতে হইবে। বিঘাপ্রতি ২/০ মণ হইতে ৪/০ মণ তিল উৎপন্ন হয়, কিন্তু জমি উর্ব্বরা হইলে এবং ক্ষেতের ভাল তদ্বির হইলে ৭।৮/০ মণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।

কৃষ্ণ তিল।—(Sesamum majus) আশ্বিন মাসের শেষ-ভাগে বীজ বুনিতে হয়। ক্ষেত তৈয়ার করিতে বিলম্ব হইয়া গেলে

কার্ত্তিক মাসেও বীজ বপন করা চলে। মাটিতে রস থাকিতে বীজ বুনিলে ফলন অধিক হয়। ইহার বপনবিধি শ্বেততিলের ন্যায় এবং আবাদও তদনুরূপ। কৃষ্ণতিলের বীজ /১॥০ দেড় সের হইতে /২ দুই সের লাগে। মাঘ-ফাল্গুনে দানা পাকিয়া উঠিলে গাছ কাটিয়া খামারে আনিয়া 'জাগ' দিতে হয়। ৭।৮ দিন পরে স্তূপ ভাঙ্গিয়া দানা বাহির করিতে হইবে। বিঘাপ্রতি ৪।৫/০ মণ ফসল হয়। কিন্তু জমি এঁটেল ও রসাল হইলে এবং ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ১০।১২ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে।

কৃষ্ণ-তিলের একটী বেশ সৌরভ আছে। তিল পেষণ করিলে তিলের-তৈল উৎপন্ন হয়। পুষ্পমিশ্রিত তিল হইতে নানাবিধ ফুলেল-তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু ফুলেল-তৈলের জন্য শ্বেত-তিল বিশেষ স্পৃহণীয়।

কাট তিল।—ইহার আবাদপ্রণালীর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই। কাট-তিলের বীজ বপন করিবার সময়,—মাঘ-ফাল্গুন মাস। কাট-তিল জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে।

আবাদ কালে মাটিতে রসাভাব দৃষ্ট হইলে সকল প্রকার তিলেই ২।১টী ছেঁচ দেওয়া আবশ্যক।

তিলের-তৈলকে (Gingelly oil) কহে। বিলাতে ভাল সাবান প্রস্তুত করিবার এবং আলোক জ্বালিবার জন্য প্রধানতঃ উক্ত তৈল ব্যবহৃত হয়। ফ্রান্স দেশে নানাবিধ সুগন্ধি তৈল বা আরক প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর অনেক তিল রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরব দেশেও বিস্তর তিল গিয়া থাকে। *

---

* মৎকৃত 'মালঞ্চ' নামক পুস্তকে ফুলের-তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

বুট বা ছোলা

(Lat. Cicer arietum. Eng. Gram.)

বেহার-প্রদেশে ইহাকে বাদাম কহিয়া থাকে। বুট রবিশস্য, সুতরাং ভাদুই ফসলের জমিতে আবাদ করিতে হয়। ধান্য, পাট, শন প্রভৃতি ফসল ক্ষেত হইতে উঠিয়া গেলে, জমি রীতিমত চষিয়া আশ্বিন-মাসের মধ্যে কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথমভাগে বীজ বুনিতে হয়। বুনিবার জন্য বিঘাপ্রতি দশ সের বীজ লাগে।

পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে গৃহপালিত অশ্ব ও গবাদি পশুদিগকে বুটের গাছ খাওয়ান হইয়া থাকে। গাছ যখন অর্দ্ধ পরিপক্ব হয়, তখন দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালগণ ও গৃহস্থেরা একেবারে ফসল খরিদ করিয়া তাহাতে গরু চরাইয়া থাকে।

সরস দো-আঁশ মাটিতে বুট উত্তম জন্মে। অনেক ফসলের ন্যায় বেলে মাটিতে বা উচ্চ জমিতে বুট বুনিলে সে জমি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়, ফলতঃ মাটিতে রসাভাব হয়, তন্নিবন্ধন গাছ সুপুষ্ট হইতে পারে না। বুট ঘনভাবে বুনিলে মাটির রস তাদৃশ শীঘ্র শুষ্ক হইবার আশঙ্কা থাকে না, বুটের গাছ ভূ-সংলগ্ন হইয়া থাকে, এজন্য ইহার সহিত তিসি গম, সর্ষপ প্রভৃতি শস্যের একত্রে আবাদ হয়।

বুট দুই প্রকারের—শ্বেত ও লাল কিন্তু সচরাচর শেষোক্ত বুটেরই আবাদ হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অযত্নের সহিত আবাদ হওয়ায় বঙ্গ দেশীয় বুট অতিশয় নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাদুই ফসল জমি হইতে উঠিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই কৃষকগণ জমিতে দুই একবার চাষ

দিয়া বীজ ছিটাইয়া দেয়। আশ্বিনমাসে ইহাতে ক্ষেত্রময় সমভাবে চাষ পড়ে না, মাটির ঢেলা ভাঙ্গে না এবং তৃণ জঙ্গল থাকিয়া যায়। ইহারা মনে করে যে, অনেক জমিতে বীজ বুনিতে পারিলেই অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে এবং এই ভ্রমবশতঃ জমি তৈয়ারির প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কত বিঘা জমিতে আবাদ করা হইল তাহাই দেখে। আবার এরূপ ঘটনারও অপ্রতুল নহে যে, তাহারা এক বিঘার বীজ চারি পাঁচ বিঘায় বুনিয়া বিঘার সংখ্যা বাড়াইয়া থাকে মাত্র। ঈদৃশ অযত্নের ফসল যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হয়।

অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাস নাগাইদ বুটের গাছে ফুল ধরে, তদনন্তর সুঁটী ধরে। সুঁটীর মধ্যে একটী দুইটী বা তিনটী দানা থাকে। দানা পরিপুষ্ট ও সুপক্ক হইলে ফসল কাটিয়া খলেনে আনিয়া দৌনি করিতে হয়। চৈত্র মাসের মধ্যে বুট পাকিয়া উঠে। তখনই উহা কাটিবার উপযুক্ত সময়। গুল্ম সকল সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইবার ৫।৭ দিবস পূর্ব্বে তাহাদিগকে কাটিয়া খামারে আনয়ন করা কর্ত্তব্য, নতুবা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেলে সুঁটী সকল ফাটিয়া যায়, ফলতঃ মাটিতে দানা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। গুল্ম ঈষৎ কাঁচা থাকিতে কাটিয়া আনিয়া কয়েক দিবস খলেনে শুকাইয়া মাড়িয়া লওয়া সুবিধাজনক।

প্রতি বিঘায় ২/০ হইতে ৫/০ বুট উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু শৃঙ্খলা ও যত্ন সহকারে আবাদ করিলে ফলনের বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার কুষ্টি সাহেব বলেন যে, ছোলায় গাছ হইতে (Oxalic acid) নামক এক প্রকার দ্রাবক নির্গত হইয়া থাকে এবং কৃষকেরা তাহা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করে।*

* Dr. Voigt's Hortus Suburbanus Calcuttensis.

কার্পাস *

(Lat : Gossypium Sp. Eng : Cotton.)

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মৃত্তিকা ও জল-বায়ু ভেদে সকল স্থানে এক প্রকার জিনিষ উৎপন্ন হয় না। আসাম, ঢাকা, বেহার, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি বহু দেশে বিশেষ বিশেষ কার্পাস জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইদানীং অনেক স্থানে মাকিন ও মিসর তুলার আবাদ হইতেছে। বিদেশী তুলার মধ্যে ন্যানকিন, জর্জ্জিয়ান, নিউ-অর্লিন্স, ডনক্যান ও পিয়ারলেশ জাতি প্রচলিত। আমরা যে কয়েক প্রকার কার্পাসের আবাদ করিয়াছি, তন্মধ্যে নিউ-অর্লিন্স ও ডনক্যান এবং বেরারের ঝারি ও বানি এবং বোম্বায়ের ধারোয়ার ও বাণি জাতীয় তুলা উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কাশিপুর ইন্‌ষ্টিটিউশনের কৃষিক্ষেত্রে 'গারো' জাতীয় কার্পাস ভালরূপ জন্মিয়াছিল। ইহার ফল বৃহৎ, তন্তু দীর্ঘ ও দৃঢ় হয় কিন্তু তেমন কোমল বা চিক্কণ হয় না। বিদেশীয় কার্পাস-ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও তন্তু অতি কোমল অথচ দৃঢ় ও সূক্ষ্ম এবং বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র হয়। দাক্ষিণাত্যে ক্যাম্বোডিয়া ও টিনিভিল্লী নামক কার্পাসের বহুল আবাদ হয়, বাজারে ইহার বিশেষ কাট্‌তি আছে,—বিলাতেও যথেষ্ট চাহিদা আছে। বঙ্গদেশে ইহার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে বিশেষ লাভের কথা। বিদেশীয় তুলার ফলন দেশীয় তুলা অপেক্ষা কম। বিদেশীয় তুলার সহিত দেশীয় ভাল জাতীয় তুলার দ্বারা সঙ্কর-বীজ উৎপন্ন করিয়া লইলে যে ফসল হইবে, তাহাতে

*মৎকৃত 'কার্পাস-কথা' পুস্তকে কার্পাসের বিষয় বিশিষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে।

উভয়বিধ গুণ থাকিবার সম্ভাবনা এবং পরস্পরের মধ্যে যে দোষ থাকে তাহাও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। সঙ্কর-বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য সহজ উপায় এই যে, এক ক্ষেত্রেই উত্তম জাতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় তুলার মিশ্রত আবাদ করা। তাহা হইলে এক পুষ্পের রেণু অপর পুষ্পে সঞ্চারিত হইয়া যে নূতন জাতি উৎপন্ন হয় এবং সেই বীজ হইতে যে ফসল হইবে, তাহা উভয় জাতির গুণ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে সহজে কার্পাস সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া নিকৃষ্ট জাতীয় কাপাসের সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয় কাপাসের আবাদ করা কোনমতে স্পৃহণীয় নহে।

উচ্চ হালকা দো-আঁশ জমিই কার্পাস আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। অধিক বেলে-জমিতে তুলা ভাল জন্মে না কিন্তু যাহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের অংশ অধিক,তাহাতে কার্পাসের আবাদে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্পাস দীর্ঘকাল স্থায়ী ফসল, সুতরাং এরূপ স্থানে উহার আবাদ করিতে হইবে, যথায় বর্ষাকালে জল না দাঁড়ায় কিম্বা গ্রীষ্মকালে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক না হয় অথবা শুষ্ক হইলেও তাহাতে জলসেচনের সুবিধা থাকে।

কার্পাসের জমিতে বিস্তর চাষ দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত উহার ভূমিতে অভাব পক্ষে ১০।১২-বার চাষ ও মই দেওয়া উচিত। জমিতে ঢেলা থাকিলে তাহা চূর্ণ করিয়া সমুদায় ক্ষেত ধূলাবৎ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে খনার একটী সুন্দর বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"শতেক চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা,
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।"

অর্থাৎ বারম্বার চাষ দিয়া মাটি আল্গা ও চূর্ণ করিতে হইবে। জমি স্বভাবতঃ কঠিন বা এঁটেল হইলে তাহাতে ছাই বা উদ্ভিজ্জ-সার

যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হইবে। মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ সার প্রদত্ত হইলে কার্পাস বৃক্ষ সুশ্রী ও সবল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আঁশ কম জন্মে। জমিতে অস্থিচূর্ণ দিলে তন্তুর পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে এবং তন্তু দৃঢ় হয়। ক্ষেতে অস্থিসার দিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহা প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে বা আষাঢ় মাসের প্রথমেই আবাদ আরম্ভ করিতে হয়। কোথাও বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কোথাও চারা রোপণ করিতে হয়। শেষোক্ত প্রণালীই স্পৃহণীয়। বীজ না বুনিয়া ভাঁটীতে চারা তৈয়ার করিয়া ক্ষেতে লাগাইলে শ্রমের অনেক লাঘব হয় এবং শ্রেণী পরস্পর ও বৃক্ষ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের সামঞ্জস্য থাকে।

ভাঁটীর মাটি অত্যন্ত হাল্‌কা করিয়া তাহাতে ২।৩ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক-একটি বীজ পুতিয়া দিলে ৫।৬ দিন মধ্যে চারা জন্মে। চারা উৎপন্ন হইলে এবং ক্ষেত্রে রোপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাঁটীতে যথাবিধি জলসেচন ও নিড়েন করা আবশ্যক।

বীজ যাহাতে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় এবং চারা বলিষ্ঠ হয় তদুদ্দেশ্যে কোন মৃণ্ময় পাত্রে দ্বাদশ ঘণ্টাকাল বীজগুলিকে গোময় মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া পরে ভাঁটীতে 'পাত' দিতে হয়। সোরা কিম্বা গোবর-জল-সিক্ত বীজের চারা অপেক্ষাকৃত তেজাল হয়।

চারা গাছে ৫।৬টী পাতা জন্মিলে তাহারা ক্ষেতে রোপণের উপযোগী হয়। আষাঢ় মাসের শেষভাগের মধ্যে পাতের চারা যাহাতে অত বড় হইয়া উঠে, এইরূপ আন্দাজ করিয়া যথাসময়ে বীজ বুনিতে পারিলে ভাল হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে বীজ পাত দিলে আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ মধ্যে চারা সমূহের ৫।৬টী পাতা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

চারা রোপণোযোগী হইলে, দুই হাত অন্তর পংক্তিতে আড়াই বা তিন হাত ব্যবধানে এক-একটী চারা অপরাহ্ণে রোপণ করিতে হয়। রোপণ করিবার পর গাছের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক। বর্ষা নামিয়া থাকিলে রোপিত চারায় আর জলসেচন করিতে হয় না, নতুবা প্রতিদিন অপরাহ্ণে জলসেচন করিতে হয় এবং ২।৩ দিনের জন্য দিবা-ভাগে কদলী-পেটিকা দ্বারা চারাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে চারা সকল ভূমিতে সংলগ্ন হয়। পাঁচ ছয় দিনের পর গাছের গোড়া ঈষৎ উস্কাইয়া প্রতি গোড়ায় দুই চারি মুষ্টি গোবর-সার দিতে পারিলে ভাল হয়।

বর্ষা সমাগত হইলে এবং যথাযোগ্য 'যো' পাইলে গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। গাছগুলি দেড় হাত আন্দাজ বাড়িয়া উঠিলে গোড়া হইতে এক হাত রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া দিতে হয়। এইরূপে শিরোভাগ ছাঁটিয়া দিলে গাছের ঊর্দ্ধগতি পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হয়—গাছ ঝাড়াল হয়। অকর্ত্তিত গাছ লম্বা হইয়া উঠে এবং সত্বরেই পুষ্প ধারণ করে কিন্তু তাহার ফলন অধিক হয় না এবং কোয়া ছোট ছোট হয়। বর্ষা অতীত হইলে মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া কুড়ি পঁচিশ দিবস অন্তর ক্ষেতে জলসেচন করিতে পারিলে ভাল হয়। জলসেচন করিতে না পারিলেও ক্ষেত্রের মাটি সর্ব্বদা আলগা ও তৃণশূন্য রাখিতে হইবে।

আশ্বিন মাস হইতে গাছে পুষ্পোদ্গত হয়, পরে ফল ধারণ করে। কার্পাস ফুল ঢেঁড়স ফুলের ন্যায়। পৌষ মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং পাকিয়া যখন ফাটিয়া যায়, তখনই ফল সংগ্রহ করিবার সময়। প্রতিদিন রৌদ্রের সময় ফল সংগ্রহ করা উচিত। প্রাতে সংগ্রহ করায় দোষ এই যে, রাত্রিকালের শিশিরে তাবৎ গাছ ও ফল সিক্ত থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় তুলিলে রুই'য়ে অর্থাৎ তন্তুতে ময়লা

লাগিতে পারে। প্রতিদিন ফল উঠাইলে আর রৌদ্র, বাতাস বা শিশিরে রুই বিবর্ণ হইতে পায় না। বিবর্ণ বা মলিন হইলে তুলার মূল্য কমিয়া যায়। ফল পাকিবার সময় সমাগত হইলে প্রতিদিন ক্ষেত অন্বেষণ করিয়া ফাটা ফলগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। যে ফল আপনা হইতে না ফাটীয়া যায় সে ফল কদাচ উঠান' উচিত নহে, কারণ তখনও তাহার আঁশ কাঁচা থাকে। ফল ফাটিয়া গেলেই জানা যায় যে, গাছের সহিত উহার সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে, তখন আর উহাকে গাছে রাখিলে উপকার না হইয়া ক্ষতি হইবে।

সংগৃহীত ফল সকল ভূমিতে বা অপরিষ্কার পাত্রে কখন রাখা উচিত নহে কারণ তাহাতে রুই বিবর্ণ হইয়া যায়। সংগ্রহকারীদিগের প্রত্যেকের সহিত পরিষ্কার চাঙারি বা ঝুলী থাকিলে উহারা ফল উঠাইয়া অনায়াসে তন্মধ্যে রাখিতে পারে। যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কার্পাসের আবাদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির ফল স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। জাতিনির্ব্বিশেষে সকল কার্পাসই একত্রে মিশিয়া গেলে কোন জাতিরই বিশেষত্ব থাকে না, সুতরাং মূল্যেরও তারতম্য হয় না। কার্পাস সংগ্রহ করিবার জন্য বালকবালিকা অথবা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলে অল্প খরচে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কোয়া (কার্পাসের ফলকে স্থানবিশেষে কোয়া ও গোটা কহে), সংগৃহীত হইলে কর্ম্মশালায় আনিয়া খোসা পৃথক করিতে হয়, পরে রোঁয়া বা রুই হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিতে হইবে। কোয়া হইতে রুই পৃথক করিবার সময় মুনিষদিগের হস্ত অপরিষ্কার না থাকে কিম্বা রোঁয়ার সহিত কোয়ার কুচি বা ভগ্নাংশ মিশিয়া না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। *

বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য একপ্রকার দেশীয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত ইক্ষুপেষণ

* কোন কোন স্থানে কার্পাস-তন্তু, রুই রোয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

যন্ত্রবৎ কল আছে। উক্ত যন্ত্রমধ্যে কোয়া ধরিলে একদিকে রুই হইতে বীজ পৃথক হইয়া পড়িয়া যায়। সমুদায় তুলার বীজ স্বতন্ত্র করা হইলে রুই ওজন করিয়া থোলের মধ্যে বাঁধাই করিয়া শুষ্ক ও নিরাপদ স্থানে রাখিতে হইবে। গাঁট-বাঁধাই না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিনের ছাড়ান রুই এমন স্থানে রাখিতে হইবে, যথায় থাকিলে তাহাতে শিশির, বৃষ্টি বা ধূলা লাগিতে না পারে।

প্রথম বৎসরের ফসল সংগৃহীত হইবার পর মাঘমাসে জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করতঃ ঈষৎ চাপিয়া দিতে হয়। এবং বর্ষার পূর্ব্বে প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সার প্রদান করিতে হয়। অতঃপর, শাখা-প্রশাখার পরিপুষ্ট অংশ মাত্র রাখিয়া উপরিভাগ ছাঁটিতে হয়। তাহার ফলে কর্ত্তিত বৃক্ষগণ পুনরায় নূতন শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া যথাসময়ে ফল ধারণ করে। দুই-তিন বৎসরকাল গাছ রাখিতে হইলে প্রথমবার রোপণ করিবার সময় গাছ সকলের পরিবৃদ্ধির জন্য চতুস্পার্শ্বে যথেষ্ট স্থান রাখা আবশ্যক। এরূপস্থলে প্রত্যেক গাছের জন্য চারিদিকে তিন হাত স্থান রাখিতে হইবে অথবা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে জমি কোপাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক তিনটী গাছের মধ্যস্থিত বৃক্ষগুলিকে উঠাইয়া ফেলিলে অবশিষ্ট গাছের জন্য স্থানের অপ্রতুল হয় না। তিন চারি বৎসরের গাছগুলি পাঁচ ছয় হস্ত ঊর্দ্ধে বড় হইয়া থাকে।

কার্পাস-বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয় এবং সে তৈল অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তজ্জাত খৈল গবাদি পশুদিগের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। উক্ত তৈল জ্বালানী কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, উক্ত খৈল কৃষিকার্য্যেই সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

শৃঙ্খলা সহকারে এক বিঘা তুলার আবাদ করিতে পারিলে প্রায়

আড়াই মণ তুলা এক বৎসর মধ্যেই পাওয়া যায় এবং প্রতি মণের মূল্য ন্যূনকল্পে ২০৲ টাকা ধরিলেও বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকার তুলা উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বীজের মূল্য স্বতন্ত্র আছে।

কার্পাস-ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক স্থান খালি থাকে, এইজন্য সেই বৃক্ষ পরস্পরের মধ্যস্থিত খালি ভূমিতে মাঠ-কড়ায়ের কিম্বা আনারস গাছের আবাদ করা চলে। মাঠ-কড়াইয়ের চাষে কার্পাস বৃক্ষের উপকার হইয়া থাকে, বাদাম গাছও কার্পাস গাছের ছায়া দ্বারা উপকৃত হয়। বৃক্ষ পরস্পরের মধ্যস্থিত খালি জমি আপতিত না রাখিয়া মাঠ-কড়াইয়ের চাষ করিতে পারিলে অনেক দিকে লাভ আছে।

কৌতুহলপরবশ হইয়া কিম্বা বিচার না করিয়া যে-সে জাতীয় কার্পাসের আবাদ করায় লাভ নাই। অল্প পরিমাণে আবাদ করিতে হইলে বাজার-চলন কার্পাসের আবাদ করা ভাল, কারণ উহা সহজেই বাজার দরে বিক্রয় হইয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ জাতির আবাদ করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে আবাদ করা উচিত। অল্প পরিমাণ ফসল স্বতন্ত্ররূপে ও স্বতন্ত্রমূল্যে কেহ লইতে চাহে না।

বিগত কয়েক বৎসর অন্যান্য কার্পাসের মধ্যে কয়েক কাঠা জমিতে মিশরী (Egyptian) কার্পাসের আবাদ করিয়াছিলাম। প্রথম বৎসর ফল বা ফুল হয় নাই, তথাপি সেই সকল বৃক্ষকে নষ্ট করা হয় নাই। দ্বিতীয় বৎসর উহাদিগকে তেমন যত্ন করাও হয় নাই কিন্তু গাছে ফল হইয়াছিল। ফল ছোট হইয়াছিল। মিসর-তুলার যে সুন্দর রং ও রোঁয়া যেরূপ সুকোমল তাহা আর বলিবার নহে। দ্বিতীয় বৎসরে সেই সকল গাছের যত্ন হইলে ফল ভাল হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয় বৎসরের শেষেও সে গাছ জীবিত ছিল। মিসরী কার্পাসের আবাদ করিতে পারিলে বিক্রয় করিয়া

সমধিক লাভ হয়। উক্ত তুলা বড় আদরের জিনিষ। ভারতবর্ষের সকল স্থানে ইহার আবাদ হইতে পারিবে কি না এক্ষণে তাহা পরীক্ষাধীন!

দ্বারভাঙ্গা জেলায় 'কোকৃটী' নামক এক জাতীয় কার্পাস জন্মে। ইহার কোয়া বড় বড় নহে কিন্তু রোঁয়া দৃঢ় ও ফিকে-গোলাপী বর্ণের। উহার রুই হইতে স্থানীয় তন্তুবায়গণ যে কোকৃটী-কাপড় প্রস্তুত করে তাহার মূল্য ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকা হইয়া থাকে। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ উক্ত বস্ত্র পরিধান করেন। এত অধিক মূল্যের বস্ত্র খরিদ করিবার লোকাভাব হেতু সচরাচর ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। কোকৃটী কাপড়েয় চাপকান, চোগা, সার্ট প্রভৃতি বেশ প্রস্তুত হইতে পারে। রেসমের পাড় বসাইয়া বঙ্গমহিলাগণ পরিধান করেন। *

কাঁওন

(Lat: Panieum Eng: Millet.)

পার্ব্বত্য ও অসভ্য জাতিগণই সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করে এবং সেই সকল দেশেই উহার চাষ-আবাদ হয়। উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দরিদ্র লোকে ইহা অধিক ব্যবহার করে।

নাবাল জমিতে কাঁওন উত্তম জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে

---

* কার্পাস সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিতে হইলে গ্রন্থকার প্রণীত 'কার্পাস কথা' নামক পুস্তক দেখিতে পারেন।

জমিতে দুই-চারিবার চাষ দিয়া বৈশাখ মাসে দুই-এক পশলা বৃষ্টিপাতের পরে বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি এক সের বীজ লাগিয়া থাকে। বীজ বপনের পরে বৃষ্টি হইলে তিন-চারি দিবসের মধ্যে উহা অঙ্কুরিত হয়, অন্যথা ৭।৮ দিনও সময় লাগে। বীজ বুনিবার একমাস মধ্যেই গাছগুলি অর্দ্ধহস্ত বা তিন পোয়া উচ্চ হয়, তখন নিড়ানি দ্বারা মাটি উস্কাইয়া দিলে গাছ শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। সারাল জমিতে গাছ প্রায় তিন হাত উচ্চ হয়, নতুবা দুই হাত হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে গাছে শীষ উঠে এবং সেই শীষ ভাদ্র মাসে পাকিয়া উঠিলে কাটিয়া আনিয়া খলেনে তিন চারি দিবস শুকাইয়া যথানিয়মে মাড়িয়া-ঝাড়িয়া পরিষ্কৃত শস্যকে গৃহজাত করিতে হইবে। শস্য পাকিয়া উঠিলে আর অধিক দিবস জমিতে রাখা উচিত নহে, কারণ নানাবিধ পক্ষীতে উহা খাইয়া যায়।

কাঁওনের দানা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং বোধ হয় ৩।৪টী একত্র করিলে একটী সর্ষপের সমান হয়। শীষ কাটিয়া লইবার পর গাছগুলি জমিতেই থাকিয়া যায়। কৃষকগণ আর উহা কাটিয়া না আনিয়া ভাবী ফসলের উপকারের জন্য জমিতেই জ্বালাইয়া দেয়। কাঁওন চূর্ণ করিয়া যে ময়দা বা আটা প্রস্তুত হয়, তাহা সহজে পরিপাক হয় না। অভাবে পড়িয়া দরিদ্র লোকে ইহা আহার করে। অন্যদিকে আবার এন্সলী (Anislie) সাহেব বলেন যে দুগ্ধের সহিত পাক করিলে সুন্দর খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

প্রতি বিঘায় ২/০ মণ হইতে ৪/০ মণ কাঁওন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মটর।

(Lat: Pisum sativum. Eng: pea or matar.)

আশ্বিন মাসে জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয়া কার্ত্তিক মাসে বীজ বুনিতে হয়। ইহার বীজ ক্ষেত্রময় ছিটাইয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ছোট জাতীয় দেশীয় বীজ হইলে বিঘাপ্রতি দশ সের, আর বড় জাতীয় পাটনাই হইলে সাত সের বীজ লাগে।

গবাদি গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্য শীতকালে কৃষক ও দুগ্ধব্যবসায়ীগণ ইহার আদর করে। ফল সমেত গাছ খাইয়া গাভী দুগ্ধবতী হয় এবং ইহাতে তাহাদের শরীরও পুষ্টিলাভ করে। অনেক কৃষক গোয়ালাদিগকে এই সময় ক্ষেত্র অর্থাৎ ক্ষেতের ফসল বিক্রয় করে। ক্রেতাগণ উক্ত ক্ষেতে স্ব স্ব গো-মহিষাদি পশুদিগকে চরাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মটর আহরণ করা অপেক্ষা গাছ সমেত ক্ষেত বিক্রয় করায় লাভ আছে।

পাটনাই মটর মনুষ্যের আহার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মটর অতিশয় পুষ্টিকর, মধুর এবং উত্তাপজনক ও মুখপ্রিয়। এজন্য ইহা শীতকালে প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৌষ মাস হইতে গাছে সুঁটী ধরিতে আরম্ভ হয়। তখন কৃষকগণ উহা সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, কেহ বা তখন বিক্রয় না করিয়া রাখিয়া দেয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল পাকিয়া উঠে ও লতা শুকাইতে থাকে, তখন উহা কাটিয়া আনিয়া যথানিয়মে দানা সংগ্রহ করিতে হয়। বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ মটর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপর্য্যুপরি আবাদ করায় যে ক্ষেত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাতে

মঠর বর্গীয় (Leguminosae) ফসল বুনিলে মৃত্তিকা পুনরায় উৎকর্ষতা লাভ করে। ইক্ষু, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি ফসল জমিকে অতিশয় নিঃস্ব ও দুর্ব্বল করে, এই কারণে সেই সকল ক্ষেত খালি হইলে তাহাতে মটর, অড়হর, বুট প্রভৃতি উক্ত বর্গীয় ফসল দেওয়া কর্ত্তব্য।

মটর ভাঙ্গিয়া যে দাল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা ভারতবাসীর বিশেষ উপাদেয় খাদ্য। নিরামিষাশী হিন্দুগণের পক্ষে ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয় খাদ্য, কারণ মৎস্যমাংসাদি ভোজন না করায় শরীরে যে 'ফস্‌ফরস্‌' নামক পদার্থের অভাব হয়, তাহা মটর জাতীয় ফসলের দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে। বিনা ফস্‌ফরসে জীব-শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক উহা আমাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। গুরুজন বিয়োগে অশৌচাবস্থায় হিন্দুগণের মৎস্যমাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহাতে শরীরের যে ক্ষতি হয় তাহা রোধ করিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ হবিষ্যান্নের সহিত মটর দালের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মটর দাল পেষণ করিয়া বড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উক্ত বড়ী বিশেষ পুষ্টিকর ও মুখরোচক বলিয়া নানা প্রকার ব্যঞ্জনে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

অড়হর *

(Lat : Cajanus indicns. Eng : Pigeon Pea.)

অড়হর সিম্বীক বর্গীয় (Leguminosae) উদ্ভিদ। বুট, মটর,

* ইহার ইংরাজি নাম pigeon pea ; এতদর্থে বাঙ্গালায় পায়রা মটর বুঝায় কিন্তু তাহা নহে। পায়রা-মটর স্বতন্ত্র জিনিষ।

বাকৃলা, সীম প্রভৃতি এই বর্গের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান নামক বায়বীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) আহরণ করতঃ মৃত্তিকায় সঞ্চিত করে। বারম্বার আবাদ হওয়ায় যে সকল ক্ষেত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাদিগের পুনরুদ্ধারার্থ সেই সকল ক্ষেতে অড়হরের আবাদ করিতে হয়। সচরাচর দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে আবাদিত হইয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়া পড়িলে ৩।৪ বৎসর অন্তর কৃষকগণ তাহাতে অড়হরের আবাদ করে। অপরাপর বর্গীয় ফসল ভূমি হইতে সোরাজান পরিশোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু অড়হরও মাটি হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উক্ত পদার্থ আহরণ করিলেও ভূমির কোন ক্ষতি হয় না। *

আবাদের কালভেদে অড়হরের দুইটী জাতি আছে,—জেঠুয়া ও অঘানী। জেঠুয়া জাতির বীজ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং অঘানী-বীজ অগ্রাহায়ণ মাসে বপনীয়। হরিৎ-সারের জন্য যাঁহারা অড়হরের আবাদ করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে জেঠুয়া অড়হরের আবাদ করা উচিত। কারণ, সে বীজ জ্যৈষ্ঠ-মাসে বুনিলে গাছ সকল শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই হস্তাধিক দীর্ঘ হইয়া উঠে—এবং তখন তাহাদিগকে কাটিয়া ভূশায়িত করিয়া দিলে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন

---

* এই জাতীয় কয়েকটী উদ্ভিদ—বিশেষতঃ বুট কিম্বা বাকৃলা—ভূমি হইতে উৎপাটন করিলে দেখা যায় যে তাহাদের শিকড়ের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল কিম্বা ঈষৎ লম্বা—ধরণের ডিম্ব বা কোষ সংলগ্ন। উহাদিগের মধ্যে উদ্ভিদাণু (Baeteria) থাকে। উদ্ভিদাণু কোষ নির্ম্মাণ করে, কি কোষ পাইয়া তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে—তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। যাহা হউক, কোষমধ্যে জীবাণুগণ থাকিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান বাষ্প আহরণ করিয়া মৃত্তিকা ও উদ্ভিদকে বিতরণ করে।

মাসের মধ্যে সেই সকল গাছ পচিয়া গিয়া মাটির সহিত অল্লাধিক মিশিয়া যায়, ফলতঃ তাহাতে রবি ফসল, ইক্ষু, তামাক, আলু প্রভৃতির আবাদ হইলে তাহাদিগের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

অঘাণী জাতির বীজ অগ্রহায়ণ বা পৌষে বপনীয়—কিন্তু তাহা প্রকৃষ্ট নহে। জীরেণ দিবার অভিপ্রায়ে এ সময়ে অড়হরের আবাদ হইয়া থাকে। এ সময়ের ফসলে বিশেষ আয় হয় না। প্রধান আবাদ জেঠুয়া।—দানার জন্য হউক বা হরিৎ-সারের জন্য হউক, মাটির উত্তম পাট হওয়া উচিত।

আবাদ।—জেঠুয়া আবাদের জন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে ২।১ বার চাষ দিয়া মাটি ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথমে ক্ষেতে পুনরায় চাষ দিয়া বীজ বুনিতে হয়। সাধারণতঃ ইহা মিশেন-আবাদের ফসল মধ্যে পরিগণিত, এইজন্য ইহার সহিত আশুধান্য বা মাড়ুয়া বা কোদো বপিত হয়। সেই সকল ফসল ভাদ্র মাসের মধ্যে সংগৃহীত হইলে, মাত্র অড়হরই ক্ষেত অধিকার করিয়া থাকে। এতদর্থে ধান্য, মাড়ুয়া বা কোদো—ইহাদিগের যে কোন ফসলের বীজ অগ্রে বুনিতে হইবে। চারা জন্মিলে ক্ষেত্রে দুইবার বিদে পরিচালনা করিতে হয়। দ্বিতীয়বার বিদে পরিচালনা করিবার পূর্ব্বে অড়হরের বীজ ছিটাইয়া দিতে হইবে। ছিটান-বুনানিতে বিঘা-প্রতি একসের বীজের প্রয়োজন হয়। মাটির অবস্থাভেদে /১ সের হইতে /৩ সের বীজ বুনিতে দেখা গিয়াছে। ভাল করিয়া ছিটাইতে পারিলে /১ সের বীজই যথেষ্ট। ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে ক্ষেত ঘন হইয়া পড়ে, গাছসকল পার্শ্বদিকে প্রসারিত হইতে পারে না। ঘনক্ষেতের সকল গাছই শীর্ণ ও দীর্ঘ হয় এবং তাহাতে ফলন অধিক হয় না।

মিশেন-আবাদ না করিয়া কেবল অড়হরের আবাদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রণালীতে বীজ বুণিতে হয় এবং তাহাতে সমধিক ফসল পাওয়া যায়। কৃষকগণ ঘন-আবাদের পক্ষপাতী কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যথেষ্ট স্থান পাইলে অড়হর গাছ ৫।৬ হাত দীর্ঘ হয় এবং পার্শ্বদেশে ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া প্রচুর ফলধারণ করে। এ প্রণালী অবলম্বন করিলে প্রতি বিঘায় ৪০০ গাছ হইলেই চলে। এ সম্বন্ধে আর একটি নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে ঃ—গাছগুলি তিনহাত উচ্চ হইলে ভূমি হইতে প্রত্যেক গাছের গোড়া হইতে দুই হাত রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া দিতে হইবে, এবং তাহা হইলে গাছগুলি শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ঝাড় হইয়া উঠিবে। উল্লিখিত প্রণালীতে আবাদ করিতে হইলে ৪ হাত অন্তর এক একটী মাদা করিয়া তন্মধ্যে অড়হরের দানা পুতিয়া দিলেই হইল রোপণীয় দানাগুলি বড় ও সুপুষ্ট হওয়া উচিত।

যে প্রণালীতেই হউক, মাটি সরস থাকিলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। অপর প্রণালীতে বীজ বপন করিলে প্রত্যেক মাদায় একটির হিসাবে গাছ রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং অবশিষ্টগুলির শিরোভাগ কাটিয়া দিতে হইবে। ঘন-রোপিত ক্ষেত্রে ছুরি চলিবে না। ছাঁটিয়া দিলে গাছের শাখা-প্রশাখা উদ্গত হয় এবং ক্ষেত ঘন ও নিবিড় হইয়া যায়, অগত্যা তাহাতে ফসলও কম জন্মে। শেষোক্ত প্রণালীতে বীজ বুনিলে যে গাছ জন্মিবে তাহাই ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত, অপর স্থলে নহে।

উচ্চ, নীরস ও বালিমাটি অপেক্ষা নিম্নতল, চিক্কণ বা দোয়াঁশ জমিতে অড়হর গাছ ভালরূপ জন্মে। সার ও নীরস জমিতে তাদৃশ আশা জনক ফসল হয় না। যে স্থলে কেবল জমির উর্ব্বরতা সাধন

ক্ষেত্রস্বামীর উদ্দেশ্য, তথায় ও উহার জন্য বিশেষ তদ্বিরের আবশ্যক।

কার্ত্তিক মাস হইতে অড়হর গাছে ফুল ধরিতে থাকে এবং সেই ফুল হইতে শুঁটী জন্মে। প্রত্যেক শুঁটীর মধ্যে তিনটী হইতে পাঁচটী দানা বা বীজ থাকে। ফাল্গুন মাসে শুঁটী পরিপক্ক হইলে শুঁটীসমেত গাছ অথবা কেবল ডগা কাটিয়া খলেনে আনয়নপূর্ব্বক ৩।৫দিন উত্তমরূপে শুষ্ক হইতে দেওয়া আবশ্যক। অতঃপর, গাছ ধরিয়া আছড়াইলে কিম্বা দৌনী করিলে শুঁটি খসিয়া পড়ে এবং শুঁটী হইতে দানা পৃথক হইয়া পড়ে। অবশেষে ঝাড়িয়া লইলেই কার্য্য সমাধা হইল। বিঘা-প্রতি ৫।৬ মণ ফসল জন্মে কিন্তু শেষোক্ত প্রণালীতে ৮।১০ মণ জন্মিয়া থাকে।

অড়হর হইতে যে দ্বিদল বা ডাল (দাইল?) উৎপন্ন হয়, তাহা অতি পুষ্টিকর ও বলকারক। অড়হরের ভূষি খাওয়াইলে গাভী দুগ্ধবতী হয় এবং পশুগণ বলিষ্ঠ হয়।

অড়হর কাষ্ঠদ্বারা জ্বালানী কার্য্য চলিতে পারে কিন্তু নিতান্ত হাল্‌কা বলিয়া শীঘ্রই পুড়িয়া যায়। বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার অঙ্গারের প্রয়োজন হয়। অতএব নষ্ট না করিয়া বারুদ ব্যবসায়ীদিগকে উহা বিক্রয় করিলে লাভ আছে।

অড়হরের আবাদ উঠিয়া গেলে ক্ষেত্রকে পোড়ান উচিত নহে, কেন না, তাহা হইলে তৎসংগৃহীত যবক্ষারজানও সেই সঙ্গে বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং জমির পূর্ব্বাবস্থা আসিয়া পড়ে এবং অড়হরের আবাদ দ্বারা ক্ষেত্রের যে কিছু উপকার হইয়াছিল, তাহা আর থাকে না।

অনেক স্থানে দেখা যায়, কৃষকগণ ক্ষেত্রের চারিদিকে অড়হর গাছের বেড়া দিয়া থাকে, তাহাতে ফসলও পাওয়া যায় এবং জমিও

আটক থাকে। অনেক স্থলে কার্পাস বৃক্ষ পরস্পর স্থানে অড়হর রোপিত হইয়া থাকে, ইহাতে কার্পাসের বিশেষ উপকার হয়।

মুগ

(Lat : Phaseolus Sp. Eng : Munga)

মুগ তিন প্রকারের—কৃষ্ণমুগ, সোণামুগ ও ঘোড়ামুগ। এই তিন প্রকার মুগ মধ্যে সোণামুগ উৎকৃষ্ট। ইহার ডাল মুখরোচক ও উপাদেয়। রোগী ও বড় মানুষের যোগ্য ডাল। কৃষ্ণমুগ ইহার নিম্নস্থানীয় এবং ঘোড়ামুগ নিকৃষ্ট জাতীয়।

কৃষ্ণমুগ।—বর্ষাকালে না ডুবিয়া যায় এরূপ জমিতে ইহার আবাদ হয়। এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষার্দ্ধভাগ হইতে আষাঢ় মাসের প্রথমার্দ্ধভাগ সময়ের মধ্যে বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি তিন সের হইতে সাড়ে তিন সের বীজ লাগে। যথারীতি ক্ষেতের পরিচর্য্যা করিয়া বীজ বুনিবার পর হাল্‌কা ভাবে মই দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কৃষ্ণমুগ পাকিয়া উঠিলে ফসল কাটিয়া খামারজাত করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪।৫ মণ মুগ উৎপন্ন হয়।

সোণামুগ।—পূর্ব্ববঙ্গে সোণামুগের কিছু অধিক আবাদ হয়। দোয়াঁশ ও পলি-পড়া চর-জমিতে সোণামুগের ফসল ভাল হয়। আশ্বিন মাসে তেয়ার (তিন দফা) চাষ দিয়া বিঘা-প্রতি ।৪ সের বীজ বুনিতে হয়। বুনিবার পর মই দেওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন বোধ

করিলে সময়ে সময়ে নিড়েন করিতে হয়। একবিঘা ক্ষেতে প্রায় ৫/ পাঁচ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। সহরে প্রতিমণ সোণামুগের মূল্য ৮।৯৲ টাকার কম নহে এবং ডালের মূল্য ১০ হইতে ১২৲ টাকা।

মসূরী।

(Lat : Ervum Sp. Eng : Lentii.)

সাধারণ 'রবি ফসলের জমিতে ইহার আবাদ হয়। মসুরী দুই প্রকারের,—দেশী ও পাটনাই। দেশীয় শস্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু পাটনাই জাতীয় মসুরী অপেক্ষাকৃত বড় ও উপাদেয়। কার্ত্তিকমাসে বীজ বুনিবার সময়। উচ্চ ও শুষ্ক মাটি অপেক্ষা নিম্নতল সরস ক্ষেতে মসুরী ভাল জন্মে। বিঘাপ্রতি /৫ সের বীজ বুনিতে হয়।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে শস্য পাকিয়া উঠিলেই কাটিয়া খামারে আনিতে হয়। কাটাই করিতে বিলম্ব করিলে শস্য ঝরিয়া পড়ে। বিঘাপ্রতি ৬/০ হইতে ৭/০ মণ ফলন হয় এবং মণ করা ৸০ সের ডাল উৎপন্ন হয়।' মসূরীর ডাল পুষ্টিকর খাদ্য এবং কবিরাজি শাস্ত্রমতে বহু গুণসম্পন্ন।

— —

ধনে

(Lat : Coriandrum Sativum Eng : Coriander.)

ধনে.—মসলা মধ্যে পরিগণিত। ইহার আবাদে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নাই অথচ বিশেষ লাভের ফসল।

সমতল এটেল মাটিতে ধনে উত্তম জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে পচান চাষ দিয়া ক্ষেত ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। ভাদুই ফসলের জমিতেও ইহার আবাদ করা যাইতে পারে।

আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে জমিতে ৩।৪ দফা উত্তমরূপে চাষ দিয়া বিঘাপ্রতি /৫ সের বীজ বুনিতে হয়। শেষচাষ দিবার পূর্ব্বে বীজ বুনিয়া মই দ্বারা মাটি চৌরস করিলেই বপন কার্য্য শেষ হইল। কারণ বিশেষে বীজ বুনিতে অধিক বিলম্ব ঘটিলে কার্ত্তিক-মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত বীজ বুনিতে পারা যায়। চারা উৎপন্ন হইতে ৫।৭ দিবস সময় লাগে। চারা ছোট থাকিতে বৃষ্টি হইয়া মাটি চাপিয়া গেলে, হালকা ভাবে একবার বিদ্ধক পরিচালনা করা আবশ্যক। চারা সকল আধ হাত আন্দাজ বাড়িয়া উঠিলে ঘন-স্থান হইতে কিছু কিছু চারা তুলিয়া ফেলিয়া দিলে ভাল হয়। ধনের আর কোনও পাট নাই, তবে ক্ষেতে তৃণ জন্মিলে দুই-একবার নিড়েন করিতে হয়। গাছ বড় হইয়া গেলে তৃণাদির আর উপদ্রব থাকে না।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে যখন ফুল ধরে তখন বহুদূর পর্য্যন্ত সৌরভে দিক সকল আমোদিত হয় এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষিকা আসিয়া মধু আহরণ করিতে থাকে।

চৈত্র মাসে শস্য পাকিয়া উঠে এবং গাছ শুকাইয়া যায়। অতএব এই সময়ে গাছ কাটিয়া খামারে আনয়ন করতঃ সদ্য হউক বা দুই-পাঁচ দিন পরে হউক, সুবিধামত ডেঙ্গাইয়া অর্থাৎ লগুড়াঘাতে শস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রতি বিঘায় তিন মণ হইতে পাঁচ মণ ফলন হয়।

মৌরী

(Lat : Pimpinella anisum. Eng : Anise.)

মৌরী বড় লাভের ফসল। দোয়াঁশ ও সারাল মাটিতে মৌরীর আবাদ করিতে হয়। আশ্বিন মাসে পাত দিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হইবে। চারা গাছ ৬।৭ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে ক্ষেতে রোপণ করিবার উপযোগী হয়। ইতিমধ্যে উত্তমরূপে চাষ দিয়া ৩।৪ হাত চওড়া পটি তৈয়ার করিতে হইবে। এক বিঘাতে ষোল হইতে কুড়িটী পটি হইতে পারে। অতঃপর, পটির মধ্যে এক হাত অন্তর একটি চারা রোপণ করিয়া ২।৩ দিন জলসেচন করিতে হইবে। মৌরী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিতে পারিলে ভাল হয়। সেরা-বাতের অর্থাৎ আশ্বিন-কার্ত্তিকের রোপিত গাছের ফসল চৈত্র মাসে, আর নামূল বাতের অর্থাৎ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের রোপিত গাছের ফসল জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। ফসল পাকিয়া উঠিলে গাছ কাটিয়া আনিয়া লগুড়া-ঘাতে শস্য স্বতন্ত্র করিতে হয়। বিঘা প্রতি আধ পোয়া বীজ লাগে। উৎপন্ন,—ন্যূনধিক দুই মণ।

এরণ্ড

(Lat : Ricinus Communis. Eng : Castor.)

ইংরাজীতে ইহাকে castor plant কহে। এরণ্ড-বীজ পেষণ করিলে যে তৈল নির্গত হয়, তাহা নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এরণ্ডের আবাদ হয়, তন্মধ্যে বেহার, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ ও অযোধ্যায় বাহুল্যরূপেই জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের কোলগাঁ এবং মাদ্রাজ প্রদেশে,—বিশেষতঃ কয়েমব্যাটোর

জেলা এরণ্ডের জন্য প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রদেশ সকলে যে দানা জন্মে, তাহা হইতে অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়।

উচ্চতল দোয়াঁশ বা বেলে মাটিতে এরণ্ডের আবাদ করিতে হইবে। বৎসর মধ্যে দুইবার ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে,—১ম বৈশাখ মাসে এবং ২য়,—কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে। অন্যান্য অনেক ফসলের ন্যায় এরণ্ড বৃক্ষ এক বৎসরের মধ্যেই মরে না এবং একই গাছে দুই তিন বৎসর ফসল প্রদান করে কিন্তু প্রথমের পরবর্ত্তী ফসলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে, এজন্য চাষীগণ প্রতি বৎসর নূতন ভাবে আবাদ করে।

এরণ্ডের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণী আছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই আবার ফল ও বৃক্ষের আকারানুসারে বিবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বেহার ও বঙ্গদেশে ইহার তিনটী জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়;—১ম, ক্ষুদ্রাকৃতি 'চুনাকি,' ২য়, মধ্যমাকৃতি 'গোহুমা,'; এবং তৃতীয়—বড় জাতীয় 'জাগিয়া'। কিন্তু প্রকৃষ্ট আবাদ পক্ষে 'কোলগাঁও' ও 'কয়মবাটোর' স্পৃহণীয়।

প্রকার-ভেদে, প্রথম তিন জাতির আবাদ-প্রণালী মধ্যেও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। চুনাকির আবাদ প্রণালী সহজ এবং তাহার জন্য জমির অধিক পাট করিবার প্রয়োজন হয় না। তিন হাত পরিমিত স্থান ব্যবধানে শ্রেণী মধ্যে উল্লিখিত পরিমিত-স্থান অন্তর দুই ইঞ্চ গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বীজ বুনিতে হয়। ন্যূনাধিক এক সপ্তাহ মধ্যেই বীজ হইতে চারা জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিবার সময়। চূণাকির গাছ ছয়-সাত হাত উচ্চ হয় এবং পৌষ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বীজ পাকিতে থাকে।

গহুমার তৈল জ্বালানী কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। 'গহুমা' জাতীয় রেড়ীই

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। গোধূম সদৃশ ইহার বর্ণ এবং দোয়াঁশ মাটিতেই ইহার আবাদ ভাল হয়। আশ্বিন মাসের শেষভাগে ভূমি কর্ষণ করিয়া কার্ত্তিক মাসে ভুমির মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে জলসেচন করিতে হয়। ইহার গাছ চারি হাত হইতে পাঁচ হাত উচ্চ হয়। চৈত্র মাসে বীজ পাকিতে থাকে।

বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে 'জাগিয়া' জাতির বীজ বপন করিবার সময়। এজন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই জমি তৈয়ার করিয়া রাখা আবশ্যক, পরে দুই-এক পসলা বৃষ্টিপাত হইলেই দুইহাত অন্তর জুলি করিয়া ২।৩ হাত ফাঁকে-ফাঁকে বীজ ফেলিয়া দিতে হইবে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে বীজ পাকিতে আরম্ভ হয়। 'জাগিয়া' রেড়ীর দানা লাল বর্ণের এবং ঈষৎ চ্যাপটা হইয়া থাকে।

'কোলগাঁও' ও 'কয়েমবাটোর' জাতিদ্বয়ের' আবাদাদি 'জাগিয়া'র ন্যায় এরণ্ড গাছের শাখা-প্রশাখার শিরোভাগে থলো থলো ফল হয় এবং সেই ফলের মধ্যে দানা থাকে। ফল সুপক্ক হইলে স্বতঃই বিদীর্ণ হয় এবং বীজ সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এজন্য ফলগুলি ফাটিয়া যাইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বেই স্তবক-সমেত ফল গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিতে হয়। অতঃপর ফলের অবস্থা বুঝিয়া উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। ফলগুলিকে থলো সমেত ভাঙ্গিয়া আনিয়া জল বা তরল-সার পূর্ণ কোন গর্ত্তে বা চৌবচ্ছায় অথবা বড় গামলায় দুই তিন দিবস রাখিয়া দিলে ফলের আবরণ বা খোসা পচিয়া আল্গা হইয়া যায়। তখন উহাদিগকে সেই পাত্র হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বংশখণ্ড বা যষ্টির দ্বারা বারম্বার আঘাত করিলে ফল হইতে দানা সমূহ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। অতঃপর, যথানিয়মে কুলার বাতাস দিয়া ভূষা হইতে দানা স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়।

উর্ব্বরা ভূমিতে সার দিবার আবশ্যক হয় না, যদিই সার দিতে হয় গোবর-সারই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। পরিচর্য্যার মধ্যে, মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত ক্ষেত্রে জলসেচন করা এবং নিড়ান করিয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার ও আল্গা করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু পরিচর্য্যার আবশ্যক হয় না।

রেড়ীর চাষের সঙ্গে আর একটী কাজ চলিতে পারে,—পলু পোষা। আসাম অঞ্চলে, 'এড়ি' রেশম উৎপন্ন করিবার জন্য স্থানীয় লোকেরা যে 'পলু' পুষিয়া থাকে, সে পলু এরণ্ড পাতাই ভক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং সেই সঙ্গে পলু পুষিলে দুই কাজই হইতে পারে, তবে যাঁহারা পলু পুষিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারা উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যেন কোন রেসম-তত্ত্ববিদের পরামর্শ লয়েন।



পিপুল বা পিপ্পলী

(Lat : Piper longum. Eng : Long Pepper.)

পিপুল,—লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বন জঙ্গলে উহা স্বভাবতঃ জন্মে। স্থানীয় লোকেরা উহার ফল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় পিপুলের আবাদ হইয়া থাকে। ইহার ফল ও মূল,—উভয়ই বিক্রয় হইয়া থাকে।

পিপুলের আবাদ অতি অল্প ব্যয়ে ও শ্রমে হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য ফসলের এমন কি, পাটের আবাদ অপেক্ষাও ইহার আবাদে যথেষ্ট লাভ আছে।

উচ্চ দোরসা জমিতে পিপুলের আবাদ হইয়া থাকে কিন্তু যে সকল

জেলায় বারিপাত অধিক তথায়ই পিপুল ভাল হয়। পাহাড়ের গাত্রে ও তরাই জমিতে আবাদ করা চলিতে পারে। পাহাড়ী-মাটি পিপুলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পিপুলের ক্ষেত অধিক সারবান হইলে ভাল হয়। গো-শালা ও গৃহস্থবাড়ীর সারকুড়ের আবর্জ্জনা ইহার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ সার।

পিপুল দুই প্রকারের। এক প্রকারের ফল—লম্বা ও সরু, অপর প্রকারের ফল—খর্ব্বাকার ও স্থুল। শেষোক্ত পিপুলই উৎকৃষ্ট এবং তাহারই সমধিক আবাদ হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত পিপুলকে লোকে 'ঘোড়া-পিপুল' কহে।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে ক্ষেত উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া মাটি তৈয়ার করতঃ ধঞ্চে, অড়হর বা জয়ন্তী গাছের বীজ পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়। উক্ত বীজোৎপন্ন চারাগুলির মধ্যে তিন হাত অন্তর এক একটি চারা রাখিয়া অপর সমুদায়কে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হয়। উৎপাটিত গাছ সমূহকে ক্ষেত হইতে দূর না করিয়া ক্ষেত্রোপরি পাতিত থাকিতে দিলে তৎসমুদায় পচিয়া গিয়া সারের কার্য্য করিয়া থাকে।

আঁষাঢ় মাসে পিপুলের মূল পুতিতে হয়। পিপুলের মূল হইতে চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে অর্দ্ধ-পক্ক লতাদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তজ্জাত গাছে ফলন ভাল হয় না; এজন্য পটোলের ন্যায় গেঁড় অর্থাৎ মূল-সমেত গোড়া রোপণ করা উচিত। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল ধঞ্চে, অড়হর বা জয়ন্তী গাছ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগের গোড়াতেই মূল রোপণ করিতে হয়। এ স্থলে বলিয়া রাখিতেছি যে, ধঞ্চে বা জয়ন্তী অপেক্ষা অড়হর গাছ রাখিলে বিশেষ লাভ আছে, কারণ অড়হর হইতে গৃহস্থগণ প্রতি বৎসর

একদিকে যথেষ্ট ডাল পাইতে পারেন, অন্যদিকে,—যে উদ্দেশ্যে উহাদিগের আবাদ করা যায় তাহাও সুসিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত, অড়হর গাছে লাক্ষার আবাদ করা চলিতে পারে। পিপুল ক্ষেতে এরণ্ড রোপণ করিলেও চলিতে পারে। এরণ্ড-বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয় এবং ক্ষেত্রস্বামী ইচ্ছা করিলে এরণ্ড বৃক্ষে পলু পুষিতে পারেন, সুতরাং এক পিপুল-ক্ষেত্র হইতেই তিন প্রকার ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

দীর্ঘে ও প্রস্থে তিন হাত অন্তর পিপুলের গেঁড় রোপণ করিলে প্রতি বিঘায় ন্যূনাধিক ৭৩০টী মূলের প্রয়োজন হয়।

পিপুলের মূল হইতে চারা জন্মিলে তাহাদের ডগাগুলিকে ধঞ্চে, জয়ন্তী, অড়হর বা এরণ্ড—যে কোন গাছ রোপিত হউক—তাহাতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। কেবল যে লতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিবার জন্য এই সকল বৃক্ষ রোপিত হয়, তাহা নহে। এই সকল বৃক্ষ রোপণ করিলে ক্ষেত্রে ছায়া উৎপন্ন হয়। পিপুল গাছের জন্য ঈষৎ ছায়ার বিশেষ আবশ্যক।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ক্ষেত একবার নিড়াইয়া দিতে হয়, তাহা ব্যতীত আর কোন পাট নাই। পৌষ-মাঘ মাসে গাছে ফল পাকিলে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই সময়ে পিপুলের লতা সমূহ শুকাইয়া যায় তখন লতাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া সমগ্র ক্ষেত একবার কোপাইয়া মাটি চূর্ণ করিয়া দিলে অল্পদিন মধ্যেই আবার মূল হইতে পটোলের মতন নূতন নূতন ফেঁকড়ি উদ্গত হয়। এইরূপ তিন বৎসরকাল ইহারা একই ক্ষেত্রে থাকিয়া ফসল প্রদান করিয়া থাকে। প্রথম বৎসর প্রতি বিঘায় আধ মণ হইতে এক মণ পিপুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। চতুর্থ বৎসর হইতে ফসল কমিয়া যায় সুতরাং তৃতীয় বৎসর ফসল সংগৃহীত হইবার পর

ক্ষেত ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া পূর্ব্ববৎ আবাদ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথম দুই বৎসর ফসল সংগৃহীত হইবার পরে গাছের গোড়ায় অর্দ্ধ-বিগলিত বিচালি অথবা গলিত লতা-পাতা অথবা অন্য আবর্জ্জনা দ্বারা ঢাকিয়া দিলে গোড়া ঠাণ্ডা থাকে এবং গাছ তেজাল হইয়া উঠে।

উল্লিখিত হিসাবে ন্যূনকল্পে তিন বৎসরে ৮/০ মণ পিপুল উৎপন্ন হইতে পারে এবং প্রতি মণের মূল্য ৩০৲ টাকা ধরিলে ৩২০৲ টাকা প্রতি বিঘা ভূমি হইতে আদায় হয়। ইহা তিন বৎসরের খরচ (প্রতি বৎসর ২০৲ টাকার হিসাবে) বাদ দিলে ২৬০৲ টাকা লাভ থাকে। অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কীট পতঙ্গের উপদ্রব প্রভৃতি কারণে কোন বৎসর সমগ্র ক্ষতি হইলেও প্রতি বিঘাতে গড়ে ৫০৲ টাকার উপর লাভ থাকিবার সম্ভাবনা। লাভ বা লোকসান কৃষকের আবাদ-প্রণালী ও পাট-পরিচর্য্যার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা বলা বাহুল্য।

আলু

(Lat: Solanum tuberosum. Eng: Potato.)

আলুর ইতিহাস।—সভ্যজগতে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষকাল আলু প্রচলিত হইয়াছে। উহা সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ আমেরিকান্তর্গত পেরু ও বোলিভিয়া প্রদেশ হইতে ইংলণ্ডে আনীত হয় এবং তথা হইতে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আকবর-সাহ দ্বারা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদিন এ দেশে আলু প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইহা সাধারণ ফসলরূপে গণ্য হইতে পারে নাই—এখনও প্রায় ঔদ্যানিক ফসলরূপে নির্দ্দিষ্টমাত্রায় ইহার আবাদ হয়। সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে

কেবল হুগলী ও বৰ্দ্ধমান জেলাতেই আলুর প্রভূত আবাদ হইয়া থাকে, এবং তথায়ই উহা কেবল কৃষি-ফসলরূপে গণ্য।

আলুর বিশেষত্ব।—আলু একটী বিশেষ পুষ্টিকর ফসল এবং অপরাপর অনেক ফসল অপেক্ষা ইহার ফলনও বহু গুণ অধিক সুতরাং অতিশয় লাভজনক। উৎকৃষ্ট জমিতে বড় জোর দশ মণ ধান্য বা গোধূমাদি উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু সামান্য পাট-পরিচর্য্যায় সে স্থলে অতি ন্যূনকল্পে ৪০/০ মণ আলু উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট প্রণালীর আবাদে তিন শত মন আলু উৎপন্ন হইতে শুনিয়াছি।

আবাদ-কথা।—ভারতীয় সমতল প্রদেশসমূহে সাধারণতঃ বর্ষাকাল অতীত হইলে আলুর আবাদ করিবার সময়, কিন্তু ভারতের সকল প্রদেশে একই সময়ে বর্ষা আরম্ভ বা শেষ হয় না কিম্বা সৰ্ব্বত্র সমপরিমাণ বারিপাত হয় না। এইজন্য আবাদ আরম্ভের কাল-নির্ণায়ক কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। স্থানীয় বর্ষার অবস্থা ও ভূমির উপযোগীতা বিবেচনা করিয়া কৃষকগণ স্ব স্ব কাল নির্দ্ধারিত করিয়া লয়েন ইহাই স্পৃহণীয়। তবে সাধারণের সুবিধার্থে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে (১) শরৎকাল একেবারে উত্তীর্ণ হইলে আলুর আবাদের সূত্রপাত করিতে হইবে। (২) জমি অল্পাধিক শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। যাহা হউক, বঙ্গদেশে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, আসাম অঞ্চলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এবং বেহার বা উত্তর-পশ্চিমে আশ্বিন মাসে আবাদ আরম্ভ করিতে পারা যায়।

সিমলা, নাইনিতাল, মসুরী, দার্জ্জিলিং, করুশিয়ং, শিলং প্রভৃতি হিমপ্রধান দেশ সমূহের সহিত সমতল ক্ষেত্রের (plain) আবহাওয়ার যেরূপ প্রভেদ, সেইরূপ ঐ সকল ও তাদৃশ স্থানে কৃষি কার্য্যার্থে সময়েরও বিশেষ পার্থক্য আছে। ঐ সকল স্থানে সাধারণতঃ মাঘ মাসের

শেষভাগ হইতে ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগই আলু রোপণ করিবার প্রকৃত সময়।

বীজ রোপণের একপক্ষ হইতে দুই পক্ষ পূর্ব্বে বারম্বার হল-চালনাদি দ্বারা মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া আগাছা ও তৃণজঙ্গলাদির শিকড় এবং ইট-পাটকেল বাছাই করিয়া লইতে হইবে।

আশু ধান্য, পাট প্রভৃতি ভাদুই ফসলের ক্ষেতে ও বাগান-জমিতে আলুর আবাদ করিতে পারা যায়। নিতান্ত রসা জমি এবং কঠিন এঁটেল বা লালচিটে মাটি আলুর পক্ষে তত ভাল নহে। রসা-জমিকে শুষ্ক করিতে হইলে ক্ষেতে পুনঃ পুনঃ হলচালনা করিতে হয়, কারণ তাহা হইলে মাটি শুষ্ক হয় ও ঝুরা হয়। এঁটেল ও কঠিন মাটিকেও উল্লিখিত উপায়ে ঝুরা করিয়া লইতে হয় এবং হাল্‌কা করিবার জন্য, মাটির কঠিনতা অনুসারে বিঘা প্রতি ১০।২০ গাড়ী গোবর সার, ২।৪ গাড়ী উদ্ভিজ্জ-ভস্ম, বিগলিত উদ্ভিজ্জ-পদার্থ, বিচালি-পচা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া হলচালনাদি দ্বারা মৃত্তিকাকে হাল্‌কা বা ঝুরা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। মোট কথা—আলুর জমি ধূলাবৎ চূর্ণ, গভীর এবং স্থিতিস্থাপক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ বেলেভূমিতে ইহার আবাদ করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বেলে মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্যের একান্ত অভাব, তাহা ব্যতীত উহা নিতান্ত নীরস, উপরন্তু রৌদ্রে মাটি অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ঈদৃশ জমিতে একান্তই আবাদ করিতে হইলে সমূহ পরিমাণে উত্তম বিগলিত উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ-সার প্রয়োগ দ্বারা মাটির সংস্কার করিয়া লইতে হয়।

বীজ।—যে আলু আমরা ভোজন করি, রোপণ করিবার জন্য তাহাই বীজরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাকেই বীজ-আলু কহে। নূতন আলু অপেক্ষা বীজ-আলু অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের পুরাতন আলুই স্পৃহণীয়।

পুরাতন আলুতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতেই 'চোক' (buds) মুখরিত হইয়া উঠে, সুতরাং তাহা রোপণ করিলে শীঘ্রই চারা উদ্গত হয়। এতদ্ব্যতীত পুরাতন আলুর গাছ তেজাল হয়,—ফলন অধিক হয়। কেবল তাহাই নহে, পুরাতন আলুর ত্বক অপেক্ষাকৃত স্থুল ও দৃঢ় হয় বলিয়া একদিকে ভূমির আর্দ্রতা সহনক্ষম, অন্যদিকে কীটের আক্রমণকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, বীজ-আলু সুপরিপুষ্ট, সুঠাম হইলে ভাল হয়। সচরাচর দেখিতে পাই—বীজের জন্য অতি ক্ষুদ্র বীজ রক্ষিত হয় কিম্বা আবাদ কালে যে-সে বীজ-আলু রোপিত হয়। উক্ত বীজ বিকৃত বেঠাম ও এতই শীর্ণ যে, দেখিলেই দুঃখিত হইতে হয়। তেজাল ও রসাল বীজ না হইলে আবাদ করিয়া সুখ হয় না—আর্থিক লাভও হয় না। এজন্য ক্ষুদ্র, শুষ্ক, শীর্ণ, কুঞ্চিত ও বিশ্রী-বেঠাম বীজ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম আকারের রসাল, পরিপুষ্ট, সুডৌল, মুখরিত-চোখ আলু রোপণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আর ইহাও দেখিতে হইবে যে, বীজ-আলুর মধ্যে একটীও যেন দাগী বা পচা না থাকে। অধিকাংশ দেশজাত আলুর বীজ প্রায় রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং সেই রোগাক্রান্ত বা কীটাণুসংযুক্ত বীজ রোপণ করিলে সেই সাংক্রামিক রোগ বা কীটাণুগণ পরে ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়িয়া সমগ্র ফসলের মহা অনিষ্ট করে। বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে নীরোগ ও কীটাণুবর্জ্জিত বীজ-আলু খরিদ করা উচিত। অতঃপর, বীজ মধ্যমাকারের হইলে অখণ্ডিত আলু রোপণ করা বিধেয়, কিন্তু বৃহদাকারের হইলে প্রত্যেকটীকে ২।৩ খণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড এক একটী স্বতন্ত্র বীজ হইবে। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক খণ্ডে যেন দুইটী সুপুষ্ট ও মুখরিত চোখ থাকে। অখণ্ডিত বীজেও দুইটী মাত্র ভাল চোখ রাখিয়া অপরগুলিকে রগড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিতে হয়। অধিক চোখসমেত

বীজ রোপণ করিলে একই বীজ হইতে বহু ফেঁকড়ি উদ্গত হয়, ফলতঃ গাছগুলি তাদৃশ তেজাল না হইয়া শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণের হইয়া থাকে এবং তজ্জাত ফসল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু প্রদান করে। ২।১টী পরিপুষ্ট চোখ হইতে মাত্র একটীও গাছ জন্মিলে তাহাতে আলু বড় হয় ফলনও অধিক হয়।

খণ্ড-বীজ।—খণ্ডিত আলু রোপণ করিতে হইলে রোপণের কয়েক দিবস পূর্ব্বে আলুগুলিকে উল্লিখিত নিয়মে খণ্ড খণ্ড করিয়া উজ্জের বা ঘুটের ছাই মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপে কয়েক-দিন রাখিয়া দিলে রস নির্গমন রুদ্ধ হয়, কর্ত্তিত অংশে একটী আবরণ পড়ে। এইরূপ বীজ রোপিত হইলে মৃত্তিকার রসের প্রভাবে পচিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। সদ্য খণ্ডীকৃত বীজ রোপণ করিলে উহা-দিগের চোখ মুখরিত হইতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হয়, এইজন্য খণ্ডীকৃত বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া জমিতে রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়। এতদর্থে খণ্ডিত বীজকে ৫।৭ দিবস গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলে বীজের চোখ ফুটিয়া উঠে, তখন রোপণ করিলে ভয়ের কারণ থাকে না। বিঘা প্রতি ৭০০ বীজ-আলু বা খণ্ড-বীজের প্রয়োজন হয়।

রোপণ-প্রথা।—ক্ষেত্রমধ্যে লম্বভাগে এক হাত ব্যবধানে আধ হাত গভীর ও এক বিঘত চওড়া সরল নালা বা জুলি খনন করতঃ তদুদ্গত মৃত্তিকাকে পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিতে হয়। বীজ রোপণের ২।৩ দিবস পূর্ব্বে ইহা করিয়া রাখা উচিত। অনন্তর, উক্ত মাটিকে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত কিছু ছাই বা উদ্ভিজ্জ বা গোময়াদি সার উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে মাটি হাল্‌কা হইয়া থাকে। অনন্তর খাতের মধ্যে চারি অঙ্গুলি স্থূল একস্তর সারমিশ্রিত মাটি প্রসারিত করাণান্তর তদুপরি ২।৩ অঙ্গুলি সাধারণ কিন্তু সুচূর্ণীত ও হাল্‌কা মাটি

প্রসারিত করিয়া দিয়া, পরে জাতি বিশেষের বৃদ্ধি, ভূমির উর্ব্বরতা ও সারের উদ্দীপকতানুসারে এক বিতস্তি হইতে একহাত অন্তর এক একটী বীজ স্থাপন করিয়া যাইতে হইবে। বীজগুলিকে যাহাতে সমান্তরালে বসান যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অতঃপর সারমিশ্রিত হাল্‌কা মাটির দ্বারা খাতের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দিয়া কোদালদ্বারা ধীরতা সহকারে ঈষৎ দৃঢ়ভাবে তাবৎ জুলির মাটি চাপিয়া দিতে হইবে। সমগ্র ক্ষেত্রে বীজ অজ্জান হইলে জুলির সারি বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রকে চৌরস করিয়া দেওয়া উচিত। বীজ রোপণের পর ক্ষেত্রোপরি গতায়াত করা একবারে নিষিদ্ধ কারণ গতায়াত হেতু মাটি দৃঢ় হইয়া যায়, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে ব্যাখাত ঘটে। রোপণের দিন হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে—কখন কখন একপক্ষ মধ্যে—বীজের চোখ ভেদ করিয়া চারা ভূপৃষ্ঠোপরি প্রকাশ পায়।

জল সেচন।— আলুর আবাদকাল মধ্যে তিনটী হইতে পাঁচটী সেচ দিতে হয়। মৃত্তিকার ধারকতা এবং খরাণীর অল্পাধিক্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জল সেচনের সংখ্যা নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু যখনই সেচ দিতে হইবে তখনই প্রচুররূপে দিতে হইবে। বীজ বপনের দিন হইতে চারি সপ্তাহ পরে প্রথম সেচ দিতে হয় এবং পরেও উক্ত কাল ব্যবধানে সেচন করা বিধি। ইতিমধ্যে প্রয়োজন বুঝিলে তিন সপ্তাহ অন্তর দিতে পারা যায়। নাবাল ও ডোবা জমি স্বভাবতঃই রসা হইয়া থাকে বলিয়া তাদৃশ জমিতে তত ঘন ঘন জল সেচন করা উচিত নহে, কারণ—তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা। তরাই বা হিমপ্রধান স্থানে প্রায় জল-সেচনের প্রয়োজন হয় না। তথায় শুষ্ক আবাদ করিলেই চলে।*

* শুষ্ক-আবাদের সূত্র পদ্ধতি গ্রন্থকার প্রণীত "মৃত্তিকা-তত্ত্ব পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পাপ্‌ড়ী-ভাঙ্গা।—মাটিতে জল সেচিত হইবার ২।৪ দিন মধ্যে ভূগর্ভে তাহা শোষিত হইয়া যায়, কতক রস বায়ু ও রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায় ফলতঃ মাটির উপরিভাগ বিদীর্ণ হইতে থাকে। এ সময়ে মাটিতে কাদা থাকে না অথচ মাটি জমাট বা কঠিন হয় না, সুতরাং অনায়াসে মৃত্তিকার পরিচর্য্যা করিতে পারা যায়। উক্ত পরিচর্য্যা মধ্যে খুরপী বা নিড়েন করাই প্রধান। উক্ত সময়কে মাটির যো অবস্থা এবং উক্ত পরিচর্য্যাকে 'পাপ্‌ড়ী-ভাঙ্গা' কহে। প্রতিবার সেঁচনের পর পাপ্‌ড়ী ভাঙ্গিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সাবধান, যেন তখন গাছগুলি বা শিকড়াদি কোনরূপে আঘাত না পায়। দ্বিতীয় কথা—বিচালিত মৃত্তিকা যেন চূর্ণ হইয়া যায়। পাপ্‌ড়ী ভাঙ্গিবার সময় ক্ষেত্রের তৃণাদিও উৎপাটিত করিয়া দিতে হয়—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মাটি চড়ান'।—প্রথমবার জলসেচন করিবার পর পাপ্‌ড়ী ভাঙ্গিবার সময় গাছগুলিকে দাঁড়ার উপর ঈষৎ হেলাইয়া কেবলমাত্র ডগাগুলিকে জাগ্রত বা ভাসমান রাখিয়া অবশিষ্ট অংশকে মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপ প্রতিবার জল সেচনের পর পাপ্‌ড়ী ভাঙ্গিবার কালে ডগায় মাটি দিতে হয়। ইহাকে ইংরাজিতে Earthing কহে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, যথায় তিনবার অপেক্ষা ঘন ঘন জল সেচন করিতে হয়, তথায় তত ঘন ঘন মাটি চড়াইবার প্রয়োজন হয় না, আবার যে সকল জেলায় জল-সেচনের প্রয়োজন হয় না কিম্বা জল-সেচনের সুবিধা বা ব্যবস্থা নাই, তথায় মধ্যে মধ্যে খুরপী করিয়া মাটি ঝুরা রাখিতে হয় এবং ডগা অধিক বাড়িয়া উঠিলেই ৪।৫ সপ্তাহ বা ততোধিককাল অন্তর গাছে মাটি দিতে হয়।

সার।—আলুর আবাদে সচরাচর পুরাতন ঝুরা গোবর, খৈল, অস্থিচূর্ণ, সুপার ফস্‌ফেট, ছাই প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, উক্ত সার সকল

পৃথক ও মিশ্ররূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোপণ কালে জুলিতে দিবার জন্য ৪।৫ মণ সারের প্রয়োজন হয়। নিম্নে একটী মিশ্রসারের তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

অস্থিচূর্ণ বা সুপার	...	...	১/০ মণ
খৈল	...	...	১/০ মণ
গবাদি পশুশালার আবর্জ্জনা	...	...	২/০ মণ
উদ্ভিজ্জ বা ঘুঁটে ছাই	...	...	১/০ মণ
			মোট—৫/০

এক বিঘা ভূমিতে উক্ত মিশ্র-সার ৫/০ দিলেই চলে। মাটি নিতান্ত নিঃস্ব হইলে উক্ত পরিমাণ অল্পাধিক বর্দ্ধিত করিয়া লইতে হইবে।

খৈল বা অস্থিচূর্ণের অভাবে গোময়াদি পশুসার সমধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। অস্থিচূর্ণ ইতঃপূর্ব্বেই দুই মাস পূর্ব্বে জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে ব্যবহারোপযোগী হয়,—সদ্য ব্যবহারে আশু ফল পাওয়া যায় না। খৈল ও গোবর—এতদুভয়কেও উত্তমরূপে পচাইয়া ঝুরা করিয়া না লইলে আবাদে নানাবিধ কীটের উপদ্রব হয় সুতরাং ঐ সকল সার কখনও টাটকা ব্যবহার করা উচিত নহে।

কীটের উপদ্রব।—কয়েক জাতিয় কীট আছে, তাহারা আলুর পরম শত্রু। উদ্ভিদাংশ কীটাক্রান্ত হইলে কীটদষ্ট পত্র ও ডগা-সমূহকে কাটিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া ভাল। অনন্তর উদ্ভিদ বা ঘুঁটের ছাই তাবৎ গাছে উত্তমরূপে জড়াইয়া দিতে হয়। প্রাতঃকালে গাছে শিশির সংলগ্ন থাকিতে ছাই দিলে উহা পাতায় সংলগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং এতদ্দ্বারা অনেক দিন উপকার পাওয়া যায়। ফড়িং জাতীয় অনেক রকম পতঙ্গ রাত্রিকালে গাছের অনিষ্টসাধন করে। ইহাদিগের বিনাশের জন্য

২।৩ দিন উপর্য্যুপরি সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রমধ্যে স্থানে স্থানে আগুন জ্বালাইলে তাবৎ পতঙ্গ আপনা হইতে আলোকের দিকে ধাবিত হয় ও অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়। এইরূপে তাহারা বিনষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে কার্ব্বলিক-সাবান বা ফিনাইল-মিশ্রিত জলদ্বারা গাছ সমূহকে—অন্ততঃ কীটাক্রান্ত গাছ সমূহকে—স্নান করাইয়া দিলে কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। গন্ধকের ধূম দ্বারাও উপকার পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে একটী পাত্রে অগ্নি ও গন্ধক দিয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় ধরিলে উহার গন্ধে কীট-পতঙ্গ পলায়ন করে কিম্বা মরিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত উহার তীব্র গন্ধ ও স্বাদ পত্রাদিতে সংলগ্ন হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন কীটাদি উদ্ভিদ স্পর্শ করে না।

ফসল সংগ্রহ।—কার্ত্তিক-মাসের রোপিত ক্ষেত হইতে গাছের গোড়ার মাটি সাবধানে সরাইয়া পৌষ মাসে অল্প আলু সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এইরূপে সংগ্রহকালে গাছ বা মূল দেশের কোন অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। সংগৃহীত হইলে পুনরায় মাটি দিয়া গোড়াগুলিকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হয়।

ফাল্গুন মাস হইতে রৌদ্রের তেজ বর্দ্ধিত হইলে আলুর ডগা বিবর্ণ হইতে থাকে ও গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর গাছগুলি একবারে শুষ্ক হইয়া গেলে সমুদায় ফসল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। ফসল সংগ্রহের জন্য কাষ্ঠশলাকাযুক্ত বিদে দ্বারা দাঁড়াগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেই সমুদায় আলু বাহির হইয়া পড়ে, সুতরাং সংগ্রহের সুবিধা হয়। বিঘা প্রতি ৮০/০ আশী মণ আলু উৎপন্ন হওয়া উচিত,—ইহাই হইল ন্যূন পরিমাণ। প্রথম বৎসরের অভিজ্ঞতা জন্মিলে পর বৎসর হইতে কৃষক নিজের মনোমত ব্যবস্থা করিয়া আবাদ করিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশা করা যায়।

বাছাই।—সংগৃহীত ফসলকে খামারে আনিয়া ক্ষণকাল রাখিবার পর একবার রগড়াইলে আলুর গাত্রস্থ তাবৎ মাটি ঝরিয়া পড়ে। এক্ষণে আকারানুসারে আলুগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মধ্যমাকারের সুঠাম, নির্দোষ আলুগুলিকে বীজের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে পারা যায়। কৃষিভাষানুসারে প্রথম শ্রেণীর নাম—ওয়েম দ্বিতীয়ের নাম—দোয়েম, ও তৃতীয়ের নাম—তিনম্। রক্ষা করিবার জন্য আলুগুলিকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। আলুগুলিকে থিথান চুণের জল কিম্বা ফিনাইলের জল দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়।

আলু রক্ষা।—যত্ন করিয়া রাখিলে আলুকে চৈত্র-বৈশাখ হইতে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বেশ রাখিতে পারা যায়। শুষ্ক বায়ু-পরিচালিত গৃহে মাচান বা তক্তাপোষের উপর আলু প্রসারিত করিয়া রাখিতে হয়। বড় বড় সিন্দুক মধ্যে রাখিয়া দিলেও থাকিতে পারে কিন্তু তন্মধ্যে উত্তাপ না জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তজ্জন্য সিন্দুকের গাত্রে ও উপরে ছিদ্র থাকা প্রয়োজন এবং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা ও ওলট-পালট করিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে উত্তাপ জন্মিতে পায় না। যে স্থানে রাখিতে হইবে, সে স্থান কোন মতে গরম না হয়, কারণ উত্তাপ আসিলেই আলু সকল অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। দাগী পচা বীজ আদৌ রাখা উচিত নহে। রক্ষিতাবস্থায় কোনটী দাগী হইলে বা কোনটীতে পচ্ ধরিলে তাহা বাছিয়া ফেলিতে হইবে এবং তাহার রস যদি কোনটীতে লাগিয়া থাকে তাহাও বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

শণ

(Lat : Crotolaria Juncea. Eng: Sunn hemp.)

পাটের ন্যায় শণ গাছ হইতে যে আঁশ পাওয়া যায় তাহাকেই শণ কহে। পাট অপেক্ষা শণ দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী অধিকন্তু জলসহ। এই সকল কারণে নানাবিধ মজবুত দড়ি, ক্যাম্বিস, ধীবরদিগের জাল ইত্যাদি নির্ম্মাণে শণ নিয়োজিত হইয়া থাকে।

সাধারণ আবাদী ক্ষেতেই শণের আবাদ হইয়া থাকে কিন্তু তাহা হইলেও যে সকল জমি বর্ষায় ডোবে না ঈদৃশ জমি ইহার জন্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। অতঃপর মাটি সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, এঁটেল, দুধে এঁটেল ও দোয়াঁশ—এই কয় প্রকার মাটিতেই শণ সমৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাটি সারবান হইলে গাছ সকল দীর্ঘ হয় ফলতঃ তাহার আঁশ দীর্ঘ হয়। দৈন্য মাটিতে যে শণের আবাদ হয় তাহা ছোট হয় এবং কড়া বা ভঙ্গুর হয়। আঁশের প্রধান গুণ,—স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) এবং আঁশের দৈর্ঘ্য। এই দুই গুণই উদ্ভিজ্জ সারসঙ্কুল মাটিতে পাওয়া যায়।

শণের মূল নিম্নস্তরে প্রবেশ করে। এইজন্য ইহার জমি অপেক্ষাকৃত গভীররূপে কর্ষিত হওয়া উচিত। যাহা হউক, ক্ষেত হইতে চৈতালী বা রবি শস্য সংগৃহীত হইলে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ ভাগ হইতে বৈশাখ মাস মধ্যে বারম্বার হাল-চৌকী দিয়া মাটি তৈয়ার রাখিতে হয়। অতঃপর জ্যৈষ্ঠ মাসে ২।১ পসলা বৃষ্টি হইলেই যো মত বীজ বুনিতে হইবে। সময় আগত হইলে অনর্থক কাল বিলম্ব না করিয়া বীজ

বপন করা উচিত। উত্তমাধম মাটি অনুসারে বপনীয় বীজের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। সারবান জমিতে বিঘা প্রতি /৫ সের মাঝারি জমিতে /৬ সের এবং খেলো জমিতে /৭ সের বীজ বুনিতে হয়। বীজ ছিটাইয়া ফেলিতে হয়।

যথানিয়মে বীজ বোনা হইলে ক্ষেতে একপালা মই দিয়া মাটি চাপিয়া চৌরস করিয়া দিতে হইবে। এই খানে বপন কার্য্য শেষ হইল।

মটি সরস থাকিলে চতুর্থ দিনে বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়, অন্যথা ২।৩ দিন অধিক সময় লাগে। অঙ্কুরিত গাছ সকল ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ হইলে ঘন বপিত স্থান সমূহ হইতে অল্প স্বল্প চারা উৎপাটিত করিয়া ফেলা উচিত নতুবা ঘনতা বশতঃ অনেক গাছ মরিয়া যায়। এতদবস্থায় যাহারা শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহাদের মধ্যে বহু গাছ ঘনতাবশতঃ সমভাবে বাড়িতে পারে না, ফলতঃ বলবান গাছ সকল বাড়িয়া উঠে এবং তাহাদিগের চাপে বা আওতায় অপরগুলি বাড়িতে পারে না,—অবশেষে মরিয়া যায়। মমতা বা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেত হালকা করিয়া দিলে অবশিষ্ট গাছগুলি যথাযোগ্য স্থান পাইয়া অমিততেজে বাড়িয়া উঠে। ১৬।১৭ সপ্তাহ ইহাদিগের বৃদ্ধিকাল, অতঃপর তাহাদিগের বৃদ্ধি শেষ হয় এবং তাহারা নিশানা স্বরূপ গাছের পুষ্পোদগম হয়। উৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম, চিক্কণ ও মসৃণ আঁশ উৎপন্ন করিতে হইলে এই অবস্থাতেই গাছ উৎপাটিত করিতে হয়। সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে আঁশ উৎপন্ন করা যায় তাহাতে গাছে ফল হইতে দিতে হয় এবং উক্ত ফল সকল বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে আবাদ শেষ হইল বুঝিতে হইবে।

পাট গাছ কাটিতে হয় কিন্তু শণ গাছ সমূলে উৎপাটন করিতে হয়।

গাছ উৎপাটন করিয়া ক্ষেতের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ পতিতাবস্থায় রাখিতে হয়।

অতঃপর উৎপাটিত গাছ সমূহকে ক্ষেতের স্থানে স্থানে—পাটের ন্যায় স্তুপীকৃত করিয়া ২।৩ দিন কাল জাগের অবস্থায় রাখিয়া দিবার পর, পাতা ঝাড়িয়া ১০।১২ গাছা একত্রে আটী বাঁধিয়া জলাশয়ে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে।

নিমজ্জিত করিবার ৮।১০ দিন পরে বোঝার ছড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, দণ্ড হইতে ছাল সহজে পৃথক হয় কি না। সে অবস্থা সমাগত হইয়া থাকিলে আর কালবিলম্ব না করিয়া আঁশ বাহির করিতে হইবে। যে প্রণালীতে পাট গাছের কাঠি হইতে ছাল পৃথক করিতে হয় শণ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম অবলম্বনীয়। কেহ কেহ দণ্ড সকলের ২।৩ স্থান ভাঙ্গিয়া ত্বক স্বতন্ত্র করে। ইহাতে ত্বক স্বতন্ত্রীকরণ সহজ হয় কিন্তু কাঠিগুলির দ্বারা বিশেষ কাজ হয় না। কাঠিগুলি দীর্ঘ থাকিলে জাফ্রি, বেড়া, পানের বরোজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে।

দণ্ড হইতে ত্বক্ পৃথক করা হইলে জলে আছড়াইয়া আঁশগুলিকে উত্তমরূপে ধুইয়া পাটের ন্যায় ভারায় প্রসারিত করিয়া শুকাইয়া গাঁট বাঁধিতে হয়। আঁশ সকল ছায়ায় শুকাইতে পাইলে উজ্জ্বলবর্ণ ও অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয়। বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ শণ ফলন হয়। আঁশের ইতরবিশেষ অনুসারে প্রতি মণের মূল্য ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা হইয়া থাকে।

ধঞ্চে

(Lat: Sesbania aculeata. Eng: Dhaincha.)

পাট ও শণের ন্যায় ধঞ্চেও সূত্রবহুল বা তন্তুদ উদ্ভিদ। ধঞ্চের সূতা পাট অপেক্ষা বিলক্ষণ জলসহ, টেকসই, এই জন্য ইহার আঁশ অনেক বৈষয়িক কাজে ব্যবহারে নিয়োজিত হয়। ইহার কাঠিগুলি লইয়া বারুইগণ পানের বরোজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইদানীং হরিৎসার হেতু চা-বাগিচায় ইহা প্রচুর পরিমাণে আবাদিত হইয়া থাকে এবং এই জন্য ধঞ্চে বীজের আজকাল অত্যাধিক চাহিদা হইয়াছে। বাগান বাগিচায় ছোট-ছোট চৌকা বা তক্তায় নানাবিধ সার প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায় কিন্তু তাহা ব্যয় সাপেক্ষ। বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্রে দুর স্থান হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষা বা বৃদ্ধি করা সহজ কথা নহে এবং এই ব্যয়বাহুল্যতা হেতু আমাদের সাধারণ কৃষিক্ষেত্রে সার সংযোজিত করা হইয়া উঠে না। কিন্তু ২।১ বৎসর অন্তর আবাদী ক্ষেত্রে ধঞ্চ্যাদি সিম্বীক উদ্ভিদের আবাদ করিয়া সমগ্র গাছ ভূশায়িত করিয়া দিলে অল্পদিন মধ্যে তাহা পচিয়াগিয়া মাটির সহিত মাটি হইতে থাকে এবং অল্পদিন মধ্যে ক্ষেত উর্ব্বরা হইয়া উঠে। ইহার উপকারিতা অসীম, এই জন্য কেবল হরিৎসারোদ্দেশ্যেও ইহার যথেষ্ট আবাদ করা উচিত। উচ্চ, নীরস ও বেলে মাটির ধারকতা স্বভাবতঃ কম কিন্তু সে প্রকার মাটিতে হরিৎসার সংযোজিত করিতে পারিলে, জমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মাটি সমধিক পরিমাণে রস পরিশোষন করিতে সমর্থ হয় এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংযোগ হেতু উর্ব্বরা হয়।

ভিন্ন প্রণালী মতে পাট গাছের ন্যায় শণ গাছদিগকে কাটিয়া ৮।১০

মুষ্টি কর্ত্তিত গাছে এক একটী আঁটি বাঁধিতে হয়। এইরূপে সমগ্র ক্ষেতের গাছ কাটা হইলে প্রত্যেক আঁটির উপরিভাগের সরু ও কোমলাংশ কাটিয়া বাদ দিতে হয়। এই অংশের আঁশ নিতান্ত কচি থাকে ফলতঃ সে সকল আঁশ ক্ষীণ হয়, কোন ব্যবহারে আইসে না। যাঁহারা গাছে বীজ পাকিলে গাছ কর্ত্তন করেন তাঁহাদিগের পক্ষে আঁটিবদ্ধ শনদণ্ডের গুচ্ছ সকলের উর্দ্ধাংশের পরিত্যক্ত শিরোভাগগুলি স্বতন্ত্রভাবে শুকাইয়া বীজগুলি সংগ্রহ করা উচিত। বীজ অনেক সময় ও অনেক স্থলে দুষ্প্রাপ্য। সচরাচর বীজের মূল্য প্রতি মণ ৬৲ হইতে ৭৲ টাকা, এবং কোন কোন বৎসর ৮৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

যাহা হউক, শিরোভাগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে আঁটি গুলিকে জলে পচাইতে হয়। গাছগুলির নিম্নাংশ অপেক্ষা উদ্ধাংশ কোমল। সমগ্র গাছ একবারে জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে উদ্ধাংশ ২।৩ দিন বা ৪।৫ দিন মধ্যে পচিয়া কাচিবার উপযোগী হয়, কিন্তু নিম্নাংশ কঠিন ও স্থূল বলিয়া উক্ত সময় মধ্যে কাচিবার উপযোগী হয় না সুতরাং শেষাংশের ছাল, কাষ্ঠ হইতে সহজে পৃথক হয় না। এই জন্য, কৃষকগণ সেই আটি সকলের নিম্নাংশ জলে ডুবাইয়া এমন ভাবে হেলাইয়া রাখে যে, আঁটি সকলের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশও জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে পারে। এইরূপে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টাকাল নিমজ্জিত থাকিলে নিম্নাংশের ছাল আলুগা হয়। অতঃপর তাহাদিগকে জলে শায়িত করতঃ পাট ভিজাইবার প্রণালীতে ভেলা বাঁধিয়া ডুবাইয়া তাহার উপর, কতকগুলি মাটির ছাপ, ঘাসের চাপড়া, কদলী-কাণ্ড বা ইষ্টক চাপাইয়া দিতে হয়। এতদবস্থায় ৪।৫ দিন থাকিলেই ছালের শাঁস পচিয়া যায়, আঁশ কাচিবার উপযোগী হয়। এক্ষণে আর কালবিলম্ব না করিয়া যতগুলি

জাগের আঁশ তৈয়ার হইয়াছে, ততগুলি জাগ ভাঙ্গিয়া আঁটি পৃথক করতঃ কাচিয়া ফেলিতে হইবে। নির্ম্মল ও স্রোতের জলে পাট, শণ প্রভৃতি শীঘ্র কাচিবার উপযোগী হয় না। এই জন্য পচা বা এঁদো পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি পঙ্কিল জলাশয়ে পাট শণাদি কাচা হইয়া থাকে। যে সকল জলাশয়ে পাট প্রভৃতি কাচা হয়, তথাকার জল একবারেই অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে। অনেকের এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে, উত্তরোত্তর পাটের আবাদ বৃদ্ধি হওয়ায় বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে।

নেওচা বা নিয়াজ।—কোন কোন বৎসর বীজ বুনিবার সময় আগত হইলে সহসা অতি বৃষ্টিতে ক্ষেত ডুবিয়া যায় এবং সে ক্ষেত শুকাইয়া যো পাইবার উপযোগী হইতে দিন কাটিয়া যায় ফলতঃ বীজ বুনিতে বিলম্ব হয়। ঈদৃশ অবস্থায় কৃষক যো'র অপেক্ষা না করিয়া জলময় ক্ষেতেই হলচালনা করিয়া সমগ্র মাটিকে কাদায় পরিণত করে। এবং সেই কাদার উপরেই বীজ ছিটাইয়া দেয়। কিন্তু বীজ বুনিবার পর মাটি একেবারে শুকাইয়া কঠিন হইয়া গেলে বড় সমস্যার কথা। যদিই এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয় তাহা হইলে উপায় থাকিলে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেতে জল সেচন করিয়া মাটি ভিজাইয়া দিতে হয়। যেখানে সে উপায় নাই সেখানে নেওচা করিয়া বীজ বোনা উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরিৎসাররূপেও ধঞ্চের আবাদ হইয়া থাকে। হরিৎসার সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধিক কিছু বলিব না কারণ তাহা ভিন্ন বিষয়ের অন্তর্গত।

ধঞ্চে ফসল দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধিত হয় কিন্তু তাহা হইলেও যথোপযুক্ত জমিতে ইহার আবাদ করা উচিত। সাধারণ মেঠো জমিতে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। বেলে মাটি ভিন্ন অপর সকল প্রকার মাটিতেই ইহা সুচারুরূপে জন্মে।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগ হইতে বৈশাখ মাস মধ্যে ক্ষেত তৈয়ার করিয়া, সম্ভব হইলে বৈশাখ মাসেই নতুবা জ্যৈষ্ঠের ১ম বা ২য় সপ্তাহ মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়। মৃত্তিকার উর্ব্বরতা ভেদে বিঘা প্রতি /২৷৷০ হইতে ৴৪ সের বীজ বোনা উচিত। ৩৷৪ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা পাট বা শনের ন্যায়। সাধারণ কৃষকের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৪৷৫ মণ আঁশ উৎপন্ন হয়।

ধঞ্চে কাষ্ঠের কয়লা অতিশয় লঘু বলিয়া বারুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

জুয়ার

(Lat: Sorghum Eng: Sorghum vulgare)

জুয়ার বাঙ্গালায় দেবধান্য বা দেধান নামে অভিহিত। ধান্যের সহিত জুয়ারের কোন সাদৃশ্য নাই তথাপি ইহা দেবধান্য নামে কেন অভিহিত হইয়াছে জানা যায় না। জুয়ার গাছের আকার ভুট্টার মত এবং আবাদ প্রণালীও তদনুরূপ।

জুয়ারের তিনটী জাতি আছে,—১ম, শকুর-জুয়ার (Sorghum Saccharatum) ২য়, গহমা (Sorghum Roxburghii) এবং ৩য়, দে-ধান বা দেবধান্য বা জুয়ার (Sorghum Vulgare)। উল্লিখিত তিন জাতীয় জুয়ারের শস্য হইতে যে আটা উৎপন্ন হয় তাহার পুষ্টিকরতা গোধূমের নিকটবর্ত্তী। খাস বাঙ্গালায় ইহার আবাদ পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর কারণ তথায় ধান্যই সর্ব্বসাধারণের খাদ্য-শস্য এবং অন্নই

বাঙ্গালীর প্রাণ, অন্নই আমাদিগের সহজপ্রাচ্য। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার হাওয়া ধান্য আবাদের পক্ষে যত অনুকুল অন্য কোন খাদ্য-শস্যের পক্ষে তেমন নহে। এই সকল কারণে ভুট্টা, জুয়ার প্রভৃতি একদিকে পশ্চিম-বাঙ্গালা ও বেহার হইতে সুদূর পঞ্জাব প্রদেশ, অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদিগের আবাদ দেখা যায়।

ঈষৎ নাবাল জমি ও দোঁয়াঁশ, দুধে-এঁটেল ও লালচিটে মাটি জুয়ারের পক্ষে প্রশস্ত। ইহার উপর মাটি স্বভাবতঃই সরস হইলে ভাল হয়। ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতির ন্যায় ইহা অতি বুভুক্ষু ফসল। এইজন্য সারাল জমিতেই ইহার আবাদ করা উচিত। উচ্চতল, চিতেন ও কুর্ম্ম পৃষ্ঠ ভূমি স্বভাবতঃ বড় নীরস। তাদৃশ নীরস জমিতে আবাদ করিলে জুয়ার-ক্ষেতেও পাটান অর্থাৎ জলসেচন করা প্রয়োজন হয়।

বৈশাখ মাসে যথানিয়মে ক্ষেত তৈয়ার করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ-ভাগে বা আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে বীজ বুনিতে হইবে। বিঘা প্রতি /২ সের বীজ লাগে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে দানা পাকিয়া উঠে। তখন দানাসহ শীষ কাটিয়া খামারে আনিয়া ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া ডলাই-মলাই করিয়া দানা সংগ্রহ করিতে হইবে।

অতঃপর গাছগুলিকে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া উপরার্দ্ধভাগ তদবস্থায় বা শুকাইয়া গবাদি পশুদিগকে যথানিয়মে জাব দিতে পারা যায়। ফল ধারণ করিলে দণ্ড সমূহের নিম্নার্দ্ধভাগ কঠিন হইয়া যায়, পশুগণ তাহা ভক্ষণ করে না সুতরাং সেগুলি জ্বালানী কাজে নিয়োজিত হইতে পারে।

পশুখাদ্যের জন্যই আবাদ করিতে হইলে খুব সারাল ও সরস জমিতেই ইহার আবাদ করা উচিত। নীরস ও নিঃস্ব মাটির গাছ

সকল মড়াঞ্চে অর্থাৎ শীর্ণ ও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা মাটি হইতে সোরা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থিতে সঞ্চিত করে, ফলতঃ তাহা বিষাক্ত হয় সুতরাং পশুদিগকে অদেয়। *

দানার জন্য যে জুয়ারের আবাদ হয় তাহার শস্যের ফলন ২/০ মণ হইতে ২॥০ মণ এবং দণ্ড-সমূহের ওজন ৪০।৪৫ মণ হইয়া থাকে। †

অ্যালো

(Aloe)

অ্যালো, শব্দটী ইংরাজী, বাঙ্গালাভাষায় ইহার কোন নামকরণ হয় নাই। উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকায় শ্রেণীগত সাধারণ নাম,—অ্যালো শব্দ ব্যবহার করিতে হইল। প্রায় তাবৎ জেলখানার চতুঃসীমায় ও পগারের উপর অ্যালো গাছ রোপিত হইয়া থাকে। গাছের আকার প্রায় আনারস গাছের ন্যায় কিন্তু পত্রসমূহ চারিহস্তের অধিক দীর্ঘ হয় এবং মধ্যাংশের প্রশস্ততা অর্দ্ধহস্ত বা ততোধিক হইয়া থাকে। পত্র সকল কণ্টাকাকীর্ণ বলিয়া বাগান-বাগিচাকে চোর ও গবাদি পশুর উপদ্রব হইতে রক্ষার জন্যই সাধারণতঃ ইহা রোপিত হয়। ইহাদিগের তন্ত দীর্ঘ, দৃঢ় ও শুভ্রবর্ণের। উক্ত তন্ত হইতে ধীবরদিগের জাল, এবং দড়ি, পাপোশ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। অ্যালোর অনেকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে (Yucca or the

* পশুখাদ্যরূপে ইহার আবাদ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে "পশুখাদ্য" দেখিতে পারেন।

† N. G. Mukerjee's Handbook of Indian Agriculture.

Adm's needle), স্যানসারভিয়া, (Sanservia Zeylanica) ও অ্যাগেভ্ (Agave Americana) প্রধান।

ইয়ুক্কা।—ইহার পত্র তাদৃশ বড় বা দীর্ঘ নহে, জোর দেড় হাত দীর্ঘ ও পাতার মধ্যস্থল দুই আঙ্গুল চওড়া হয়। ইহার আঁশ সূক্ষ্ম, শুভ্র ও দৃঢ় হইলেও তাদৃশ লাভজনক নহে, কারণ উহার আঁশ বাহির করিতে সমধিক খরচ পড়িয়া যায়, অথচ অধিক বা দীর্ঘ আঁশ পাওয়া যায় না।

স্যান্‌সার্ভিয়া।—বাঙ্গালা-ভাষায় ইহাকে মুর্ব্বা কহে। ইহাদিগের পত্র ২।৩ ফুট দীর্ঘ হয় ও তন্তু দৃঢ় হয়। এই জন্য উক্ত তন্তুনির্ম্মিত রজ্জু ধুনারীদিগের ধনুর রজ্জুরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ধীবরগণের জাল নির্ম্মাণ কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়।

অ্যাগেভ।—বেহার প্রদেশে ইহা 'ফুল-বাঁশ' নামে অভিহিত এবং এই জাতীই জেলখানায়,মাঠ-ময়দানে বা বাগ-বাগিচায় প্রাচীররূপে রোপিত হয়। ইহার আঁশ যেমন দীর্ঘ তেমনি মজবুদ ও জলসহ, কিন্তু তেমন কোমল বা মিহি নহে। যাহা হউক, উহার আঁশের বিস্তর ব্যবহার আছে। আবাদ করিলে স্বল্পব্যয়ে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে, জলা, ডোবা বা সিক্ত জমি ব্যতীত সকল প্রকার জমিতে সহজে জন্মিয়া থাকে। যাঁহাদিগের অনেক পতিত জমি আছে, যথায় অন্য কোন ফসলের আবাদ হওয়া সম্ভব নহে, তাঁহারা তাদৃশ জমিতে ইহার আবাদ করিয়া প্রভুত অর্থ উৎপাদন করিতে পারেন। আরও সুবিধা এই যে, ইহাদিগকে গবাদি পশুতে ভক্ষণ করে না।

আবাদ প্রণালী।—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষেত্রে উত্তমরূপে বারম্বার ঘন চাষ দিয়া চৌকী বা মদিকা সাহায্যে ভূপৃষ্ঠকে উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হয়। অতঃপর বর্ষার সূত্রপাতেই দীর্ঘে ও প্রস্থে চারিহাত

ব্যবধানে সমশ্রেণীতে দাঁড়া নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি এক-একটী চারা রোপণ করিতে হয়। উল্লিখিত ব্যবধানে রোপণ করিলে প্রতি বিঘা ভূমিতে চারিশত গাছের স্থান হয়।

চারা। ফুল-বাঁশগাছ ছয়-সাত বৎসরের অধিক জীবিত থাকে। গাছ পূর্ণবয়স্ক হইলে কদলী.আনারস প্রভৃতির ন্যায় তাহারদে শিরোভাগে একটী সুদীর্ঘ শীষ উদ্গত হয়। উক্ত শীষ বাঁশের ন্যায় স্থূল ও ৮।১০ হাত দীর্ঘ হয় এবং তাহার শেষভাগের চারিপার্শ্বে দুই-তিন হাত দীর্ঘ হয় এবং শাখাপ্রশাখা জন্মে। উক্ত শীষ সকলই ফুলবাঁশ গাছের পুষ্পদণ্ড, সুতরাং তাহাতে পাতা জন্মে না। পুষ্পদণ্ডে রাশি রাশি ফুল হয়। পুষ্পগুলি শুভ্র ও মনোহর। পুষ্পবৃন্ত সকল এমন সুকৌশলে রচিত যে, তাহাতে যে বীজ ভূমিতে পড়িতে না পারিয়া বৃন্তে থাকিয়া যায় তাহারা সেইখানে থাকিয়াই চারায় পরিণত হয়। প্রতি শীর্ষে সহস্র সহস্র চারা জন্মে সুতরাং চারা উৎপন্ন করিবার জন্য ক্লেশ বা প্রয়াস পাইতে হয় না। সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুষ্পের সমাগম হয় এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা জন্মে। চারাগুলি ১॥ বা ২ আঙুল পরিমাণ বড় হইলে উক্ত পুষ্পদণ্ড বা বাঁশটী কর্ত্তন করিয়া চারাগুলিকে সংগ্রহকরতঃ কোন স্থানে হাপোর দিতে হয়। হাপোরে আপাততঃ ৫।৬ অঙ্গুলি অন্তর রোপণ করিয়া দুই মাস লালন-পালন করিলে চারাগুলি বেশ বাড়িয়া উঠে। তখন ক্ষেতে স্থায়ীরূপে রোপণ করা উচিত।

প্রতি বৎসরই গাছের মূলদেশ হইতে বহু সংখ্যক ফেঁকড়ী বা চারা জন্মে। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে স্বতন্ত্র করিয়া হাপোর দিয়া রাখিলে, পরে প্রয়োজনমত ক্ষেতে রোপণ করিলে চলিতে পারে। ফুল-বাঁশের গোড়ায় যে সকল চারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ফেঁকড়ি বা Sucker কহে।

তিন বৎসর অতীত হইলে দেখা যাইবে অনেক গাছের নিম্নভাগের কতকগুলি পত্র পার্শ্বভাগে শায়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল পত্র পরিপুষ্ট হইয়াছে জানিয়া গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া লইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। অতঃপর সেই সকল পাতাকে খামারে আনিয়া লঘু কাষ্ঠ দণ্ড বা মুগ্দর সাহায্যে ধীরভাবে পিটিয়া নিকটস্থ জলাশয়ে—পাট কাচিবার প্রণালীতে—ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং ২।১ দিন পরে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিতে হয় যেন অতিরিক্ত পচিয়া না যায়। ছালের শাঁস আল্গা হইয়া গেলে জলে আছড়াইয়া ধৌত করিলেই তন্তু পৃথক হইয়া যাইবে কিন্তু মলিন বা কর্দ্দমাক্ত জলে কাচিলে তন্তু মলিন হয়। অধিকদিন জলে রাখিলে তন্তু পচিয়া যায় কিম্বা তন্তুর দৃঢ়তা হ্রাস পায়।

অতঃপর, প্রতি বৎসরই নিম্নভাগের পত্র সংগ্রহ করিয়া তন্তু বাহির করিতে পারা যায়। কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পত্রের তন্তু কঠিন ও ভগ্নশীল হয় সুতরাং কাচিবার কালে অনেক আঁশ নষ্ট হয়, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে বিশেষ কাজ হয় না।

ফুল-বাঁশ জাতির সন্নিহিত আর একটী জাতি দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে (U.S.A.) তাহার প্রভূত আবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষ ও সিংহলের কোন কোন ইংরাজ ইহার আবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আসামের চা-বাগানের কোন কোন সাহেব ইহার আবাদ করিতেছেন। উল্লিখিত জাতির নাম—

সিসল।—(Sisal)—সিসল আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের মেক্সিকো প্রদেশের স্বভাবজাত উদ্ভিদ এবং বিগত শতাধিক বৎসর কালেরও অধিক তথায় ইহার আবাদ হইতেছে। ফুল-বাঁশের ন্যায় সিসলও সেদেশে যথা-তথা ও অনায়াসে জন্মিয়া থাকে, তবে আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহারা উষ্ণপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশ নির্ব্বিশেষে সকল স্থানেই

জন্মিয়া থাকে। এই কারণেই সকল দেশেই ইহার আবাদ হইতে পারে। ফুল-বাঁশের ন্যায় সিসলের, আবাদ পরিত্যাক্ত ও অনুর্ব্বর ভূমিতে অনায়াসে হইতে পারে। ফুল-বাঁশ অপেক্ষা ইহার আঁশ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এদেশে ও বিলাতে ইহার যথেষ্ট চাহিদা (demand) আছে। অনেক ভূধ্যধিকারীর এলাকা মধ্যে সহস্র সহস্র বিঘা ভূমি অনাবাদী ও জঙ্গলময় অবস্থায় পতিত আছে, সেই সকল জমিতে সিসলের আবাদ করিলে যথেষ্ট অর্থলাভ হয়, দেশে অর্থাগমের একটী অভিনব পথ আবিষ্কৃত হয়। অনেক শ্রমজীবি লোকের অর্থোপার্জ্জনের পথ হয়। ঈদৃশ ফসলের আবাদ করা কৃষকের সাধ্যায়ত্ত নহে, বিত্তসম্পন্ন ও ভূম্যধিকারীগণ দ্বারাই সম্ভবে।

ফুল-বাঁশের ন্যায় সিসলের চারা (bulbils) প্রথমতঃ হাপোরে ৮ হইতে ১২ আঙ্গুল অন্তর রোপণ করিতে হয়। কয়েক মাসের মধ্যে আধহাত বা একফুট বাড়িয়া উঠিলে দীর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪-হাত ব্যবধানে দাঁড়ার উপর রোপণ করিতে হইবে। বর্ষাকালে রোপণ করা বিধি। উল্লিখিত প্রণালীতে রোপণ করিলে প্রতি বিঘা ভূমিতে (১৫ × ২০) ৩০০ শত চারা বসিতে পারে। এইরূপে যে ব্যবধান থাকে তাহা সামান্য নহে। উক্ত খালি জায়গা পাতিত না রাখিয়া প্রথম ২।৩ বৎসর অল্পাধিক পরিমাণে ভুট্টা, কার্পাস বা অপর কোন স্থানীয় অস্থায়ী গাছের—দ্বিতীয় বা ফাও ফসলরূপে—আবাদ করিলে সিসল আবাদ করিবার তাবৎ খরচা প্রায় উঠিয়া আসে। একবার সিসলের আবাদ করিলে প্রতি বৎসর বহু সহস্র চারা পাওয়া যায় এবং সেই সকল চারার সাহায্যে প্রতি বৎসরই ক্ষেত বাড়াইতে পারা যায়।

গাছের বৃদ্ধি থাকিলে ক্ষেত্রে রোপিত হইবার দুই বৎসর পর হইতে প্রতি বৎসর পত্র সংগৃহিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাঁচ বৎসর

না গেলে তাহাদিগকে বয়ঃপ্রাপ্ত বলা যায় না। ১২।১৩ হইতে ২০ বৎসরকাল ইহারা জীবিত থাকে এবং কালপূর্ণ হইবার লক্ষণ,—শীষ। শীষ উদ্গত হইয়া তাহাতে ফুল-ফল ধারণ করিয়া গাছ মরিয়া যায়। গড়ে প্রতিবৎসর প্রতিবিঘা জমি হইতে ন্যূনাধিক ছয় হন্দর হইতে আট হন্দর অর্থাৎ ৮।৬ সের হইতে ১১/৮ সের (১ হন্দর বা cwt. (প্রায় ১।৬ একমণ ষোল সের) তন্তু উৎপন্ন হয়। তন্তুর উৎকৃষ্টতা ও বাজারের চাহিদা অনুসারে প্রতি টন (২০ হন্দর বা ২৭॥০ মণ) তন্তুর মূল্য বিলাতের বাজারে ২৬ হইতে ৩০ পাউণ্ড (প্রতি পাউণ্ড মূল্য গড়ে ১৫৲ টাকা) অর্থাৎ ৩৪৫৲ হইতে ৪৫০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। বাঙ্গালা হিসাবে প্রতিমণ সিসল পাটের মূল্য মোটামুটি ১২৵১০ হইতে ১৬৷/১৫।

বাণিজ্য পণ্য হিসাবে আবাদ করিতে হইলে অন্ততঃ ২০।২৫ বিঘা জমিতে আরম্ভ করা উচিত এবং পাতা হইতে আঁশ বাহির করিবার জন্য একটী যন্ত্র থাকা উচিত। উক্ত যন্ত্রের নাম Harrison Decorticator এবং তাহার মূল্য ৫৭৫৲ টাকা। Eastern Landing and Forwarding Co., উক্ত যন্ত্রের কলিকাতার এজেণ্ট। ইহাদিগের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে উক্ত যন্ত্র বিষয়ক তাবৎ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। *

* সিসল সম্বন্ধে যে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইল তাহা চট্টগ্রামের অন্তর্গত চাঁদপুর চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত হইল। উক্ত বাগিচায় সিসলের আবাদ আছে।

সমাপ্ত।

কৃষিতত্ত্ববিদ্ উদ্যানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

কৃষি-গ্রন্থাবলী—

1. A Treatise on Mango (3rd. Edition) (যন্ত্রস্থ)
2. Potato Culture (5th. Edition) As. 8.

৩ কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) অষ্টম সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৪। সব্জীবাগ (দশম সংস্করণ) মূল্য ১৲

৫। ফলকর (ষষ্ঠ সংস্করণ) সচিত্র মূল্য ১৷৹

৬। মালঞ্চ—(তৃতীয় সংস্করণ) সচিত্র। মূল্য ১৷৹ কিরূপে বাগান ও তাহার পথ ঘাট রচনা করিতে হয়, দেশী ও বিলাতী ফুলের গাছ-পালা লালনপালন ও কিরূপে কলম করিতে হয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

৭। পশুখাদ্য—মূল্য চারি আনা। (দ্বিতীয় সংস্করণ) পশুদিগের খাদ্যোপযোগী নানাবিধ পুষ্টিকর ঘাস, গিণী ঘাস, রিয়ানা খাড়ি ইক্ষু ইত্যাদির আবাদ প্রণালী উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে।

৮। আয়ুর্ব্বেদীয় চা—মূল্য ।৹ আনা। (দ্বিতীয় সংস্করণ) এই পুস্তিকায় আয়ুর্ব্বেদীয়-চা অর্থাৎ অশ্বগন্ধা গাছের আবাদ-প্রণালী এবং তাহা হইতে চা প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী লিখিত আছে।

৯। গোলাপ-বাড়ী—(সচিত্র) ২য় সংস্করণ মূল্য এক টাকা মাত্র। গোলাপ সম্বন্ধে ইহাতে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

১০। মৃত্তিকা-তত্ত্ব (সচিত্র) ২য় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা।

১১। ভূমিকর্ষণ—ভূমি-কর্ষণের উদ্দেশ্য কি? কি প্রণালীতে ভূমি-কর্ষণ করিলে কিরূপ ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে—মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

১২। কার্পাস-কথা—(২য় সংস্করণ) মূল্য ॥৵৹ দশ আনা।

১৩। উদ্ভিদাখদ্য—মূল্য ॥৹ আট আনা।

১৪। উদ্ভিজ্জীবন—মূল্য ॥৹ আট আনা।

১৫। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি—(২য় সংস্করণ) মূল্য ।৹ আনা।

১৬। প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান—মূল্য ।৹ আনা।

১৭। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র—মূল্য ।৹ আনা।

১৮। বিষয়ী—(যন্ত্রস্থ)